ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান প্রকাশিত

ব্যাঙাচি

চতুর্থ সংখ্যা

আগস্ট ২০২০ | শ্রাবণ-ভাদ্র **১৪২৭**

সৌরজগৎ

বাঁচতে হলে, ভাবতে হবে

আগস্ট ২০২০, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৭

প্রথম বর্ষ • সংখ্যা ০৪

সম্পাদক

প্রজেশ দত্ত, মুস্তফা কামাল জাবেদ

সহ-সম্পাদক

টিম ব্যাঙাচি

ডিজাইন এবং লেআউট

তানভীর রানা রাব্বি

প্রচ্ছদ এঁকেছে: মেহরাব সাবিত সিদ্দিকী

প্রকাশক: নাঈম হোসেন ফারুকী, সমুদ্র জিত সাহা

তারিখ: ১৯ই আগস্ট, ২০২০

টিম ব্যাঙাচি, ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান কর্তৃক

ফেইসবুক গ্রুপে জয়েন করতে লগইন করুন:

https://bit.ly/bcb_science

ইমেইল: contact@bcbiggan.com

ওয়েব: https://www.bcbiggan.com

ফেইসবুক: htttps://www.facebook.con/bcbiggan

রহস্যপুরীর আরেক নাম মহাকাশ, আর এই মহাকাশের ছোট্ট একটা জায়গা জুড়ে আছে আমাদের এই সৌরজগৎ। পাঁচটি বামন গ্রহ, আটটি মূলধারার গ্রহ এবং প্রায় ৫৭৫টি উপগ্রহ নিয়ে সূর্যের সুবিশাল রাজ্য। আছে অগণিত উল্কাপিণ্ড আর ধূমকেতু। এসব আছে বলেই মানুষ সেই আদিকাল থেকেই আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতে পেরেছে, প্রশ্ন করে নিজেই উত্তর খুঁজতে চেয়েছে। ফলে তৈরি হয়েছে এসব জ্যোতিষ্ক নিয়ে নানান গালগল্প। কিসসা কাহিনিতে মনের খোরাক মেটে কিন্তু সত্যিটার জানান দেয় বিজ্ঞান। কেমন হয় যদি গল্পে গল্পে মনের খোরাক মিটিয়ে সেই মহান ও নান্দনিক সত্যিটা জানা যায়? সেটারই ক্ষুদ্র একটা প্রয়াস হলো এবারের এই ব্যাঙাচি। এখানে লেখকেরা প্রাঞ্জল বর্ণনার মাধ্যমে আপনাকে গ্রহ, উপগ্রহ আর গ্রহাণুপুঞ্জের ভেতর বাহির দেখিয়ে আনবেন। কারও লেখা পড়ে আপনিও হতে চাইবেন মহাকাশের চাষা, আবার কেউ আপনাকে কট্টর ফ্ল্যাট আর্থার থেকে বাস্তববাদী বানিয়ে দিবে। আছে জ্যোতির্বিদ্যার ওপর লিখিত বইয়ের বিশাল রিভিউ। ধূমকেতু, উল্কাবৃষ্টি, বা চাঁদের আদ্যোপান্ত।এছাড়াও আছে বরাবরের মতো নিয়মিত বিভাগগুলো।

প্রতিমাসে এই যে আমরা ফ্রি অনলাইন ম্যাগাজিন প্রকাশ করে আসছি এর পেছনে রয়েছে বিসিবি গ্রুপের টিম ব্যাঙাচি ও প্রুফরিডার্স টিমের ভাই ও বোনদের অক্লান্ত পরিশ্রম। কেউ আছেন লেআউট ও ডিজাইনিং-এ, কেউ সিলেকশনে, কেউ চিত্র অঙ্কনে, কেউ কার্টুন বা মিম তৈরিতে, কেউ আছেন প্রুফরিডিং-এ। আবার কয়েকজন আছেন এ মহা কর্মযজ্ঞকে নেতৃত্ব প্রদানে। আমাদের সকলেরই একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে, আছে ব্যক্তিগত কর্মব্যস্ততা। আমরা কেউই এসব কাজে প্রফেশনাল নই। তবুও সবকিছুকে ছাপিয়ে প্রাণের 'বিসিবি' গ্রপটাকে ভালোবাসি বলেই স্বেচ্ছায় এসব কাজ আমরা করে থাকি।
কারণ 'ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান (বিসিবি)' একটি ভালোবাসার নাম, একটি পরিবারের নাম, জ্ঞানের দীপ্ত মশালের নাম।

যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রকাশিত হয়েছে আজকের ব্যাঙাচি-৪ তাঁদেরকে শুধুই ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করব না।

আর তর সইছে না তো ?
তাহলে আর দেরি না করে সৌরজগৎকে জানতে এখনই ঝাঁপ দিন ব্যাঙাচির জগতে।
সবার প্রতি শুভ কামনা রইল।।

এ আর মুবিন

প্রুফরিডার, ব্যাঙাচি

টিম ব্যাঙাচি

ব্যাঙাচি

যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমরা প্রতিমাসে দেশের প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক মাসিক ফ্রি ই-ম্যাগাজিন আপনাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে পারি

সিলেকশন:

হৃদয় হক

সমুদ্র জিত সাহা

সাব্বির রহমান

সোহম চ্যাটার্জি

বানান সংশোধন:

এ আর মুবিন

আবু রায়হান

রাকিন শাহরিয়ার

রাহুল খান

রওনক শাহরিয়ার

সাকিব হোসেন

তানভীর আহমেদ

তানভীর আহমেদ চৌধুরী

আদিন নুর

রিমন নাথ

রুহিন রুমি

রিজুফা জামান শোভা

রাশেদা নাসরিন সুমনা

আফীফাহ্ হক মীম

নাজমুল হোসেন

জাহিদুল ইসলাম রিয়াদ

নাসিম আহমেদ

নাফিউল ফেরদৌস অরণ্য

নাবিলা তাসনিম

মোঃ মুশফিকুর রহমান

স্বপ্নীল জয়ধর

মাহতাব মাহদী

প্রশ্নোত্তর কালেকশন এবং সম্পাদনা:

মাহতাব মাহদী

সঠিক এবং মৌলিক বিজ্ঞান জানতে এবং জানাতে

“ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান” বদ্ধপরিকর।

ব্যাঙাচির সবচেয়ে পরিশ্রমী
সদস্যদের একজন, এ আর
মুবিন ভাইয়ের আজকে
ছেলে সন্তান হয়েছে।
ছোট্ট ব্যাঙাচিকে টিম
ব্যাঙাচির পক্ষ থেকে
অভিনন্দন

সূচিপত্র

ব্যাঙাচি

এক যে ছিল স্পেইস-টাইম

তার ছিল এক চাদ্দর

তার ওপরে বক্কর ভাই

রাখল একখান পাত্থর!

টানটান হলো স্পেইস-টাইম

গর্তে ঢুকল পাত্থর

চারপাশে তার নুড়ি সম্ভার

শুরু করে দিলো চক্কর!

(নাঈম হোসেন ফারুকী)
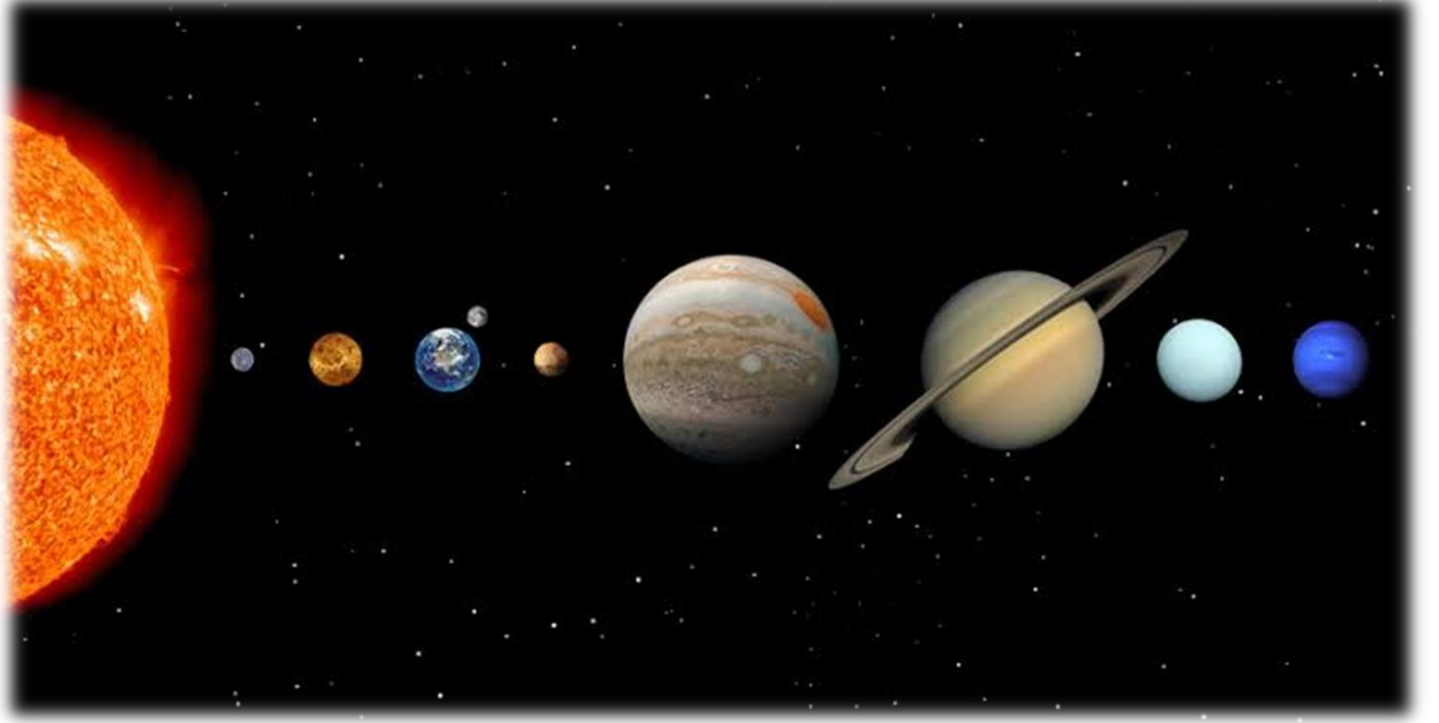
গ্রহদের নামকরণ

আবু রায়হান, পার্থিব রায়

আমাদের এই সৌরজগতে আছে ৮ টি গ্রহ। আমরা সবাই-ই এদের নাম জানি। একটায় আমরা বাস করি। বাকি ৭ গ্রহের মধ্যে ৫টির সাথে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের চেনা জানা রয়েছে। আর বাকি দুটি টেলিস্কোপের বিকাশের সাথে সাথে আমাদের কাছে ধরা দেয়। প্লুটোও এভাবে ৯ নম্বর গ্রহ হিসেবে ধরা দিয়েছিল । কিন্তু দেখা গেল সে গ্রহ নয় বরং বামন গ্রহ। তবে কখনো কি আমরা ভেবে দেখেছি গ্রহদের নামকরণ কীভাবে করা হলো? বাংলা,ইংরেজিতে এদের নামের উৎস কী? সেসব নামের রহস্য সমাধানে তাহলে ঝাপ দেওয়া যাক।

১। বুধ (Mercury)

বুধের নামকরণ করা হয়েছিল একজন রোমান দেবতার ওপর ভিত্তি করে। রোমান পুরাণ অনুযায়ী বুধ বা ‘Mercury’ ছিলেন মায়া মায়স্তাস এবং দেবতাদের রাজা জুপিটারের পুত্র। তাঁর বেশিরভাগ দিকই এসেছে গ্রিক দেবতা ‘Hermes’ বা হার্মিসের চরিত্র থেকে।

পৌরাণিক কাহিনী মতে মার্কারি হলেন দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগামী। এ কারণে ব্যবসায়ীরা তাদের বাণিজ্যিক লেনদেনের কাজের ক্ষেত্রে দ্রুত সাফল্যে লাভের জন্য মার্কারির কাছে প্রার্থনা করতেন। আবার গ্রিক পুরাণে হার্মিস ছিলেন দেবতাদের বার্তাবাহক বা প্রচারবাহক বা প্রফেট।

বুধ হলো সৌরজগতের সূর্যের নিকটতম গ্রহ এবং রাত থেকে রাতে এটি দ্রুত সরে যেতে থাকে।যেহেতু প্রাচীনকাল থেকেই বুধ খালি চোখেই দৃশ্যমান ছিল,তাই প্রাচীন সভ্যতার বেশিরভাগই বুধ গ্রহের নিজস্ব নাম দিত। প্রাচীন ব্যাবিলনীয়ানরা তাদের পুরাণ অনুযায়ী তাদের এক দেবতার নামানুসারে বুধের নাম রাখে ‘Nabu’। প্রাচীন গ্রিকরা বুধকে

আলাদা দুই দুটি গ্রহ বলে মনে করত । ভোরের আকাশের বুধকে তারা আলাদা মনে করে বলত ‘Apollo’(অ্যাপোলো একজন গ্রিক দেবতা) এবং সূর্যাস্তের পরে দেখা গেলে বলত Hermes বা হার্মিস। কিন্তু খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে দুটি আসলে একই বস্তু। কালের পরিক্রমায় গ্রিক পুরাণের হার্মিসকে ছেড়ে ইংরেজি ভাষা আপন করে নেয় হার্মিসেরই রোমান রূপান্তর মার্কারিকে। এবার আসা যাক বাংলা ভাষায় বুধ গ্রহের নামকরণ কীভাবে করা হলো সে বিষয়ে। বাংলায় বুধের নামকরণ করা হয়েছে হিন্দু ধর্মীয় পৌরাণিক দেবতা বুধের ওপর ভিত্তি করে। ইনি পুরাণ মতে চন্দ্রদেবের পুত্র এবং একজন গ্রহদেবতা হিসেবে স্বীকৃত।

২। শুক্র (Venus)

শুক্র হলো খালি চোখে দৃশ্যমান ৫টি গ্রহের একটি। তার মানে বুঝতেই পারছেন যে প্রাচীন মানুষ শুক্র সম্পর্কে বেশ ভালোভাবেই জানত এবং আকাশে তার গতিপথকে নির্ঝঞ্ঝাটে পর্যবেক্ষণ করতে পারত। দূরত্বে সূর্য থেকে এটি দ্বিতীয় নিকটতম গ্রহ। আর আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের গ্রহ।

শুক্রের বায়ুমন্ডলের মেঘ একটি দৈত্যাকার আয়নার মতো সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করে, এ কারণেই এটি এত উজ্জ্বল হিসেবে আকাশে দৃশ্যমান হয়। এককথায় উজ্জ্বলতা বা সৌন্দর্যের আধার এই ভিনাস। তাই ভেনাসের নামকরণও করা হয় রোমান ভালোবাসা ও সৌন্দর্যের দেবী ভেনাসের নামানুসারে, যিনি ‘The Goddess of Love and Beauty’ নামে পরিচিত (গ্রিক পুরাণে ভিনাসকে আফ্রোদিতি নামে জানা যায়)। প্রাচীন ব্যাবিলনীয়ানরা এই আকাশের উজ্জ্বলতম গ্রহটিকে ‘Ishtar’ নামে চিনত যা তাদের এক দেবীর নাম। তিনি ছিলেন ‘The Goddess of Womanhood and Love’ বা নারীত্ব এবং ভালোবাসার প্রতীক। কিন্তু শেষমেশ ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা Venus দেবীর নামানুসারেই গ্রহটির ইংরেজি নামকরণ করেন।

হেলেনিস্টিক সময়ের আগ পর্যন্ত প্রাচীন মিশরীয় এবং গ্রিকরা শুক্র গ্রহকেও দুটি আলাদা গ্রহ বলে মনে করত , যারা সকালে এবং রাতে পর্যায়ক্রমে একজন একজন করে আসে। কিন্তু একটা সময় তারা বুঝতে সক্ষম হয় যে একটি গ্রহ-ই তারা ভিন্ন সময়ে খালি চোখে দেখতে পায়।

তবে বাংলায় হিন্দু মিথোলজির শুক্রাচার্যের নাম থেকেই শুক্র গ্রহের নামের উৎপত্তি। নামের সাথে আচার্য শব্দটি দেখেই বুঝতে পারছেন ইনি আসলে একজন গুরু। তবে দেবতাদের নয়,অসুরদের। কিন্তু তাই বলে তিনি একেবারে খারাপ নন,জ্ঞানী হিসেবেই পরিচিত। পুরাণমতে শুক্রাচার্য সপ্তর্ষির অন্যতম ভৃগুমুনির পুত্র।

৩। পৃথিবী (Earth)

প্রায় ৪৫০ কোটি বছর আগে গঠিত আমাদের বাসভূমির এই নাম কে রেখেছিলেন বা কার নামানুসারে রাখা হয়েছিল, তা জানা নেই। তবে ‘আর্থ’ নামটি প্রায় ১০০০ বছরের পুরানো । বলতে পারেন একদম প্রাচীন ইংরেজী একটি শব্দ। পঞ্চম শতাব্দীতে থেকে ব্রিটেনে কিছু জার্মান উপজাতিদের অভিবাসনের সাথে ইংরেজি ভাষাসমূহ ‘অ্যাংলো-স্যাক্সন’ (ইংরেজী-জার্মান) থেকে বিবর্তিত হয়েছে। তাই ‘আর্থ’ শব্দটি অ্যাংলো-স্যাক্সন শব্দ ‘Erda (ইর্ডা)’ থেকে এসেছে এবং জার্মান ভাষায় একে বলা হয় ‘Erde’ যার অর্থ ‘মাটি বা ভূমি (Ground)’। পুরানো ইংরেজিতে তা ছিল ‘Eor(th)e’ বা ‘Ertha’।

ধারণা করা হয় যে, শব্দটির উৎপত্তি একটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বেইজ ‘er’ থেকে হতে পারে, যা আজকের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে আরও উন্নত অভিযোজন তৈরি করেছে। অন্যান্য সব গ্রহের নামের মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা পটভূমি আছে। তবে পৃথিবী হলো আমাদের সৌরজগতের মধ্যে একমাত্র গ্রহ যার নাম গ্রিক -রোমান পুরাণ থেকে আসেনি।

অন্যান্য সকল গ্রহের নাম গ্রিক ও রোমান দেবতাদের নাম বা পদবী অনুসারে করা হয়েছিল। সুতরাং ‘মাটি বা ভূমি বুঝাতেই

যে 'Earth' নামকরণ করা হয় তা হয়তো আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। তবে বাংলা নামকরণের ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত 'পৃথিবী' শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। সুতরাং 'পৃথিবী' সংস্কৃত শব্দ যার অপর নাম "পৃথ্বী"। পৃথ্বী ছিল পৌরাণিক "পৃথুর" রাজত্ব। আবার ধরণী,বসুন্ধরা নামও পৃথিবী শব্দের সমার্থক শব্দ হিসেবে পরিচিত। এই নাম দুটি হিন্দু মিথোলজির ভূমি দেবীর নাম হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।

৪। মঙ্গল (Mars)

রোমানদের সবচেয়ে সম্মানিত দেবতা ছিলেন 'Mars' (গ্রিক নাম এরিস/Ares) যাকে বলা হতো 'The God of War' বা 'যুদ্ধের দেবতা'। তিনি রোমানদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন কারণ রোমানদের প্রায়ই তাদের প্রতিবেশীদের সাথে যুদ্ধ লেগে যেত।

প্রাচীন ব্যাবিলনীয়ানরাও এই গ্রহকে মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধ, ধ্বংস ইত্যাদির প্রতীক ভাবত। তারা তাদের দেবতা 'Nergal' এর নামানুসারে এই গ্রহকেও 'Nergal' নামে ডাকত। আবার এই দেবতাও ছিলেন যতসব মারামারি, কাটাকাটি, আগুন, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদির কর্তা। যাইহোক রোমানরা তাদের বিশাল সেনাবাহিনীর রক্ষাকর্তা এবং রোমে তাদের ঘরবাড়ির অভিভাবক হিসেবে মঙ্গল বা 'Mars' এর চিন্তা করেছিল। তারপর তারা একটি মাসের নামও ঘোষণা করে। অনুমান করে বলুন তো কোন মাস? 'Mars' এর কাছাকাছি উচ্চারণে যে মাস। মার্চ! হ্যাঁ মার্চ মাস। শেষমেশ রোমান গড Mars-এর নাম অনুযায়ী আমাদের সৌরজগতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় এই গ্রহটির নামকরণ করা হয়।

আর মঙ্গল নামের উৎপত্তি হিন্দু মিথোলজির আরেক দেবতার নাম থেকে। পুরাণ মতে অবশ্য তার জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে ঝামেলা আছে। কেউ বলেন তিনি শিবের পুত্র তো,তো কেউ বলেন ধরণী দেবীর পুত্র। যাইহোক, মঙ্গল দেবতার নাম থেকেই বাংলায় এ গ্রহের নাম হয়েছে মঙ্গল।

৫। বৃহস্পতি (Jupiter)

আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে বৃহদাকার গ্রহ এটি ,যাকে বলে গ্রহদের রাজা। সবগুলো গ্রহের মোট ভরের চেয়েও আড়াই গুণ হবে জুপিটার বা বৃহস্পতির ভর।

জুপিটার শব্দটি খুব প্রাচীনকাল থেকেই বেশ পরিচিত। সমগ্র ইতিহাস জুড়ে বিশ্বের বিভিন্ন আনাচে-কানাচে এই নামটি বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে খুঁজে পাবেন। রোমানরা এই বৃহস্পতি গ্রহের নামকরণ করে রোমান দেবতাদের কর্তা বা দেবতাদের দেবতা হিসেবে ইতিহাসখ্যাত 'Jupiter' এর নামানুসারে। যাকে বলা হতো 'The King of Gods and Thunder'।

তাকে বজ্রপাতের দেবতাও বলা হতো। গ্রিক মিথ অনুযায়ী তার নাম 'Zeus/জিউস' , যাঁকে 'The father of all God and men, The ruler of Olympias' নামে অভিহিত করা হয়। সবচেয়ে শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান এই দেবতার নামানুসারে দৈত্যাকার এই গ্রহটির নামকরণ নিশ্চয়ই অবাক হবার মতো নয়।

এবার দেখা যাক বাংলায় বৃহস্পতি নামের উৎস কী।

হিন্দু মিথোলজির আরেক গুরুর নাম থেকে এই গ্রহরাজের নামকরণ করা হয়েছে। এই গুরুর নাম বৃহস্পতি,তিনি দেবতাদের শিক্ষক। কেউ কেউ তাকে অগ্নিদেবের সথেও তুলনা করে থাকেন। তবে বৃহস্পতিকে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবেই ধরা হয়,বাংলায় তাই প্রবাদ পর্যন্ত আছে-তুঙ্গে বৃহস্পতি বা বৃহস্পতি তুঙ্গে।

৬। **শনি (Saturn)**

ক্যাসিনি স্যাটেলাইটের কথা মনে আছে? দীর্ঘ ২০ বছরের মিশন শেষে পৃথিবীতে প্রায় ৩,৯৫,৯২৬ টি ছবি পাঠিয়ে শেষে শনির বায়ুমণ্ডলে ভস্মীভূত হয়ে যায়। এবার সেই গ্রহ স্যাটার্ন বা শনির নামের উৎস সন্ধান করা হবে।

রোমান পুরাণ অনুযায়ী ইংরেজিতে Saturn নামকরণ করা হয়। রোমান দেবতা 'Saturnus' ছিলেন 'The God of Agriculture and Harvest' অর্থাৎ কৃষি এবং ফসলের প্রতীক। আবার তিনি প্রাচীন গ্রিক পুরাণের দেবতা ক্রোনোস বা

'Cronos' এর সমতুল্য। ক্রোনোসের ভাই-বোনদের নামানুসারেই শনির উপগ্রহগুলোর নামকরণও করা হয়। ক্রোনোস ছিলেন টাইটানদের রাজা। যাইহোক, রোমান দেবতার নামানুসারেই 'Saturn' নামকরণ করেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।
গ্রিক পুরাণে স্যাটার্ন ছিলেন হেলেনের পুত্র। তার স্ত্রী ছিলেন ওপস, গ্রিক পুরাণে এর সমান চরিত্র হলেন রিয়া(Rhea)।

এবার আসা যাক অন্য এক কথায়। আমাদের চারপাশের মানুষদের মধ্যে কারোর যদি খারাপ সময় যায় একটা কথা হরহামেশাই শোনা যায়- শনির নজর পড়েছে। হ্যাঁ,হিন্দু পুরাণে দেবতা শনিকে একটু ভয়ে ভয়েই দেখা হয়,অনেকেই তাঁকে অপদেবতাও বলেন। কিন্তু আসলে তিনি যেমন কর্ম ,তেমন ফল প্রদানের নীতিতে চলেন,ভালো কাজের জন্য ভালো ফল এবং খারাপ কাজের খারাপ ফল।
শনি সনাতন হিন্দু ধর্মের একজন দেবতা যিনি সূর্যদেব ও তার পত্নী ছায়াদেবীর (সূর্যদেবের স্ত্রী ও দেব বিশ্বকর্মার কন্যা দেবী সংজ্ঞার ছায়া থেকে সৃষ্ট দেবী ছায়া) পুত্র, এজন্য তাকে ছায়াপুত্র-ও বলা হয়।
এভাবেই বাংলায় শনি গ্রহের নামকরণ করা হয়েছে।

৭। ইউরেনাস (Uranus)

ইংরেজ জ্যোতির্বিদ হার্শেলের টেলিস্কোপে ধরা পড়া এই গ্রহটিকে প্রথমে নেবুলা এবং পরে ধূমকেতু ভেবে ভুল করলেও পরবর্তীতে সৌরজগতের এই বাসিন্দাকে গ্যাসীয় গ্রহ হিসেবে আবিষ্কার করা হয়।
যেহেতু হার্শেল ইংল্যান্ডে বসবাস করতেন তাই তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা তৃতীয় জর্জের নামানুসারে গ্রহটির নামকরণ করবেন বলে মনস্থির করেন। তিনি প্রথম নাম ভেবেছিলেন 'Georgium Sidus' (ল্যাটিন অনুযায়ী George's Star বা জর্জের তারা)। কিন্তু তৎকালীন ব্রিটেন জুড়ে এই নামটি বেশ পরিচিত ছিল যার কারণে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ্যা কমিটি জর্জের নামানুসারের নামটিতে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেনি। তারা অন্যান্য গ্রহের নামকরণের পদ্ধতি হিসেবে গ্রিক বা রোমান মিথোলজিকেই বেছে নিতে আগ্রহ দেখায়। পরবর্তীতে নিয়ম অনুসারে ১৭৮২ সালে গ্রহটির নাম 'Uranus'(in Latin, Ouranos) রাখার প্রস্তাব করা হয়।
ইউরেনাসকে বলা হতো 'The God of Sky' বা আকাশের দেবতা। তিনি ছিলেন গ্রিক দেবতা জিউসের পিতামহ বা দাদা। জিউস কে ছিলেন মনে আছে? রোমান গড জুপিটারের গ্রিক ভার্সন । আবার ইউরেনাস ছিলেন শনিগ্রহের (গ্রিক মিথের 'Cronos' এবং রোমান মিথের 'Saturn') বাবা। এই গ্রহ নিয়ে ১৭৮৪ সালে একটি বইও লেখা হয় যার শিরোনাম 'From the Newly Discovered Planet'।

তারমানে,বৃহস্পতির বাবা শনি, আবার শনিগ্রহের বাবা ইউরেনাস! তাহলে বলা যায় বৃহস্পতির(জুপিটার) দাদা হলো ইউরেনাস।
বা, বলা যায় ইউরেনাসের পুত্র শনি, শনির পুত্র হলো বৃহস্পতি। বৃহস্পতি ছাড়াও প্লুটো,নেপচুনও শনির পুত্র। মানে প্লুটো,বৃহস্পতি, নেপচুন পরস্পর ভাই।

৮। নেপচুন (Neptune)-

আবিষ্কারের অল্প কিছুদিন পরেই নেপচুনকে কেবল 'ইউরেনাসের বাইরের গ্রহ' বা 'লে ভেরিয়ারের গ্রহ' হিসাবে উল্লেখ করা হতো। অন্য একটি নামের প্রথম পরামর্শ জোহান গালের কাছ থেকে এসেছিল, যিনি কিনা জানুস নামটি প্রস্তাব করেছিলেন। আরেকটি প্রস্তাবিত নাম ছিল Oceanus (ওসেনাস) । আর গ্রহটির আবিষ্কারক Urbain Le Verrier এর দেওয়া নাম নেপচুন। শীঘ্রই নেপচুন শব্দটিই আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত নাম হয়ে ওঠে।
রোমান পুরাণে নেপচুন ছিলেন 'The God of Sea' বা সমুদ্রের দেবতা (গ্রিক পুরাণে Poseidon বা পোসাইডন)। এই গ্রহের জন্য "নেপচুন" নামটিই আজ বেশিরভাগ ভাষায় ব্যবহৃত হয়। আর পোসাইডনের (নেপচুন)প্রেমিকা ও আত্মীয়-স্বজনদের নামে নেপচুনের উপগ্রহসমূহের নামকরণ করা হয়।

বাংলায় আবিষ্কারকের দেওয়া সরাসরি মূল 'নেপচুন' নামটিই ব্যবহার করা হয়।

তো,এই ছিল আমাদের সৌরজগতের মোট ৮টি গ্রহের নামকরণের সংক্ষিপ্ত কারণ।

এই মোট ৮টি গ্রহ ছাড়াও প্লুটো নামে আরেকটি বামন গ্রহ আছে যা কিনা ওপরের ৮টি গ্রহের মতো নয় এবং আমাদের সোলার সিস্টেমের স্বীকৃত কোনো গ্রহ নয়। বরং সে গ্রহটি পরে তার গ্রহ হওয়ার মর্যাদা হারিয়ে এখন সকলের কাছে বামনগ্রহ হিসেবে পরিচিত হয়ে আছে।

*বামনগ্রহ প্লুটো-(Pluto):

জ্যোতির্বিদ ক্লাইড ডব্লিউ টমবাউ ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অ্যারিজোনার ফ্ল্যাগস্টাফে অবস্থিত লোয়েল অবজারভেটরিতে প্রথমবার এই গ্রহটির একটি স্ন্যাপশট পান। এ সময় গ্রহটি কেবল "Planet X বা প্ল্যানেট এক্স" নামে পরিচিত ছিল, কিন্তু এটি দ্রুত জনসাধারণ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাণবন্ত আলোচনার একটি বিষয় হয়ে ওঠে। এরপর একই বছরের ১৪ই অক্টোবর সকালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির প্রাক্তন লাইব্রেরিয়ান ফ্যালকোনার ম্যাডান, তার ১১ বছর বয়সী নাতনী ভেনেসি বার্নিকে নাস্তা খাওয়াতে খাওয়াতে একটি সংবাদপত্র পড়ছিলেন এবং নাতনীকে এই গ্রহের আবিষ্কার সম্পর্কে পড়ে শোনাচ্ছিলেন। তখন ম্যাডান উদ্বেগের সাথে বলেন "এই গ্রহটিকে কী নামে ডাকা যেতে পারে?" অনেক দূরের গ্রহ বিধায় ভেনেসি বলল "এর নাম প্লুটো রাখে না কেন?"

পুরাণ মতে, প্লুটো(গ্রিক হেডিস) হচ্ছে নিম্নতর জগতের(পাতালপুরী বা মৃতপুরী) দেবতা।

ভূ-গর্ভস্থ বা অন্ধকারের দেবতা নামেও তাঁর বেশ পরিচিতি ছিল।

প্লুটো স্যাটার্নের (গ্রিক ক্রোনাস, বাংলা শনি) পুত্র, জুপিটার (গ্রিক জিউস, বাংলা বৃহস্পতি) ও নেপচুনের(গ্রিক পোসাইডন) ভাই এবং প্রসপারপাইনের(গ্রিক পার্সিফোন) স্বামী।

প্লুটোর গায়ে কালো কালো দাগ দেখেও ভেনেসি নাম বলতে ভুল করেনি। প্লুটোর আগের ভার্সন গ্রিক হেডিস-ও 'The God of Death and Underworld' নামে বেশ পরিচিতি ছিল পুরাণে। প্লুটোকে অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রহ বলা হয় একই কারণে। তাই এই নামকরণ বেশ যথার্থই মনে হয়েছে।

প্লুটোর এক উপগ্রহের নাম হচ্ছে ক্যারন। এই নামকরণটাও বেশ ভয়ঙ্কর । গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী ক্যারন ছিলেন পাতালপুরীর নাবিক যিনি মৃত্যুর পর প্রতিটি আত্মাকে নৌকাতে করে পাতালপুরীতে নিয়ে যেতেন।

এভাবেই প্লুটো ও ক্যারনের নামকরণ হয়।

তথ্যসূত্র

সূর্য (Sun)

প্রজেশ দত্ত

তুমি যদি সূর্যে ঝাঁপ দেওয়ার পরিকল্পনা করে যাত্রা শুরু কর তবে ১৫ কোটি কিঃমিঃ এর রাস্তার প্রতিটা অংশ তোমার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে। যাত্রাপথে কিছুদূর এগোনোর পর সৌরঝড়ের সম্মুখীন হবে তোমার নভোযান। বিশাল সৌরঝড়। সূর্যের আউটারমোস্ট লেয়ার "করোনা" থেকে সৃষ্টি এ ঝড়। আরেকটু এগোলেই সূর্য থেকে ছুটে আসা অগণিত আয়নিত গ্যাসকণা, ২ মিলিয়ন কেলভিন অবধি এদের তাপমাত্রা। তোমার নভোযান ঝাঁঝরা করে দিয়ে নিজেদের গতিতে ছুটে যাবে এরা মহাশূন্যের দিকে। তারপরও যদি তুমি স্বপ্নে এই লেয়ারকে অতিক্রম করে যাও, তবে আসবে ক্রোমোস্ফিয়ার, হাইড্রোজেন পুড়ে লাল রঙের আভা ছড়াচ্ছে সেখান থেকে। হয়তো তোমার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে এর দিকে তাকাতেই, কারণ এর পেছনেই রয়েছে সূর্যের উজ্জ্বলতম আস্তরণ "ফটোস্ফিয়ার"। পৃথিবী থেকে আমরা এটাই দেখি, যার দিকে পৃথিবী থেকেই তাকানো দুঃসাধ্য। তুমি এবার গিয়ে নামলে সূর্যের পৃষ্ঠে। যেখানে তাপমাত্রা ৫৮০০ কেলভিন। কীভাবে রক্ষা পাবে এই তাপমাত্রা থেকে? আইসস্যুট পরবে না রাতের বেলায় যাত্রা করবে? যা-ই করো, ৬,৯৬,৩৪০ কিঃমিঃ ব্যাসার্ধের আর ২×১০^৩০ কেজি ভরের এই দানব তোমাকে গ্রাস করবেই। তুমি কি এখনো সূর্যের পৃষ্ঠ ভেদ করে আরও ভেতরে প্রবেশ করতে চাও? সূর্যের ভেতরের জগৎ নিয়ে বিস্তারিত জানতে চলে যান ১২৬ পৃষ্ঠার "সুয্যি মামা" আর্টিকেলে।

বুধ (Mercury)

নাঈম হোসেন ফারুকী

ঠান্ডা, অন্ধকার, ভয়ানক পাথুরে খটখটে একটা গ্রহে বসে তুমি ঠকঠক করে কাঁপছো। বাইরে তাপমাত্রা -১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ক্লোরিন গ্যাস জমে বরফ হয়ে আছে, আর একটু নিচে নামলে অক্সিজেনও জমে যাবে। স্পেইসস্যুটের হিটিং সিস্টেমও মনে হচ্ছে যথেষ্ট না, চা কফি কিছু পেলে ভালো হতো।

তোমার পাশে গভীর একটা গর্ত, উল্কার ধাক্কায় হয়েছে। শিল্পাচার্য জয়নুলের নামে তার নাম রাখা হয়েছে আবেদিন ক্রেইটার। ১১৬ কিলোমিটার ব্যাসের খাঁজটার দিকে তাকালে অবশ্য তেমন কোনো শিল্প খুঁজে পাওয়া যায় না, কেমন জানি বিদঘুটে লাগে। এই গ্রহে বাতাস বলতে গেলে নেই, আকাশটা তাই একেবারে খোলা। সেই খোলা বাতাসবিহীন আকাশ আশেপাশের মাটির মতো বিদঘুটে না, সেটা অদ্ভুত সুন্দর। কোটি কোটি নক্ষত্র সেখানে মুক্তার মতো জ্বলজ্বল করছে। একটু পর পর ছুটে বেড়াচ্ছে উল্কা। এ সৌন্দর্যে চোখ জুড়িয়ে যায়, আবার ভয় ভয় লাগে। মাঝে মাঝেই দূরে কোথাও বিস্ফোরণ হচ্ছে, বায়ুমণ্ডল না থাকায় সোজা মাটিতে এসে পড়ছে নানান সাইজের উল্কা।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায়। তোমার কাজকর্ম চলে। তুমি ঘুরে দেখলে বুধের নানান খাদ। মেরুতে জমে থাকা বরফ। তারপর একদিন কালো আকাশের বুকে সূর্যের উদয় হলো।

এই সূর্য অদ্ভুত। পৃথিবীর পরিচিত সূর্যের সাথে এর কোনো মিল নেই। এর রং সাদা ধবধবে। এর আকার পৃথিবীর সূর্যের তিনগুণ। এর তীব্রতা ভয়ানক।

বায়ুমণ্ডল নেই, তাই আকাশে জ্বলজ্বলে সূর্য থাকলেও কালো আকাশ কালোই থাকল। তাপ বাড়তে থাকল মাটির।
-১৮০, -১৫০... বাড়তে বাড়তে এক সময় ০ ছাড়াল। তারপর ২০, ৪০, ৬০ বাড়তেই থাকল। আগামী ৮৮ দিন ধরে বুধে সূর্য জ্বলজ্বল করতে থাকবে। এক সময় তার তাপে সব পানি ফুটে যাবে। সিসা গলে যাবে। তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে ৪৩০ ডিগ্রি ছাড়াবে। এই ভয়ানক নারকীয় জায়গা মানুষের জন্য নয়। তোমার চলে যাওয়া উচিত দ্রুত।

সৌরজগতের প্রথম গ্রহ বুধ মাত্র ৮৮ দিনে একবার সূর্যের চারপাশে ঘুরে আসে। কিন্তু নিজ অক্ষের চারপাশে তার ঘুরতে সময় লাগে ৫৯ দিন। এক দিন হওয়ার আগেই সে মোটামুটি সূর্যের অন্য পাশে চলে আসে, তাই অদ্ভুত হলেও, বুধের কোনো জায়গায় এক সূর্যোদয় থেকে আরেক সূর্যোদয় হতে সময় লাগে ১৭৬ দিন।

চঞ্চল গ্রহ বুধ খুবই ঘন। তার আয়তনের ৬১% জুড়ে আছে গলিত লোহার কোর, যেখানে পৃথিবীর কোর তার আয়তনের মাত্র ১৭%।

এক নজরে বুধগ্রহ

ব্যাস: 4880 কি.মি

সূর্যের থেকে আনুমানিক দূরত্ব: 5 কোটি 80 লক্ষ কি.মি

সূর্য পরিক্রমার সময়: 225 দিন

নিজ অক্ষে ঘোরার সময়: 243 দিন

উপগ্রহ: নেই

গড় তাপমাত্রা: 464 ডিগ্রি সেলসিয়াস

ঘনত্ব: 5.427 গ্রাম/সে.মি

গ্র্যাভিটেশনাল ত্বরণ: 3.7 মি/সে

ভর: 3.3022×10^{23} কেজি

শুক্র (Venus)

নাঈম হোসেন ফারুকী
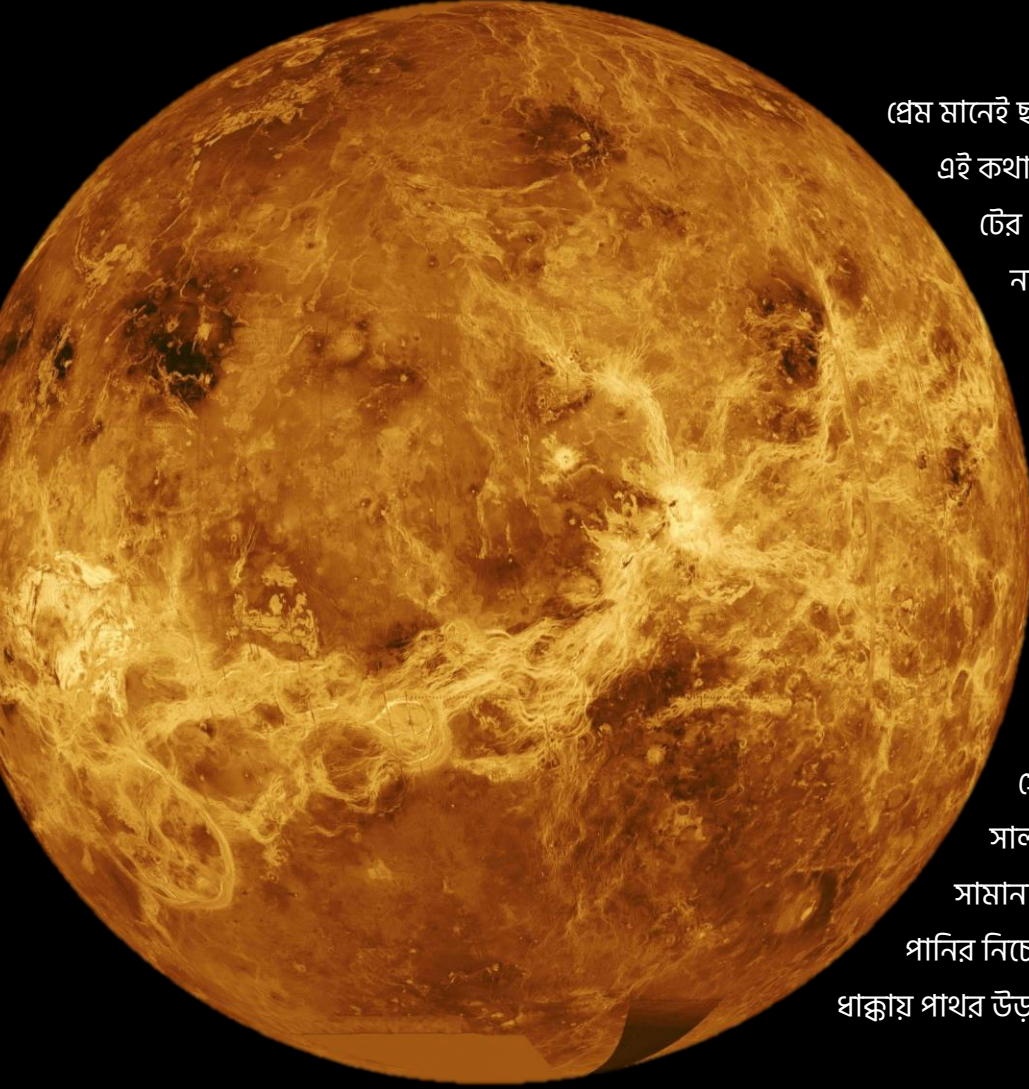
প্রেম মানেই ছলনা। প্রেম মানেই যন্ত্রণা। এই কথাগুলো আগে বিশ্বাস হয়নি। এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছ প্রেমের দেবীর বাড়িতে এসে। নামার আগে আগে দেবীর সে কী আক্রোশ! ৪০০ কিলোমিটার বেগে বাতাস দিচ্ছিলেন তোমাকে উড়িয়ে নেওয়ার জন্য। আপাতত মাটির কাছাকাছি এসে ঝড়ের দাপাদাপি বন্ধ হয়েছে। কিন্তু তাই বলে বিপদের শেষ নেই। তোমার চারপাশে আছে ঘন বাতাস। সেই বাতাস বিষাক্ত, দূষিত, এক মুহূর্তে তোমাকে মেরে ফেলার জন্য যথেষ্ট। বাতাসের ৯৬.৫% কার্বন-ডাই-অক্সাইড সেখানে, আর আছে কিছু নাইট্রোজেন, সালফার-ডাই-অক্সাইড এসব। সেই বাতাসে সামান্য হাত নাড়তেও তোমার কষ্ট হবে, মনে হবে পানির নিচে দাঁড়িয়ে আছ। ওই দেখো, ঘন বাতাসের ধাক্কায় পাথর উড়ছে চারপাশে।

তোমার গায়ের জবরজং বিশাল শক্তিশালী কাপড়টা খুললেই আরেকটা জিনিস টের পেতে। সেটা হচ্ছে চাপ। প্রেমের দেবী প্রবল আক্রোশে তোমাকে টিপে মারার চেষ্টা করছেন। সমুদ্রের ৩০০০ ফুট গভীরতায় পানির যেরকম চাপ, সেই অবস্থা ভিনাসে।

আকাশটা লাল, ঘন মেঘে ঢাকা। সূর্য অতি সামান্য দেখা যাচ্ছে এই মেঘের চাদর ভেদ করে। আকার বোঝা যাচ্ছে না, খালি একটা আলোর উৎস আছে বোঝা যাচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে উঁচু আকাশে। আহ! প্রেমের দেবীর মনে একটু প্রেম আসলো হয়তো, বৃষ্টি আসছে।

বৃষ্টি নামল। ভাগ্যিস সে বৃষ্টি তোমার গায়ে লাগেনি, মাটিতে পড়ার অনেক আগেই বাষ্প হয়ে গেছে। লাগলে খবর হতো। প্রেমের দেবী ভালোবেসে অ্যাসিড বৃষ্টি করেছেন, গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ফোঁটায় ফোঁটায় নেমে এসেছে আকাশ থেকে।

বাষ্প হয়ে গেছে কেন বল তো? কারণ তুমি দাঁড়িয়ে আছো চুলার ওপর। অলরেডি তোমার জুতার সোল গলা শুরু হয়ে গেছে। মাটির তাপমাত্রা ৪৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, জুতা খুললেই টের পেতে কত ধানে কত চাল।

আর কিছুক্ষণ থাকবে? ওই যে দূরে ম্যাট মন্সের চূড়ায় মেঘের মতো কী জানি জমছে, এখনই লাভা বের হবে মনে হচ্ছে। এখন মনে হয় ওঠা যায়, প্রেমের দেবীর ঘরে যথেষ্ট আপ্যায়ন হয়েছে।

এইসব ভয়ানক আচরণের জন্যই মনে হয় প্রেমের দেবী আজও নিঃসন্তান। কোনো উপগ্রহ নেই তার।

এক নজরে শুক্রগ্রহ

ব্যাস: 12,104 কি.মি

সূর্যের থেকে আনুমানিক দূরত্ব: 10 কোটি 82 লক্ষ কি.মি

সূর্য পরিক্রমার সময়: 584 দিন

নিজ অক্ষে ঘোরার সময়: 116.75 দিন

উপগ্রহ: নেই।

গড় তাপমাত্রা: 462 ডিগ্রি সেলসিয়াস

ঘনত্ব: 5.204 গ্রাম/সে.মি

গ্র্যাভিটেশনাল ত্বরণ: 8.87 মি/সে

ভর: 4.8685×10^{24} কেজি

পৃথিবী (Earth)

সাব্বির রহমান

মানি না, মানব না। আমাদের দাবি আমাদের দাবি, মানতে হবে মানতে হবে বলে চিৎকার করা দু-পেয়ে প্রাণিদের দলের ওপর আরেক দল লাঠিপেটা করতে আসলে, ভোঁ দৌড় দিয়ে পেছনে হটতে গেলে, মিছিলের ফাঁদে পড়ে জীবন গেবন হয়ে যায় যায় অবস্থা। জীবনকে গেবন বানানো থেকে কোনো মতে আটকিয়ে, একটু আরামের উদ্দেশ্যে নদীর পাড়ের দিকে যাই। নদীর পাড়ে গিয়ে, পানির গন্ধ সহ্য না করতে পেরে জান নিয়ে পালাই ওইখান থেকে।এই জায়গায় বেশিক্ষণ থাকলে গ্রহ ত্যাগ করার আগে আমার প্রাণ ত্যাগ হয়ে যাবে, তাই ছুটে গিয়ে স্পেইসশিপটায় যেয়ে দেখি রেডিয়েশন ডিটেক্টর চেচাচ্ছে। রেডিয়েশন পরীক্ষা করে বুঝলাম আশেপাশে কোনো বিস্ফোরণ হয়েছে। এই ছোটো গ্রহে আবার কীসের বিস্ফোরণ? দেখার জন্য স্পেইসশিপে উঠে ওপরে দেখলাম এক জায়গার এই প্রাণিগুলো আরেক জায়গার প্রাণিগুলোর ওপর পারমাণবিক হামলা চালিয়েছে। হামলার জায়গায় হাজার হাজার দু-পেয়েদের আর্তনাদ, আহাজারি, আর হামলাকারীর অঞ্চলে আনন্দের বন্যা। মহাবিশ্বের কাছে ধুলোবালির থেকেও ছোটো একটা গ্রহে, গ্রহের চাইতেও লক্ষ কোটি গুণ ছোটো এই দু-পেয়ে প্রাণী মানুষে মানুষে কী দৈন্যতা।

স্থলে প্রভাবশালী এই প্রাণী দেখে, ভাবলাম যাই একটু জলরাশিতে, দেখি নয়ন জুড়ানো কিছু পাই কি না। সাগর গুলোর তীরে যেতেই দেখলাম শত শত টন প্লাস্টিক ভাসছে। এই সব প্লাস্টিকে প্যাঁচিয়ে মরে আছে সাগরের অনেক নিরীহ প্রাণী।

বুঝলাম স্থলের দু-পেয়েদের অত্যাচার জলেও রয়েছে।

সবুজের সাগর অরণ্যে গিয়ে দেখি, অরণ্যের এক পাশ দু-পেয়েরা কেটে সাফ করছে, আর আরেক পাশে দাউ-দাউ করে জ্বলছে আগুন। জঙ্গলের প্রাণিগুলো জীবনের মায়ায় জঙ্গল ছেড়ে প্রাণভিক্ষা চাইছে দু-পেয়েদের কাছে।। দু-পেয়েদের কেউ মমতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে আবার কেউ তাদের আর্তনাদে মজা পাচ্ছে।

বায়ুমণ্ডলে উঠে দেখি, এই গ্রহের প্রাণিদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় গ্যাস অক্সিজেন এর মাত্রা দিন দিন কমছে সাথে বাড়ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর মাত্রা, বাড়ছে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা, বাড়ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা।

অনেক গ্রহ ঘুরে, এই গ্রহের নীল জল রাশি দেখে এই গ্রহে আসার শখ জেগেছিল, স্পেইসশিপটা নিয়ে বায়ুমণ্ডলে ঢুকার সময় দেখছিলাম বেশ কয়েকটা স্যাটেলাইট। ভেবেও ছিলাম এই গ্রহের প্রাণিদের বোধহয় বিজ্ঞানে বেশ ঝোঁক।

আজ বেশ কয়েকদিন এই গ্রহে থেকে এদের সব দেখে বুঝলাম এরা দিন কে দিন নিজেদের এই গ্রহ টা কে নিজেরা নষ্ট করছে, কারোর কোনো ইচ্ছে আগ্রহ নেই নিজেদের গ্রহটাকে রক্ষা করার। শুধু কেবল মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ আছে যারা ভাবছে এই গ্রহটাকে নিয়ে, যারা ভাবছে বিজ্ঞান নিয়ে, যারা ভাবছে জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে, যারা ভাবছে প্রকৃতির কী ইচ্ছা এ নিয়ে। আর বাকিরা এই ভাবুক প্রাণিদের পাগল বলে আখ্যায়িত করে হাসছে।

এই বার এই গ্রহ পৃথিবী ত্যাগের পালা, ভালো থেকো পৃথিবীবাসী।

এক নজরে পৃথিবী

ব্যাস: 12,756 কি.মি

সূর্যের থেকে আনুমানিক দূরত্ব: 14 কোটি 96 লক্ষ কি.মি

সূর্য-পরিক্রমার সময়: 365 দিন 6 ঘণ্টা

নিজ অক্ষে ঘোরার সময়: 24 ঘণ্টা

উপগ্রহ: একটি

গড় তাপমাত্রা: 14 ডিগ্রি সেলসিয়াস

ঘনত্ব: 5.514 গ্রাম/সে.মি

গ্র্যাভিটেশনাল ত্বরণ: 9.807 মি/সে

ভর: 6.97 237×10^{24} কিলোগ্রাম

মঙ্গল (Mars)

নাঈম হোসেন ফারুকী

একটা খাড়া পাহাড় থাকবে। উঠতে ভয়ডর করবে। টিভিতে দেখালে মানুষজন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে। তুমি একটুর জন্য হাতুড়ি মিস করলে বহু ওপর থেকে পড়ে ভর্তা হয়ে যাবে। টিভির সামনে বসে থাকা লোকজনের বুক ধড়ফড় করে উঠবে।

এইবার ভাবো, এমন একটা পাহাড়, যেটায় উঠতে তেমন কোনো কষ্ট হয় না। প্রতি পনেরো মিটার সামনে আগালে তুমি মাত্র এক মিটার ওপরে ওঠো। যেই পাহাড় এভারেস্টের চেয়েও তিনগুণ উঁচু, কিন্তু উঠতে তেমন কোনো পরিশ্রম নেই। আসলে এত ধীরে ধীরে উঠেছে যে হেঁটে যেতে ছয় মাসের মতো লাগবে, আর প্রতিদিন একই জিনিস টিভিতে দেখালে লোকজন বিরক্ত হয়ে যাবে।

এই পাহাড় হচ্ছে মঙ্গলের অলিম্পাস মন্স। সৌরজগতের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। ২৬ কিলোমিটার উঁচু, ৬০০ কিলোমিটারের বেশি চওড়া। হেঁটে যেতে ছয় মাসের বেশি লাগবে। চূড়ায় উঠলে মনে হবে না এটা পাহাড়, মনে হবে বিশাল একটা মাঠের ওপরে আছ!

অলিম্পাস মন্সের চূড়ায় উঠে মরিচা ধরা লাল গ্রহের নীল সূর্যাস্ত দেখতে খারাপ লাগার কথা নয়।

এক নজরে মঙ্গলগ্রহ

ব্যাস: 6,794 কি.মি

সূর্যের থেকে আনুমানিক দূরত্ব: 22 কোটি 80 লক্ষ কি.মি

সূর্য-পরিক্রমার সময়: 687 দিন

নিজ অক্ষে ঘোরার সময়: 24 ঘণ্টা 37 মিনিট

উপগ্রহ: 2টি

গড় তাপমাত্রা: মাইনাস 63 ডিগ্রি সেলসিয়াস

ঘনত্ব: 3.9335 গ্রাম/সে.মি

গ্র্যাভিটেশনাল ত্বরণ: 3.72076 মি/সে

ভর: 6.4171×10^{23} কেজি

লাল গ্রহের নীল সূর্যাস্ত

মনিফ শাহ চৌধুরী

২০১৮ সালে নাসার কিউরিওসিটি রোভার কিছু মনোমুগ্ধকর ছবি পাঠায় যেগুলো ইন্টারনেটে খুব ভাইরাল হয়। ছবিগুলো ছিল মঙ্গল গ্রহের নীল সূর্যাস্তের। অবাক হচ্ছেন? সাধারণত নীল আকাশ আমাদের জন্য নতুন না। আমাদের আকাশ সারাদিনই নীল থাকে। শুধু সূর্যাস্ত আর সূর্যোদয়ের সময় লাল থাকে আকাশ। কিন্তু মঙ্গল গ্রহে এর উলটো। মঙ্গল গ্রহকে লাল গ্রহও ডাকা হয় যার কারণ এর আকাশ এবং মাটি, সব মরচে ধরা লোহার মতো লাল রঙের। তবে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সময় আকাশ চক্ষুশীতল নীলাভ বর্ণ ধারণ করে।

কেন?

এর জন্য আগে আমাদের পদার্থবিদ্যার দুইটি ব্যাপার জানতে হবে। একটা হলো Rayleigh Scattering. অপরটি হলো Mie Scattering.

মঙ্গলের আকাশ লাল দেখায় কেন এ প্রশ্নের আগে প্রশ্ন ওঠে আমাদের নিজেদের গ্রহের আকাশ কেন নীল? আকাশ বলতে আমরা বুঝি বায়ুমণ্ডল। আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যখন সূর্যের আলো পড়ে তখন বেগুনি এবং নীল আলো বায়ুমণ্ডলের গ্যাস মলিকিউলদের সাথে ধাক্কা খেয়ে ছড়িয়ে

পড়ে বা scattered হয়ে যায়। বাতাসে থাকা অক্সিজেন বা ওজোন অতিবেগুনিরশ্মি absorb করে নেয়। সব মিলিয়ে একটা নীলচে আলো বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে ছড়িয়ে পড়ে যাকে আমরা আকাশ বলি।

নীল এবং বেগুনি রঙই শুধু scatter করে তার কারণ হলো এগুলোর ওয়েভলেংথ অনেক অনেক ছোটো তাই মলিকিউলের সাথে সহজেই interaction করতে পারে। অন্যদিকে লাল বা হলুদ আলোর ওয়েভলেংথ অনেক বড়ো, তাই তারা সেভাবে মলিকিউলদের সাথে interact করতে পারে না। তাই সূর্য থেকে লাল ও হলুদ আলো scatter না হয়ে সরাসরি আমাদের চোখে আসে, এর কারণে আমরা পৃথিবী থেকে সূর্যকে হলুদ বা কমলা বর্ণের দেখি।

পৃথিবীতে যখন সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয় হয়, তখন সূর্য থেকে আসা আলোকে আরো বেশি রাস্তা ভ্রমণ করতে হয়, বা আরও বেশি বায়ুমণ্ডল পেরোতে হয়। এর জন্য নীল আলো scatter হয়ে আরো বেশি ছড়িয়ে যায় আর observer এর কাছে নীল আলো পৌঁছতে পারে না। অপরদিকে লাল বা হলুদ আলো যেহেতু scatter না হয়ে সরাসরি চোখে আসে, তাই নীলের অনুপস্থিতিতে একমাত্র রং লালই থাকে এবং আমাদের চোখে পুরো আকাশ কমলাভাব বা লাল লাগে। এটাই Rayleigh Scattering, যেটা ছোটো ওয়েভলেংথের আলোর (নীল, বেগুনি) বাতাসের মলিকিউলের সাথে interaction ব্যাখ্যা করে।

কিন্তু মঙ্গলে উলটো কেন?

এর উত্তর বোঝার জন্য আমাদের Mie Scattering জানতে হবে। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল খুব পাতলা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের এক শতাংশ হলো মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল। এত কম বাতাস থাকার ফল হিসেবে মঙ্গলে কোনো আলোই সেভাবে scatter করতে পারার কথা না এবং আকাশ কালো দেখানোর কথা, বা সরাসরি স্পেইস দেখতে পাওয়া উচিত। কিন্তু তা না হয়ে আমরা তাকে লাল দেখি।

এর কারণ হলো, মঙ্গলে যদিও বায়ুমণ্ডল অনেক পাতলা, কিন্তু এর দুর্বল মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য এর সূক্ষ্ম ধুলা বায়ুমণ্ডলে ভেসে থাকে। যেহেতু এ ধুলিকণার আকার বা সাইজ একটা গ্যাস মলিকিউল থেকে অনেক অনেক বড়ো, তাই ছোটো ওয়েভলেংথের কোনো আলো, যেমন নীল, এর সাথে ধাক্কা খাওয়ার পর scatter হয় না। কিন্তু বড়ো ওয়েভলেংথের আলো বড়ো ধুলির সাথে interact করে scatter হয়ে যায় এবং এর ফলে আমরা মঙ্গলের আকাশকে লাল দেখি।

সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়ের সময় আবারও লাল আলোকে বহুদূর পাড়ি দিতে হয় তাই চারপাশে scatter হয়ে আর Observer এর চোখে পৌঁছতে পারে না তাই আকাশে Observer লাল আলো দেখে না। এই লালের অনুপস্থিতিতে নীল আলো, যা বড়ো ধুলিকণায় scatter হয় না সরাসরি চোখে আসে এবং এর জন্য আমাদের কাছে পুরো আকাশ নীল মনে হয়। Mie Scattering বড়ো particle এর সাথে বড়ো ওয়েভলেংথের আলোর interaction ব্যাখ্যা করে।

গ্রহাণুদের গল্প

হৃদয় হক

***"The Universe is under no obligation to make sense to you"-* Neil deGrasse Tyson**

আপনি যখন সৌরজগতের গ্রহগুলোর ডায়াগ্রামের দিকে নজর দেবেন, দেখবেন মঙ্গল আর বৃহস্পতি গ্রহের মাঝে এক বিরাট শূন্যস্থান। জার্মান বিজ্ঞানী বোড ইউরেনাস গ্রহ আবিষ্কারের ১০০ বছর আগে দেখেছিলেন যে, একটা গ্রহ থেকে তার পরেরটা কত দূরে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবে তার নিয়ম বাঁধা আছে। তিনি সেই নিয়মটা লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু সেই নিয়ম মতে মঙ্গল ও বৃহস্পতির ফাঁকটা অনেক বড়ো। এই গ্যাপ জ্যোতির্বিদদের মনে অশান্তি দিচ্ছিল। উনারা এই ফাঁকা জায়গাতে একটা গ্রহ দেখতে চেয়েছিলেন।

১লা জানুয়ারি, ১৮০১ সাল, তাঁরা তাঁদের এই ইচ্ছা আংশিকভাবে পূরণে সক্ষম হয়েছিলেন। ইতালীয় জ্যোতির্বিদ জুসেপ্পে পিয়াজ্জি আকাশে একটি আলোকবস্তু দেখতে পান, যার গতি ছিল আকাঙ্ক্ষিত গ্রহটির জন্য একেবারেই নিখুঁত। কিন্তু তা দেখতে ছিল একটা সূক্ষ্ম বিন্দুমাত্র। তিনি প্রথমে

এটাকে ধূমকেতু ধরে নেন কিন্তু পরে জানা গেল যে ওটা ধূমকেতু নয়। আর এই নতুন বস্তুটিকে গ্রহ ধরে নাম দেওয়া হয় সিরিস। কিন্তু আদৌ কি এটি কোনো গ্রহ ছিল? এই নিয়ে বিজ্ঞানীরা প্রথমে সংশয়ী ছিলেন। এর কিছু বছর পর সেই ফাঁকা জায়গায় ১৮০২ সালে এইরকম ২য় একটি বস্তুর আবির্ভাব ঘটে। তারপর ১৮০৪ সালে ৩য় ও ১৮০৭ সালে ৪র্থ একই জাতের বস্তু দেখা যায়। এ থেকে উনারা নিশ্চিত হলেন যে এটি সৌরজগতের নতুন কোনো শ্রেণির বস্তু। যেহেতু এই বস্তুগুলো সেই সময়ের
টেলিস্কোপে ছোটো ছোটো বিন্দুর মতো দেখাতো আর খালি চোখে দেখতে পাওয়া তারাদের মতো উজ্জ্বল ছিল, তাই এই নতুন বস্তুটির নাম দেওয়া হয় "অ্যাস্টরয়েডস"(Asteroids), যা গ্রিক শব্দ, এর অর্থ হলো তারা-স্বরূপ (Star-like) বা তারা-আকৃতিক (Star-shaped)। আর বাংলায় বলা হয় "গ্রহাণুপুঞ্জ"।

২০ শতাব্দীর শুরুর দিকে তাঁরা আরো অনেকগুলো গ্রহাণুর সন্ধান পান যার আজকের সংখ্যা বিলিয়ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুমান করা হয় আমাদের সৌরজগতে ১ মিলিয়নের মতো গ্রহাণু আছে যা ১ কি.মি. থেকে লম্বা আর এদের ব্যাসার্ধ ১০০ মিটার থেকে ১০০ কি.মি. হয়ে থাকে।

কী এই গ্রহাণু? এটা কি খায় না মাথায় দেয়? এদের স্বাদ কেমন? দেখতে কেমন? ভর-ই বা কত?

আসলে কোনটা গ্রহাণু আর কোনটা গ্রহাণু নয় তার জন্য কোনো সংজ্ঞার ধরাবাঁধা নেই। তবে, সাধারণত গ্রহাণু হলো ছোটো আকৃতির একধরণের বস্তু যা পাথর বা ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি এবং এরা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ঘোরে ও এদের সীমানা বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথ পর্যন্ত বিদ্যমান। অবশ্য যেসব ছোটো আকৃতির বস্তু বৃহস্পতির কক্ষপথের বাইরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তাদের আলাদা সংজ্ঞা আছে। এ নিয়ে অন্য একদিন গল্প করবো। তা এগুলো খেয়ে দেখার ইচ্ছা আছে? সমস্যা নেই, গ্রহাণুরা নানান ফ্লেভারের হয়। যেমন : বেশিরভাগ অর্থাৎ ৭৫% গ্রহাণু কার্বন দিয়ে তৈরি, এরা হলো সি-টাইপ (C-type) বা কার্বনেশাস। আবার ৬ ভাগের ১ ভাগ বা ১৭% গ্রহাণু সিলিকন বা দস্তার তৈরি এরা হলো এস-টাইপ (S-type) বা সিলিকেশাস। আর বাকি ৮% হলো এম-টাইপ (M-type) বা মিসসেলেনিয়াস এরা অন্যান্য মেটাল পদার্থের তৈরি তবে এদের মধ্যে লোহা ও নিকেলের আধিক্য বেশি।
এদের আকারও বড়ো উদ্ভট। কেউ গোল, কেউ তে- কোনা, কেউ বা একেবারে লম্বা। বড়ো গ্রহাণুগুলো মোটামুটি গোলাকার, কিন্তু ছোটগুলো বেশি অনিয়মিত আকৃতির হয়। বিজ্ঞানীরা এদের আকার, এরা কতটুকু সূর্যের আলোর প্রতিফলন ঘটায় ও কতটুকু তাপ বিচ্ছুরণ করে তার ওপর ভিত্তি করে বের করেন।

বেশিরভাগ গ্রহাণুই মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষপথের মাঝে অবস্থান করে সূর্যকে পরিক্রম করায় এ এলাকাকে বলা হয় "প্রধান বেষ্টনী" (Main Belt) । এটিরও গঠনপ্রণালী আছে। যেমন: যদি কোনো গ্রহাণু সূর্যকে পরিক্রমার সময় এমন হয় যে সেটি সূর্যকে ২ বার পরিক্রমণ করতে যে সময় নেয়, বৃহস্পতি গ্রহ উক্ত সময়ে সূর্যকে শুধু ১ বার পরিক্রমণ করে, তাহলে সেই গ্রহাণুটি সূর্যকে পরিক্রমণের সময় বৃহস্পতি গ্রহ থেকে সাধারণত বড়ো মাপের যে আকর্ষণ অনুভব করত বৃহস্পতি গ্রহের পাশ দিয়ে তাকে ২ বার যেতে হয় বিধায় তা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। ফলে এরূপ গ্রহাণু তাদের সাধারণ কক্ষপথ থেকে আলাদা হয়ে সরে যেতে থাকে। ফলে সেখানে কিছু ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়। ১৮৫৭ সালে বিজ্ঞানী ডেনাইল ক্রিকউড (Daniel Kirkwood) এই গ্যাপটি লক্ষ করেন, তার নাম অনুসারে এ ফাঁকা জায়গার নাম রাখা হয় ক্রিকউড গ্যাপ (Kirkwood Gap)। আর বৃহস্পতির সাথে ২:১, ৩:১, ৫:২ ইত্যাদি সাধারণ ভগ্নাংশ বা অনুপাতের প্রদক্ষিণের ফলেও এরকম গ্যাপ দেখা যায়, যা প্রধান বেষ্টনীর গঠনে প্রভাব ফেলে। আপনারা তো জানেনেই শনির বলয়েরও ভাগ রয়েছে। আর এভাবে শনির বলয়ের সাথে গ্রহাণুর প্রধান বেষ্টনীর একটি মিল দেখা যায়।

গ্রহাণুকে আবার অন্য ভাবে গ্রুপ এ ভাগ করা যায়, যেমন: কিছু গ্রহাণুর বৈশিষ্ট্য একদম একই অর্থাৎ এদের সব আচার আচরণ অভিন্ন আর এদের প্যারেন্ট বড়ো বা অরিজিন একই, এরা কোনো এক বৃহৎ বস্তুর ধ্বংসাবশেষ থেকে তৈরি সম্ভবত কোনো বড়ো গ্রহাণুদের সংঘর্ষে ফলে তা ভেঙে এসব ছোটো গ্রহাণু তৈরি হয়। এদের বলা হয় একই পরিবারভুক্ত বা গ্রুপভুক্ত গ্রহাণু। আনুমানিক সৌরজগতের এক-তৃতীয়াংশ গ্রহাণুই কোনো না কোনো পরিবারভুক্ত।
যেমন : ইউরোপা ফ্যামিলির ৪০০ এরও বেশি সদস্য রয়েছে।

অনেকেই হয়তো নানা মুভিতে দেখেছেন যে, নায়ক ভিলেন-কে আক্রমণ করার জন্য মহাকাশে স্পেইসশিপ নিয়ে এই গ্রহাণু বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে বড়ো বড়ো গ্রহাণুর ছোটো ছোটো ফাঁক-ফোকর দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবে এই বেষ্টনীর অধিকাংশই ফাঁকা। আর এদের একে অপর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত যে, আপনি যদি একটি গ্রহাণুর ওপর দাঁড়ান তাহলে সেখান থেকে আপনার চোখ যদি সবচেয়ে ভালোও হয় তাও খালি চোখে অন্য একটি গ্রহাণুর দেখা পাওয়া মুশকিল। আর এরা সংখ্যায় বেশি হলেও মোটেও এত বড়ো নয়। আপনি যদি সব গ্রহাণুগুলো একত্র করেন তাহলে তার আকার আমাদের চাঁদের চেয়ে ছোটো হবে। গ্রহাণু বেষ্টনীর মোট ভর চাঁদের ৪% যা প্লুটোর থেকেও কম। এরা যে মঙ্গলের থেকেও কম ভরের তা এমনিতেই বোঝা যায়, তা না হলে এরা এর চলার পথে বেশ কিছু অসুবিধা ঘটাত, সন্দেহ নেই।

গ্রহাণুদের মধ্যে "সেরেস" (Ceres) সবচেয়ে বড়ো। বিজ্ঞানী পিয়াজি প্রথমে এর নাম রাখেন "সেরেরে ফেরদিনানদিয়া" (Cerere Ferdinandea)। "সেরেরে" নামের উৎস হলো রোমান দেবী সেরেস যিনি অঙ্কুরোদগম , ফসল ফলানো এবং মাতৃস্নেহের দেবী। আর "ফেরদিনানদিয়া" নামটি এসেছে নেপলস ও সিসিলির রাজা ৪র্থ ফার্দিনান্দ এর নামানুকরণে। কিন্তু এই নাম নিয়ে অনেকের মতবিরোধ থাকায় তার নাম রাখা হয় শুধু "সেরেস"। তার মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে এটি অনেকটাই গোলাকার। সেরেস গ্রহাণু বলয়ের একমাত্র বামন গ্রহ । মাত্র ৯৫০ কিলোমিটার ব্যাসের অধিকারী সেরেস গ্রহাণুপুঞ্জের সবচেয়ে বড়ো জ্যোতিষ্ক। গ্রহাণুপুঞ্জের সকল গ্রহাণুর মোট ভরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভর রয়েছে সেরেস নিজের। সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণসমূহ থেকে জানা যায়, সেরেসের পৃষ্ঠ সম্ভবত পানি, বরফ ও পানিতে দ্রবীভূত বিভিন্ন খনিজ পদার্থের মিশ্রণ দিয়ে তৈরি । ধারণা করা হয় এর কেন্দ্র পাথুরে এবং চারপাশ ঘিরে তরল পানির মহাসাগর রয়েছে যা কিনা পৃথিবীর সব পরিষ্কার পানির থেকেও বেশি। এছাড়া কিছু বড়ো গ্রহাণু হলো - ভেস্তা, হাইজিয়া ও পালাস। এদের ব্যাস যথাক্রমে ৫৩৪,৪৫০,৬০৮ কি.মি.

এবার একটু "ভেস্তা"(Vesta) - তে ঘুরতে যাওয়া যাক। ভেস্তা হলো ২য় বড়ো ও ভারী গ্রহাণু। এটির আকার গোল তবে পুরো গোল না। এই ধরেন আপনি একটি বড়ো গোল বলের ওপর বসলে তা ওপর নিচে চ্যাপ্টা ও দুপাশে যেমন একটু বের হয়ে লম্বা হবে তেমন। এটি পৃথিবী থেকে দেখতে পাওয়া গড়ে ৬ম উজ্জ্বল গ্রহাণু। একে গভীর রাতের সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত আকাশে খালি চোখে দেখা যায়। এর দূরত্ব সূর্য থেকে সেরেসের দূরত্বের চেয়ে একটু বেশি। এর দক্ষিণে অনেক সংঘর্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় অনেক গর্ত হয়ে গিয়েছে। তবে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন সেখানে আগ্নেয়গিরি রয়েছে।

এছাড়াও বিভিন্ন গ্রহাণুতে নানা স্পেইসক্রাফট বেড়াতে গিয়েছে, এদের বেশিরভাগই ছিল ফ্লাই-বাই। সেসব গ্রহাণুদের মধ্যে কিছু হলো : লুটেইটিসা, স্টেইন্স, গ্যাস্প্রা, আইডা ইত্যাদি।
অবশ্য গ্রহাণুদেরও উপগ্রহ আছে। আইডা (Ida) হলো প্রথম গ্রহাণু যাকে ছোটো একটি উপগ্রহের সাথে দেখা মেলে, তার নাম ডেক্ট্যাইল (Dactyl)। আসলে এদের বাইনারি গ্রহাণুও বলা যায়। আরও একটা গ্রহাণুর নাম হলো ক্লিওপেট্রা। এটা একটা মজাদার আকৃতির গ্রহাণু, যাকে বলা হয় ডগ-বোন সেপ। তবে এর দুটো উপগ্রহ আছে।

এবার আসি অন্য কথায়। আপনার হয়তো মনে হতে পারে যে এগুলো হয়তো আপনার বাগানে বা পার্কে পাওয়া বা দেখা অনেক শক্ত পাথর । আসলে তা কিন্তু নয়।

কিছু বছর আগে বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন যে, গ্রহাণুগুলো অনেক বছর ধরে একে অপরের সাথে ধাক্কাধাক্কি করে সংঘর্ষ কাটিয়ে আসছে। কখনো অনেক দ্রতগামী এক গ্রহাণু অন্য একটিকে ধাক্কা দেয়, আবার কখনো বা আস্তে। ধীরগতিতে যে সংঘর্ষ ঘটে তা অতটা বলবৎ নয়। মানে এ সংঘর্ষের ফলে আঘাতপ্রাপ্ত গ্রহাণুর ওপর ফাটল ধরে, বা তার ওপরই ছোটো ছোটো পাথুরে খণ্ড তৈরি করে কিন্তু তা ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় না। এইরকম অনেক বার আঘাত খাওয়ার ফলে এমন এক অবস্থার তৈরি হয় যার ফলে তাকে বলা হয় "Rubble Pile"বাংলায় বলা হয় "পাথরের স্তূপ"। এটির মানে হলো একটি বড়ো পাথরে অংশ নয় (যেমন: পৃথিবী) কিন্তু বিভিন্ন ছোটো ছোটো পাথরের সমন্বয়ে গঠিত একটি বস্তু। আঘাতের ফলে যে পাথরগুলো থাকে তা গ্রহাণুটির মাধ্যাকর্ষণ বলের ফলে তার গায়ে লেগে থাকে। এই ধরেন ফেটে যাওয়া একটা গাড়ির জানালার কাচ যা আপনি হালকা চাপ দিলেই ভেঙে গুড়ি গুড়ি হয়ে পড়ে যাবে এমন শুধু কোনোরকমে টিকে আছে। ঠিক এমন অবস্থায় মাধ্যাকর্ষণ বলের ফলে গ্রহাণুটি টিকে থাকে। তবে এর ঘনত্ব অনেক কম কারণ, এই ছোটো ছোটো পাথর দিয়ে তৈরি বলে এদের মাঝে ফাঁকা জায়গা আপেক্ষিক ভাবে বেশি। এই বিষয়ে আরও ভালো ভাবে নিশ্চিত হওয়া যায় যখন জাপানের একটি স্পেইসক্রাফট "ইটাকাওয়া"নামের একটি গ্রহাণুতে বেড়াতে যায়। এই গ্রহাণুর অবস্থার বিবরণ দেওয়ার জন্য একটা কথাই যথেষ্ট আর তা হলো এক "বিশৃঙ্খলাময় জগাখিচুড়ি"। আর কথা মতো এর ঘনত্বও অনেক কম।

এটা ভাবতেই অদ্ভুত লাগে যে কিছু গ্রহাণু আসলে কিছুই না বরং কিছু

মুক্ত ভাবে ভাসমান নুড়ি পাথরের ব্যাগ। কী আর করার মহাবিশ্ব তো আর আমাদের কথা শুনতে রাজি নয়। তবে উনি পুরাই চমকপ্রদ জিনিস।

কেন এই গ্রহাণু বেষ্টনী (Asteroid Belt) আছে বা কীভাবে হলো?

যখন আমাদের সৌরজগৎ তৈরি হচ্ছিল, আন্তঃনাক্ষত্রিক ধূলিকণার মেঘের কেন্দ্রের আশেপাশের অন্য অংশ হতে বেশি ঘনত্বপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে খুব দ্রুত সংকুচিত হতে থাকে। সেখানে তৈরি হয় আমাদের প্রোটোসূর্য তারপর সেখানে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং দৃশ্যমান আলোর দেখা মেলে। তাপমাত্রা আরও অনেক বাড়ার পর শুরু হয় নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া, সৃষ্টি হয় আমাদের পরিপূর্ণ সূর্য যা মেঘটির কেন্দ্রের স্থান দখল করে নেয়। এরপর আশেপাশের সকল বস্তু চাকতির ন্যায় আকৃতি ধারণ করতে শুরু করে। আশেপাশের সকল বস্তু সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরতে শুরু করে। আর সেখান থেকে তৈরি হয় গ্রহ। গ্রহ তৈরি হবার সময় এরা মেঘ থেকে অনেক বেশি উপাদান আকর্ষণ করে নিতে শুরু করে। স্বল্প ভর থেকে অধিক ভর যুক্ত হতে থাকে, আকারও বাড়াতে থাকে। আমাদের রক্ষক মানে বড়ো ভাই বৃহস্পতি তার আশেপাশের অধিকাংশ উপাদান আকর্ষণ করে নেয় তবে সবটুকু নয়। যেগুলো বাকি থাকে তারা ভারী উপাদানগুলো মাঝে টেনে নেয় আর হালকা উপাদানগুলো ওপরের স্তরে আকর্ষিত হতে থাকে মানে তারাও গ্রহ হবার চেষ্টা চালায়। গ্রহ হবার শর্তগুলো মোটামুটি ভাবে পূর্ণ হয়েছিল, কিন্তু পুরোপুরি ভাবে নয়। তাই গ্রহটি গঠিত হতে পারেনি বা হয়েও স্থিরতা লাভ করেনি। কোনো কারণে তারা মহাকাশে অজ্ঞাত বিপর্যয়ের ফলে ভেঙে হাজারো খণ্ড হয়ে যায়, সেই সম্ভাব্য বা বিনষ্ট গ্রহের দেহবস্তুই ছোটো ছোটো টুকরো হয়ে ওখানে ছড়িয়ে আছে, আর সূর্যকে পরিক্রমণ করছে। তাই আমরা এসব গ্রহাণু দেখি। তাদের কিছু হচ্ছে গ্রহ গঠনের এই ঘন কোর বা মাঝের অংশ থেকে আর কিছু তার ওপরের হালকা অংশে থেকে, তাই এদের উপাদানে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। আবার অনেকের ধারণা, গ্রহগুলির জন্মের সময় যেসব অতি ক্ষুদ্র বস্তুর সৃষ্টি হয়েছিল, হয়তোতারা কোনও কারণে জমাট বেধে বিরাট গ্রহে রূপান্তরিত হতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু এই ভাঙাচোরা গ্রহাণুগুলি সুয্যিমামাকে অন্যান্য ভাগ্নের (গ্রহের) মতোই প্রদক্ষিণ করতে

শুরু করে দিয়েছিল। এদেরকে ব্যর্থ গ্রহও বলা হয়। এরা আবার "Minor planet" অথবা "Planetoid" গ্রুপের অন্তর্ভূক্ত।

ধারণা করা হয় যে, বিলিয়ন বছর আগে মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝে আরো অনেক গ্রহাণু ছিল। কিন্তু সেগুলো হয় আমাদের বড়ো ভাই খেয়ে ফেলেছেন না হয় তার ক্ষমতা দেখাবার জন্য মাধ্যাকর্ষণ দিয়ে তাদের কক্ষপথ পরিবর্তনের মাধ্যমে জোর করে বের করে দেন। অবশ্য এর ফলে হয়তো মঙ্গল গ্রহের আকার ছোটো। কারণ মঙ্গল গ্রহ খেয়ে বেড়ে ওঠার সময়, বড়ো ভাই বৃহস্পতি তার খাদ্য মেরে দিয়েছেন।

মোটামুটি অধিকাংশ গ্রহাণুই প্রধান বেষ্টনীতে থাকে কিন্তু সবগুলো নয়। কিছু কিছু গ্রহাণু মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথের ভেতর ঢুকে যায়। এবং অন্যান্য গ্রহাণু থেকে সূর্যের বেশি নিকটে চলে আসে। তাদের বলা হয় মঙ্গল কক্ষপথ লঙ্ঘনকারী গ্রহাণু (Mars Crossing Asteroid) বা "MAC"। আরো কিছু গ্রহাণু আছে যাদের কক্ষপথ এদের থেকেও সূর্যের অতি নিকটে। তাদের বলা হয় কী? পৃথিবী লঙ্ঘনকারী গ্রহাণু? ভাই বোকাবনে যাবেন না, তাদের বলা হয় অ্যাপোলো (Apollo)। এর নামকরণ করা হয় এদের জাতের প্রাপ্ত প্রথম গ্রহাণুটির নামে। আবার আরেক জাতের আছে তারা বলতে গেলে সরাসরি পৃথিবীর কক্ষপথের ভেতরে অবস্থান করে। এদের বলা হয় "অ্যাটেন"(Aten) গ্রহাণু। অ্যাটেন ও অ্যাপোলো গ্রুপের গ্রহাণু পৃথিবীর অনেক কাছে আসে তাই এদের বলা হয় পৃথিবীর কাছের গ্রহাণু (Near-Earth Asteroid)। " অ্যামোর"(Amor) নামের আরেকটি আছে, এরা পৃথিবীর অনেক নিকটে আসে। তবে এর কক্ষপথে প্রবেশ করে না, এদের অধিকাংশই মঙ্গলের কক্ষপথ ক্রস করে।

তবে এরা কাছাকাছি আছে বলে এ নয় যে এরা আমাদের আঘাত করবে। যেমন: এদের কক্ষপথ হয়তো বাঁকানো যার ফলে একেবারে সরাসরি আমাদের সাথে ওদের সাক্ষাৎ হয় না, অর্থাৎ ক্রসিং হয় না। তবে কিছু গ্রহাণু আছে যারা পৃথিবীর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করে। তবে, তার মানে এই না যে এরা আমাদের সবসময় আঘাত করবে। মানে বিষয়টা এমন যে আপনি তো গাড়ির সাথে ধাক্কা না খেয়ে রাস্তা পাড়ি দিতে সক্ষম হন। কী হন না? কিন্তু মাঝে মাঝে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে আর কী। যেমন:

৩ কি.মি চওড়া টোটাইস নামক এক গ্রহাণু ২০০৪ সালে ৬.৫ মিলিয়ন কি.মি. এর জন্য আঘাত থেকে বঞ্চিত হয়। এরও সেই একই অবস্থা। কিন্তু এর জন্য নানা জ্যোতির্বিদরা সতর্ক আছেন, তাই তাঁরা রাতে নানা অবজার্ভেটরিস দিয়ে আকাশকে প্রতিনিয়ত স্ক্যান করে যাচ্ছেন।

অারো এক ধরণের গ্রহাণু আছে যারা ট্রোজান (Trojan) নামে পরিচিত। আগে বলি ট্রোজান কী। জ্যোতির্বিজ্ঞানে ট্রোজান হলো ছোটো একটি বস্তু যা বড়ো বস্তুটির সাথে তার কক্ষপথ ভাগাভাগি করে নেয় যা স্থিতিশীল হয়। এমন স্থিতিশীল জায়গাগুলোকে বলে ল্যাগ্রাঞ্জ পয়েন্ট (Lagrange Point) বা এল-পয়েন্ট। ১৭৭২ সালে বিজ্ঞানী জোসেফ-লুইস-ল্যাগ্রাঞ্জ (Joseph-Louis Lagrange) "Three-body problem" সমাধানের মাধ্যমে এই পয়েন্টগুলো আবিষ্কার করেন। এখানে ৫টা পয়েন্ট থাকে তার মধ্যে ১ম ৩টা (এল - ১,২,৩) আপেক্ষিক ভাবে কম স্থিতিশীল মানে কিছু রাখলে তা একেবারে বরাবর পয়েন্টে না বসলে, সেটা গেছে!

এই ৩টা পয়েন্ট বিজ্ঞানী লিওয়নহার্ট ইউলার (Leonhard Euler) বিজ্ঞানী ল্যাগ্রাঞ্জের কিছু বছর আগে আবিষ্কার করেন। বাকি দুটো করেন বিজ্ঞানী ল্যাগ্রাঞ্জ এবং এই ২টা পয়েন্ট (এল-৪ ও ৫) আপেক্ষিক ভাবে বেশি স্থিতিশীল। মানে, এখানে আপনি কিছু রাখলে তা পয়েন্টে একেবারে বরাবর না বসলেও চলবে। এ ৫টি পয়েন্টের মধ্যে আপনি যা-ই রাখবেন তা

দুই বস্তুর থেকে সমান মাধ্যাকর্ষণ বলের ফলে তা যেকোনো একটি বস্তুর দিকে যাবে না কারণ আকর্ষণ বল দুদিক থেকে তাকে সমান ভাবে টানছে তাই তা আজীবন সেখানেই থেকে যাবে। ট্রোজানরা এই এল- পয়েন্টেগুলোর ৪ ও ৫ নং পয়েন্ট-এ বিদ্যমান। এই পয়েন্টগুলো ৬০° কোণে আসল বস্তুর

কক্ষপথে সামনে ও পেছনে থেকে বড়ো বস্তুকে কেন্দ্র করে ঘোরে। গ্রহ ও উপগ্রহের মধ্যেও এই পয়েন্ট কাজ করে, তাই সেখানেও ট্রোজান থাকতে পারে। যেমন : শনির ৪টি ট্রোজান মুন বা চাঁদ আছে।

আমাদের সৌরজগতের মধ্যে যেসব ট্রোজান আছে তার মধ্যে বেশিরভাগ ট্রোজান বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথে অবস্থিত। কারণ, আমাদের সৌরজগতে সূর্য ও বৃহস্পতি হলো সবচেয়ে ভারী বস্তু এবং যার ফলে তা লাগান্রের থিওরির সাথে মিলে যায়। বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথে অবস্থিত যেসব ট্রোজান এর ৬০° সামনে বা আগে থাকে তাদের নামকরণ করা হয় গ্রিক পৌরাণিকের নায়কদের নাম অনুসারে। আর যারা ৬০° পেছনে তাদের নাম দেওয়া হয় গ্রিক ট্রোজান সেনাপতিদের নামানুসারে। তবে, একত্রে এরা ট্রোজান গ্রহাণু নামে পরিচিত। আরেকটা বিষয় উক্ত ৫ এল-পয়েন্ট বৃহস্পতি গ্রহের সাথে সমান তালে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। বৃহস্পতির আনুমানিক ১ মিলিয়নেরও বেশি ট্রোজান আছে এবং তারা ১ কি.মি. থেকেও বেশি বড়ো। এর চেয়েও বেশি ট্রোজান থাকতে পারে যা বিজ্ঞানীরা দেখেননি, কারণ গ্রহাণুরা অনেক অনুজ্জ্বল, অনেক দূরে এবং পৃষ্ঠতল কালো। ধারণা করা হয়, সৌরজগৎ সৃষ্টির সময় কিছু আন্তঃনাক্ষত্রিক ধূলিকণার মেঘ থেকে সৃষ্ট কঠিন বস্তুগুলো বৃহস্পতির এল-পয়েন্ট এ আটকা পড়ে যায়, আর তখন থেকেই সেখানে আছে।

বড়ো ভাই বৃহস্পতি ছাড়াও অন্যান্য গ্রহেরও ট্রোজান আছে। যেমন: মঙ্গলের ৯টি, নেপচুনের ২২টি, ইউরেনাসের ২টি ও পৃথিবীর ১টি।

পৃথিবীরটা আবিষ্কার করা হয় ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে। এটি WISE বা (Wide-field Infrared Survey Explorer) দিয়ে আবিষ্কার করা হয় যা অবলোহিত আলো ব্যবহার করে মহাবিশ্বের নানা বস্তুর ছবি নেয় বা স্ক্যান করে। এর নাম "2010 TK7 "। এর ব্যাসার্ধ ৩০০ মি. এবং এটি ৮০০ কি.মি. দূরে। এ কক্ষপথের মধ্যে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ও পৃথিবীর কক্ষপথের সামনে বা আগে অবস্থান করে। অবশ্য এছাড়াও কিছু গ্রহাণু আছে যা পৃথিবীর কক্ষপথে ঢুকে পড়ে কিন্তু পৃথিবীর কক্ষপথের সাথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে না। তাদের নিজের আলাদা কক্ষপথ রয়েছে যা উপবৃত্তাকার এবং হেলানো। যার ফলে তারা পৃথিবীর কাছাকাছিই থাকে কিন্তু আমাদের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে না। তারা অবশ্য অনেক সময় আমাদের কাছে আসে আবার দূরে চলে যায়। এটি অবশ্য একটু অদ্ভুত। তবে তা অরবিটাল মেকানিক্স এর সাধারণ বিষয়। কিছু মানুষ এই গ্রহাণুদের পৃথিবীর চাঁদ বলেন কিন্তু আসলে তা নয়, তবে বলা যায় এরা আমাদের সাথে কো-অরবিটালে যুক্ত। এমন গ্রহাণু খুবই কম। তবে এর মধ্যে নামকরা একটি হলো "কুয়েনিয়া" (Cruithne)। এটি যখন আমাদের কাছাকাছি আসে তখন পৃথিবী ও তার মধ্যে ১২ মিলিয়ন কি.মি. এর পার্থক্য থাকে।

আরেকটা কথা, গ্রহাণুদের নাম মূলত দেবীদের নামে হয়ে থাকে যেমন: সেরেস, ভেস্তা, জুনো ইত্যাদি। কিন্তু এদের সংখ্যা এত বেশি হয়ে যায় যে, তা আর দেবীদের নাম দিয়ে কুলানো যায়নি। তাই অনেক প্রসেস করে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের পারমিশন নিয়ে কোনো জ্যোতির্বিদ যে গ্রহাণু আবিষ্কার করেন উনারা উনাদের পছন্দের নাম দেন। উনারা নামের সাথে নানা নাম্বারও দেন। অনেক জ্যোতির্বিদরা তাঁদের নামের সাথে মিলিয়েও আবিষ্কৃত গ্রহাণুটির নাম রাখেন।

অরোরা

মোহাম্মদ আহসান নাহিয়ান

অরোরার নাম শুনেছেন কখনো? না! না! আপনার পরিচিত কোনো মানুষের নাম জিজ্ঞেস করছি না, বিজ্ঞানের ভাষায় অরোরার গল্প শুনেছেন কি না সেই প্রশ্নই করলাম। যদি না শুনে থাকেন, তবে একটু ধৈর্য ধরে এই লেখাটা পড়ে ফেলুন, প্রাথমিক ধারণা পেয়ে যাবেন!

অরোরা এই পৃথিবীর রহস্যময় যত সুন্দর সুন্দর ব্যাপার রয়েছে তার মাঝেই একটি। আকাশের রং আমরা সচরাচর নীল বলেই এতকাল দেখে এসেছি। অনেকে বলতে পারেন আসমানি। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত কিংবা কোনো এক অলস বিকেলে আকাশে লাল, কমলা, বেগুনি সহ হরেক রকম রঙও আমরা দেখেছি। কবিরা তাই হয়তো বলে থাকেন যে, আকাশ কখনো পুরানো হয় না। যেখানেই তাকাবেন, প্রতিদিন দেখবেন আকাশ একেক রূপে নিজেকে রাঙিয়ে বসে আছে। কিন্তু অরোরা যারা কখনো দেখেননি তারা ভাবতেও পারবেন না আমাদের চেনা আকাশের নতুন এই রূপটি কত আলাদা। কল্পনায় আজ আমরা সেই অরোরার দৃশ্যই একটু দেখার চেষ্টা করব। আর পাশাপাশি একটু চিন্তা করে দেখব যে, এই বিচিত্র ঘটনার পেছনের রহস্যটাই বা আসলে কী!

অরোরা সচরাচর দেখা যায় মেরু অঞ্চলের দিকে, আর সেই জন্যই হয়তো একে বাংলায় মেরুজ্যোতি বলা হয়ে থাকে। নামের সাথে মিল রেখে এক জ্যোতির্ময় আলো আকাশে ভেসে বেড়ায় অরোরার আকারে। আর সেই আলোর রয়েছে

নানা বাহার। কোনো এক অপার্থিব আলো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসে আকাশ থেকে। নীল, লাল, সবুজ, গোলাপি, বেগুনি নানা রঙের আলো দেখা যায় এই সময়। অনেক বছর আগে যখন আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের অত শত জানতাম না, অনেকেই একে স্বর্গীয় আলোও ভেবে বসেছিলেন! এখন অবশ্য আমরা অরোরার পেছনের বৈজ্ঞানিক কারণগুলো জানি। কিন্তু আগে অনেকে ভাবতেন যে মানুষ মারা গেলে তাদের আত্মাই নাকি অরোরার আলো হয়ে আকাশে উড়ে বেড়ায়। নর্স মিথোলজিতেও আছে অরোরার উল্লেখ। সেখানে অবশ্য অরোরা আগুনের তৈরি একধরনের ব্রিজ যেটা নাকি স্বর্গের দেবতারা নিজেদের চলাচলের জন্যে বানিয়েছেন। তবে যে যাই বলুক না কেন, আর যাই ভাবুক না কেন, একটা কথা কেউ কখনো অস্বীকার করতে পারেনি যে, অরোরা অসম্ভব সুন্দর। সত্যিই যেন অপার্থিব এক আলো পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ায় অরোরার নাম করে। এই অদ্ভুত সুন্দর অরোরা কীভাবে সৃষ্টি হয় সেটাই ছিল বিজ্ঞানমনস্ক অনেকের প্রশ্ন।

সূর্য আমাদের থেকে ৯৩ মিলিয়ন মাইল দূরে থাকলেও সূর্যের সাথে পৃথিবীর রয়েছে এক অদ্ভুত ভালোবাসা। সত্যি সত্যি ভালোবাসলে নাকি প্রতিদানের আশা না করে কেবল উপকার করে যেতেই ইচ্ছে করে মনে মনে। সূর্যের ভালোবাসাও যেন ঠিক তেমন! পৃথিবী অত দূরে সূর্যকে চিঠি কিংবা অন্য কিছু না পাঠাতে পারলেও সূর্য ঠিকই পৃথিবীতে আলো পাঠিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। আর শুধুই কি আলো? সাদা চোখে আমরা যা যা দেখি সূর্য তার থেকেও অনেক বেশি প্রভাব প্রতিনিয়ত রেখে যাচ্ছে আমাদের এই পৃথিবীজুড়ে। সূর্যের আলো পেয়ে পৃথিবীর গাছপালা,পশুপাখি যেমন শক্তি অর্জন করে তেমনই সূর্যে যখন ঝড় হয় সেই ঝড়ের আঁচও ঠিক এসে আছড়ে পরে আমাদের আশেপাশে। সূর্যের বড়ো ধরনের ঝড়ের কারণে সৃষ্টি হওয়া অসংখ্য চার্জড সোলার পার্টিকেল ছড়িয়ে পড়ে মহাশূন্যে। সেই ছড়িয়ে যাবার পথে যদি আমাদের পৃথিবীর সাথে দেখা হয়ে যায় সেই পার্টিকেলগুলোর, তখন আমাদের পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর বায়ুমণ্ডল যথেষ্ট নড়েচড়ে বসে, আর রিঅ্যাক্ট করে। চার্জিত এইসব পার্টিকেল বায়ুমণ্ডলে আসামাত্রই আমাদের চেনা বায়ুমণ্ডলের অণু-পরমাণুর সাথে জড়িয়ে পড়ে আর সেই পরমাণুগুলো সেই আধানগ্রস্থ পার্টিকেলের কারণে আলোকিত হয়ে ওঠে। জড়িয়ে পড়া বলতে আসলে বোঝায় অ্যাটমের এক্সাইটেড স্টেট। পরমাণুর ভেতরে থাকে একটা কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াস। সেই নিউক্লিয়াসকে অরবিটে অরবিটে ঘিরে রাখে ইলেকট্রনের মেঘ। যখন সূর্যের আধানগ্রস্থ কণাগুলো পরমাণুর সাথে সংঘর্ষে যায় তখন পরমাণুর ইলেকট্রনগুলো উচ্চতর শক্তিস্তরে পৌঁছে যায়। এর ফলে নিউক্লিয়াসের সাথে দূরত্ব বেড়ে যায় ইলেকট্রনের। এরপর যখন একটা ইলেকট্রন আবার আগের নিচু শক্তিস্তরে নামতে যায় ঠিক তখন টুক করে একটা ফোটন মুক্তি লাভ করে। আর আমরা তো জানিই এই ফোটনই আমাদের চোখে আলো হয়ে ধরা দেয়।

অরোরার মতো এই ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের আশেপাশেও হয়! যেমন, নিয়ন লাইট। যদি কেউ কখনো নিয়ন সাইন দেখে থাকেন আর কী করে নিয়ন আলো কাজ করে জেনে থাকেন, তাহলে সাদৃশ্যটা খুব সহজেই ধরে ফেলতে পারবেন। নিয়ন আলোতে নিয়ন গ্যাসের পরমাণুগুলোকে উত্তেজিত করতে বিদ্যুতের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। আর এ কারণেই নিয়ন আলো অন্য যে-কোনো আলো থেকে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। অরোরাতেও কতকটা একই রকম ব্যাপার ঘটে। কিন্তু অনেক অনেক বিশাল পরিসরে! আধানগ্রস্থ কণা সূর্য থেকে এসে যখন বাতাসে থাকা পরমাণুর সাথে সংঘর্ষিত হয় তখন পরমাণুগুলো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আর তারা পূর্বাবস্থায় ফিরে শান্ত অবস্থায় যেতে যেতে ছড়িয়ে দেয় উজ্জ্বল আর বাহারি সব আলো। আর সেই অরোরার আলোতে মুগ্ধ হয়ে থাকি আমরা পৃথিবীর অধিবাসীরা।

অরোরা অনেক সময় দেখা যায় পর্দার মতো, কখনো দেখা যায় সর্পিল আকারে আবার কখনো বা বৃত্তচাপের মতন! প্রায়ই দেখা যায় যে,অরোরা ঠিক ঠিক পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের

লাইন অনুসরণ করে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে! বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অরোরার আলো হয় সবুজ রঙের কিন্তু নানা ধরনের সবুজ ছাড়াও দেখা পাওয়া যায় হালকা গোলাপি, লাল, বেগুনি আর সাদা আলোরও। একেবারে উত্তর দিকের দেশগুলো যেমন, কানাডা, আলাস্কা, স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশগুলো, আইসল্যান্ড, গ্রিনল্যান্ড, রাশিয়ার দিকে অরোরা নিয়মিতভাবে দেখা যায়। তবে অনেক সময়ই তীব্র আলো ছড়িয়ে পরে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু অঞ্চলেও। দক্ষিণ মেরুর দিকেও অবশ্য অরোরার প্রভাব লক্ষ করা যায়।

অরোরার এই নানা রকমের রং নিয়েও মানুষের মনে কাজ করে নানা ধরনের জল্পনা কল্পনা। অনেকের কাছেই রঙের এই পরিবর্তন খুব রহস্যজনক মনে হয়। তবে আসলে এই হরেক রঙের জন্যে দায়ী হলো বায়ুমণ্ডলের হরেক রকম গ্যাস। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের একেক স্তরে একেক সময় লক্ষ করা যায় একেক ধরনের গ্যাস। আর গ্যাসের ওপর নির্ভর করে পরমাণুর উত্তেজিত হওয়ার পর নিঃসৃত আলোও হয় ভিন্ন ভিন্ন রঙের। যেমন: ধরা যাক- অক্সিজেন এর কারণে তৈরি হয় সবুজ আলো। আবার নাইট্রোজেন এর কারণে দেখা যায় নীল কিংবা লাল রঙের আলো।

বিজ্ঞানের এই যুগে আজ আর অরোরা তাই প্রাচীন পৃথিবীর মতোন রহস্যময় কোনো ঘটনা নয়। আর দশটা প্রাকৃতিক ঘটনার মতোই স্বাভাবিক। কিন্তু তারপরও অরোরা নিয়ে আগ্রহের কোনো কমতি নেই মানুষের মাঝে। এখনও মানুষ অরোরার আলো মুগ্ধ হয়ে দেখার আশায় হাজার হাজার মাইল ছুটে যায়। পেছনের বিজ্ঞানটুকু জানা থাকার পরও হয়তো তাই অরোরার দিকে তাকিয়ে মনে হয় এই আলো পৃথিবীর নয়, রূপকথা কিংবা অপার্থিব কোনো জগৎ থেকে ভেসে আসা এক দ্যুতি। আমাদের এই পৃথিবী সত্যি সত্যিই অনেক বেশি সুন্দর।

পৃথিবী গোল-ঘূর্ণনশীল হলে আমরা কেন ছিটকে পড়ি না?

নাঈম হোসেন ফারুকী

পৃথিবী ঘোরা সত্ত্বেও আমরা পড়ে যাই না কেন?

পৃথিবীর বিষুবীয় ব্যাসার্ধ r = 6378 km

পরিধি 2πr = 40074 km = 40074×1000 m

এই দূরত্ব পৃথিবী অতিক্রম করে

24 ঘণ্টায় = 86164 সেকেন্ডে।

তার মানে পৃথিবীর রৈখিক বেগ = 40074 × 1000 m / 86164 s = 465.1 ms-1

তাহলে কেন্দ্রবিমুখী ত্বরণ,

= v2/r = 465.12 / (6378 × 1000)

= 0.0339 m/s2

এর তুলনায় অভিকর্ষজ ত্বরণ g = 9.81 ms-2 প্রায়

9.81/0.0339

= 289.38 গুণ বেশি শক্তিশালী।

তাই আমরা ছিটকে পড়ি না।

বৃহস্পতি (Jupiter)

নাঈম হোসেন ফারুকী

সৌরজগতের সবগুলো গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণু মিলে যেই ভর হয়, এক জুপিটারের ভর তার আড়াই গুণ। বৃহস্পতির বিশাল পেটের ভেতর ১৩০০টা পৃথিবী অনায়াসে এঁটে যাবে। এর অসাধারণ মহাকর্ষ আশেপাশে অন্য কোনো গ্রহের জন্ম হতে দেয় না, হওয়ার চেষ্টা করলেই গুঁড়া করে দেয়। আশেপাশের সব গ্রহাণু, ধুমকেতু বেশি কাছে আসলেই আছড়ে পড়ে জুপিটারের বুকে, পৃথিবীকে ছুঁতে পারে না। মহামান্য গ্রহরাজ যেন রাজদণ্ড হাতে ন্যায়বিধান করে চলেছেন তার রাজ্যে।

বৃহস্পতির বিশাল বায়ুমণ্ডল অদ্ভুত সুন্দর, নানা রঙের অপূর্ব সব প্যাটার্ন খেলা করছে সেখানে। আছে উদ্ভট সব রহস্যময় মেঘ, লাল চোখের মতো ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে গ্রেট রেড স্পট। সেটা এই সৌরজগতের সবচেয়ে বড়ো ঝড়, এত বড়ো যে দুইটা পৃথিবী ঢুকে যেতে পারে তার ভেতর। অন্তত তিনশো বছর ধরে এই মহাঘূর্ণিঝড় শোঁ শোঁ করে কেয়ামত ঘটাচ্ছে জুপিটারের বুকে। তুমি যদি নরমাল একটা স্পেইসস্যুট পরো, ওই গ্রহের ধারে কাছেও পৌঁছতে পারবে না। তীব্র রেডিয়েশন তিন লক্ষ কিলোমিটার দূর থেকে তোমাকে মেরে ফেলবে।

তাই যদি খুব ভালো, রেডিয়েশন প্রুফ, তাপরোধক, চাপরোধক মারাত্মক শক্তিশালী একটা স্পেইসস্যুট পরে দানবীয় গ্রহরাজের রহস্যময় মেঘের ভেতর ঝাঁপ দাও। কী দেখবে ঠিক? চলো ঘুরে আসি জুপিটার থেকে।

জুপিটারের গ্র্যাভিটি মারাত্মক, পৃথিবীর তুলনায় আড়াই গুণ গতিতে তুমি জুপিটারে পড়তে থাকবে। প্রথমেই তোমাকে ঘিরে ধরবে সাদা অ্যামোনিয়ার মেঘ। গন্ধ নিলে ঝাঁঝালো প্রস্রাবের মতো গন্ধ পাওয়া যাবে। বাইরে তাকালে হালকা সূর্যের আলো পাওয়া যাবে কিন্তু সেটা তোমাকে গরম করতে পারবে না। এই স্তরে বাতাস অস্বাভাবিক ঠান্ডা, বাইরে তাপমাত্রা -১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আস্তে আস্তে তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে, সেই সাথে চাপ। সাদা মেঘের জায়গা করে নেবে ঘন বাদামি অ্যামোনিয়াম-হাইড্রোসালফাইড আর অ্যামোনিয়াম-সালফাইড গ্যাস। ঘন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মতো অতি দূরের সূর্য মিটিমিটি আলো দেবে। মোটামুটি ২৫০ কিলোমিটার গভীরে গেলে তুমি পৌঁছে যাবে জুপিটারের মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়ের এলাকায়। ৪২০ কিলোমিটার বেগের বাতাসে নাকানি-চুবানি খেয়ে তোমার 420 হয়ে যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

আর যদি ৯২০ কিলোমিটার যেতে পারো, তুমি পৌঁছে যাবে এ পর্যন্ত মানুষের পাঠানো কোনো যান জুপিটারের সবচেয়ে গভীর যে জায়গায় যেতে পেরেছে, সেখানে। ১৯৯৫ সালে নাসার গ্যালিলিও প্রোব গ্যাস জায়ান্টের পেটের ভেতর এতদূর নেমে এসে শেষে প্রচণ্ড চাপে ধ্বংস হয়ে যায়। তুমি যদি ধ্বংস না হও, আরও কিছুদূর নামতে পার, নতুন নতুন বিস্ময় অপেক্ষা করবে তোমার জন্য।

তুমি যতই নামতে থাকবে, তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে। বাড়তে থাকবে চাপ। একসময় চারপাশে সব ঘন কালো অন্ধকার হয়ে যাবে। এই জায়গায় আশেপাশে পানির মেঘ পাবে। থেকে থেকে তীব্র বিদ্যুৎ চমকে ঝলসে উঠবে সেগুলো। এই বিদ্যুতের আলো হবে তোমার একমাত্র লাইট সোর্স।

এক সময় তাপ আরও বাড়তে থাকবে, বাড়বে চাপ। বাইরের চাপ এক হাজার অ্যাটমোস্ফিয়ারের সমান হলে বুঝবে বাইরের পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার সময় হয়েছে। এই স্তর থেকে পাঠানো সকল রেডিয়ো সিগন্যাল ওপরের ঘন, পুরু বায়ুমণ্ডলে শোষণ হয়ে যায়।

তুমি পড়ছই, পড়ছই। মোটামুটি বারো ঘণ্টা পর আশেপাশে বাতাস এত ঘন হবে যে তুমি সাঁতার কাটতে পারবে। তোমাকে এখন ঘিরে আছে না তরল না বায়বীয় অদ্ভুত এক ঘন জিনিস, নাম তার সুপারক্রিটিক্যাল ফ্লুইড। বাইরের তাপমাত্রা এখন সূর্যের পৃষ্ঠের সমান। সেটা আরও বাড়বে।

চাপ বেড়ে যখন মোটামুটি দুই মিলিয়ন অ্যাটমোস্ফিয়ারের সমান হবে, তুমি পৌঁছে যাবে মেটালিক হাইড্রোজেনের দুনিয়ায়। অস্বাভাবিক চাপে, প্রচণ্ড তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন এখানে থকথকে তরল ধাতু হয়ে গেছে, সেটা নড়ছে আর বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে তার বুকে। হাইড্রোজেন মোটেও এখন আর দ্বিপরমাণুক গ্যাস নয়, সেটা এখন ধাতু। জুপিটারের অস্বাভাবিক শক্তিশালী ম্যাগনেটিজমের উৎস হচ্ছে এই ধাতব হাইড্রোজেন।

চাপ আরও বাড়বে। তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে সূর্যের পৃষ্ঠের পাঁচগুণ হবে। এই সময় অবশেষে তুমি সম্ভবত প্রথম মাটি স্পর্শ করবা। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন এই বিশাল গ্যাস জায়ান্টের একেবারে গভীরে আছে অতি উত্তপ্ত চাপে পিষ্ট একটা সলিড পাথুরে কোর। ঠিক যেন বাদামের খোসার অনেক ভেতরে ছোট্ট বাদামের দানা, কোষের গভীরে ঘুমিয়ে থাকা নিউক্লিয়াস। ধারণা করা হয় বহু, বহুদিন আগে এই ছোট্ট পাথুরে কোরকে ঘিরেই দানা বেঁধেছিল সুমহান গ্রহরাজ বৃহস্পতি।

এক নজরে বৃহস্পতিগ্রহ

ব্যাস: 1,42,800 কি.মি

সূর্যের থেকে আনুমানিক দূরত্ব: 77 কোটি 83 লক্ষ কি.মি

সূর্য-পরিক্রমার সময়: 12 বছর

নিজ অক্ষে ঘোরার সময়: 10 ঘণ্টার থেকে কয়েক মিনিট কম

উপগ্রহ: 79 টি

গড় তাপমাত্রা: মাইনাস 145 ডিগ্রি সেলসিয়াস

ঘনত্ব: 1.326 গ্রাম/সে.মি

গ্র্যাভিটেশনাল ত্বরণ: 24.79 মি/সে

ভর: 1.8986×10^{27} কেজি

কমিক্স

বৃহস্পতি কেন তারা নয়?
স্ক্রিপ্ট: পার্থিব রায়
অঙ্কন: প্রিয় তালুকদার
কী ব্যাপার বৃহস্পতি দা?
না! এতো বৈষম্য মানা যায় না। এতো এতো মিল থাকা সত্ত্বেও সূর্য হয়ে গেল নক্ষত্র। আর আমি রইলুম গ্রহ হয়ে।
ব্যাপার মানে? বিরাট ব্যাপার! আমার মাঝেও রয়েছে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম, সূর্যের মাঝেও তাই। আবার আমাদের দুয়ের মাঝেই এই পদার্থ রয়েছে একই অনুপাতে। তারপরও আমি কেন নক্ষত্র হতে পারলাম না?
আমি অতশত বুঝি না, বাপু! আপনি বরং পৃথিবীরে তলব করেন। ও যদি কিছু সমাধান দিতে পারে!

পৃথিবী!
আজ্ঞে, গ্রহরাজ কী প্রয়োজন?

বৃহস্পতির আক্ষেপ শোনার পর..
ওহ! এই কথা! আপনি গ্রহ হতে পারেন নি কারণ আপনি তেমন ভারী না।
কী উল্টাপাল্টা বকছ! এ সৌরজগতের বাকি সব গ্রহের মিলিত ভরের প্রায় ২গুণ ভারী আমি। আর আমার কিনা ভর নেই!

না! না! আমি সেই কথা বলেনি। গ্রহ হিসেবে আপনি যে খুব ভারী সেটা জানি। তবে তারা হওয়ার জন্য যে নূন্যতম ভর প্রয়োজন তা আপনার নেই। আরো ভারী হলে নক্ষত্র হতে পারবেন।

ব্যাঙাচি

কেন? বেশি ভর দিয়ে কী হবে?

তখন আপনার কেন্দ্রে নিজের মহাকর্ষের চাপে তাপমাত্রা বেড়ে ফিউশান শুরু হবে আর আপনি হয়ে যাবেন একটি তারা।

আমি তো মাঝেমধ্যেই অনেক গ্রহাণুকে খেয়ে ফেলি। হিসেব করে বলতো আর কয়টা গ্রহাণু খেলে আমি তারা হওয়ার মত ভারী হবো? ১০০টা নাকি ১০০০টা?

একটা গ্রহাণুতে কাজ হবে না। আপনাকে প্রায় ৮০গুণ ভর অর্জন করতে হবে, যদি নক্ষত্র হতে চান।
কী?
তবে তাতেও কিন্তু সূর্যের মতো নক্ষত্র হতে পারবেন না। ছোটো নক্ষত্র হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

আমার মতো তারা হওয়া কি চাট্টিখানি কথা। তোমাকে আরো ভর অর্জন করতে হবে। ব্যার্থ তারা বলে আক্ষেপ না করে মন দাও নিজের কাজে।

সিরিজ: The planets (2019)

রিভিউয়ার: জহিরুল ইসলাম

নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র অনুযায়ী, এই মহাবিশ্বের প্রতিটা বস্তুই একে অপরকে আকর্ষণ করে। ছোটো ছোটো বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ এর ইফেক্ট টের পাওয়া যায় না তেমন। আমার আকর্ষণ আমার গফ টের পায়না। কিন্তু বড়ো বড়ো জিনিসের আকর্ষণ সহজে টের পাওয়া যায়। চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীর এক প্রান্তের সব পানি উঁচু হয়ে যায়। তৈরি হয় জোয়ার ভাটার। আরো বড়ো বড়ো জিনিসের আকর্ষণ আরো বেশি। ধরেন বৃহস্পতি গ্রহ আর এর উপগ্রহ ইউরোপার কথা। ইউরোপাকে বৃহস্পতি প্রচণ্ড আকর্ষণে টানে। কিন্তু ওদের কারো মধ্যেই জোয়ার ভাটা হতে পারে না। কারণ কারো শরীরেই পানি নেই। বৃহস্পতি পুরোটা গ্যাসে তৈরি। আর ইউরোপা পুরোটাই পাথর। ফলে যেটা ঘটে, ইউরোপার পাথরের মধ্যে জোয়ার ভাটা শুরু হয়। উপগ্রহটার পাথরের মধ্য দিয়ে বিশাল আকারে ফাটল হয়। কিংবা এক পাথরের লেয়ার আরেক লেয়ারের সাথে এসে জোয়ারের ধাক্কা দেয়, উঁচু পাহাড় তৈরি হয়ে যায়। একে বলে Tidal flexure.

আরো সাংঘাতিক জোয়ার ভাটাও ঘটতে পারে। শনি গ্রহের পাশে সুন্দর একটা উপগ্রহ ছিল। পাথর আর বরফ দিয়ে তৈরি। শনির আকর্ষণে উপগ্রহটা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এখন সেই টুকরোগুলো শনির চারপাশে বলয় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সৌরজগতের বিভিন্ন এলাকার এইরকম আজব আজব গল্প নিয়ে বানানো হয়েছে The Planets সিরিয়ালটা। সৌরজগতের সবগুলো গ্রহ-বুধ, শুক্র, পৃথিবী,মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন এর গল্প ছাড়াও বোনাস হিসেবে আছে বামন গ্রহ প্লুটো, গ্রহাণু সিরিস এবং ধূমকেতুদের গল্প। একটি মাত্র সিজন। ৫ টা এপিসোড। সাথে আছে ৫ টা মিনিসোড।

সিরিয়াল দেখার আগে ধারণা ছিল, সব গ্রহই কমবেশি আমাদের পৃথিবীর মতো হবে। কোনোটায় হয়তো পানি নেই, কোনোটার তাপমাত্রা হয়তো বেশি, এইটুকু পার্থক্য। কিন্তু সিরিয়াল দেখার পর আপনার ধারণা পাল্টে যেতে বাধ্য। প্রতিটা গ্রহের সিস্টেম আমাদের থেকে পুরো আলাদা। কোনো কোনো গ্রহে হয়তো মাটিই নেই, পুরোই গ্যাস। কোনো গ্রহ হয়তো সূর্যের মতোই আস্ত একটা সূর্য, ভুল করে গ্রহ হয়ে বসে আছে। কোনো ধূমকেতু হয়তো ভেঙেচুরে এখন গ্রহ সেজে ঘাপটি মেরে বসে আছে। কোনো স্বাধীন গ্রহাণু হয়তো এখন কারো উপগ্রহ হয়ে সংসার করতেছে। কোনো গ্রহে বায়ুমণ্ডলই নেই, কোনো গ্রহের বায়ুমণ্ডল ফুটো হয়ে সব পানি মহাশূন্যে চলে গেছে, আবার কোনো গ্রহে পুরোটাই বায়ুমণ্ডল, আর কিছুই নেই। বিচিত্র সব জগৎ একেকটার।

১৯৭৮ সালের ভয়েজার দিয়ে শুরু। এরপর প্রতিটা গ্রহেই রকেট নেমেছে, বা এট লিস্ট খুব কাছ থেকে গিয়ে ছবি তুলতে পেরেছে। সো, গ্রহগুলো সম্পর্কে আমরা এখন অনেক বেশি জানি। সেই মিশনগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা, সংশ্লিষ্ট মিশনের সাথে জড়িতদের ইন্টারভিউ, গ্রহগুলোর সাথে জড়িত পৌরাণিক মিথ ইত্যাদি সব কিছুই পাবেন সিরিয়ালটাতে। ফিউচারে কোন গ্রহে প্রাণ খুঁজে পাওয়ার চান্স বেশি, কোথায় আপনি সেটেল করলে সবচেয়ে সুবিধা, সেটাও ঠিক করে ফেলতে পারবেন সিরিয়াল দেখতে দেখতে।

চাঁদ নিয়ে কত কথা

স্বপ্নীল জয়ধর

"Distance is but a relative expression, and must end by being reduced to zero."

-Jules Verne By From the Earth to the Moon

পায়ের নিচে শক্ত মাটি আর মাটির ওপরে সীমাহীন আকাশ। রাতের এই সীমাহীন আকাশে যখন তাকানো হয় তখন একটা অতি পরিচিত জিনিস দেখা যায়। আর তা হলো চাঁদ। চাঁদ শব্দটা আমাদের কত পরিচিত একটা শব্দ! যখনই মন খারাপ হয়ে যায় তখন ছাদে গিয়ে মাথার ওপরে থাকা স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে দেওয়ার চাঁদ আমাদের মনকে ভালো করে দেয়। মনে হয় ইশ! যদি একবার চাঁদে যেতে পারতাম!

তবে এই চাঁদে যাওয়ার ধারণাটাও একসময় স্বপ্নাতীত ছিল। সেই ধারণার ডানাপালা গজায় কল্পনার রাজ্যের চাঁদের বুড়ির সুতা কাটার চরকা থেকে। তারপর আসে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির রাজা জুল ভার্নের 'ফ্রম দ্যা আর্থ টু দ্যা মুন' আর 'অ্যারাউন্ড দ্যা মুন' থেকে। তাঁর এই উপন্যাসদ্বয় প্রকাশের প্রায় ১০৪ বছর পর মানুষ চাঁদে পদার্পণ করতে পারে। ১০৪ বছরের ব্যবধান থাকলে কী হবে, উভয়ের মধ্যে কিন্তু অনেক মিল আছে জানো না কি? কী অবাক লাগছে? অবাক লাগার কথা। কারণ, মানুষ প্রথম চাঁদে পদার্পণ করে ১৯৬৯ সালে আর উপন্যাস প্রকাশের সময় সবেমাত্র বাষ্পীয় ইঞ্জিন ব্যবহার শুরু হয়। আধুনিক প্রযুক্তির ক,খ,গ জানা ছাড়াই রকেটে(ভার্নের ভাষায় গোলা) করে চাঁদে মানুষ পাঠানোর মতো দূরদৃষ্টি থাকার কারণে আমি তাকে আমার শত শত প্রণাম জানাই।

চাঁদ নিয়ে বলব যদি চন্দ্র অভিযান সম্পর্কে কিছুই না বলি তবে চাঁদ নিয়ে কিছু বলাটাই অপূর্ণ থেকে যাবে। তাই আমি প্রথমেই চন্দ্র অভিযান সম্পর্কে বলছি।

পঞ্চাশের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আমেরিকার স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়। কে আগে চাঁদে যেতে পারে তার!

তখন কয়েকজন আমেরিকান বিজ্ঞানী প্রস্তাব দেন চাঁদে মানুষ পাঠানো অনেক কঠিন আর অনেক খরচেরও ব্যাপার। তাই মানুষের বদলে যদি চাঁদে পারমাণবিক বোমা ফাটানো হয়, তাহলে ব্যাপারটা আরো ভালো দেখাবে। ব্যাপারটা একবার আপনিই চিন্তা করে দেখুন তাদের কী বুদ্ধি! তাদের প্রস্তাব মতে যদি তারা বোমা ফাটায় আর যদি তা পৃথিবী থেকে দেখা যায় তবে আমেরিকাই হবে পৃথিবীতে সর্বসেরা। কিন্তু তখনও কিছু ভালো ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মানুষ পৃথিবীতে ছিলেন যাদের কারণেই চাঁদকে আর মানুষের দ্বারা কলুষিত হতে হয়নি।

আজ থেকে ঠিক ৫১ বছর আগে অ্যাপোলো সিরিজের রকেট অ্যাপোলো-১১'এ করে মানুষ প্রথম চাঁদে অবতরণ করে। এর আগে মনুষ্যনির্মিত বেশ কয়েকটা মহাকাশযান চাঁদে গেলেও

মানুষ এই অ্যাপোলো-১১ করে প্রথম চাঁদে অবতরণ করে। তবে এই চাঁদে যাওয়াকে সফল করার জন্য অনেকের অনেক নির্ঘুম রাত কাটাতে হয়েছে আবার অনেকের প্রাণেরও বিসর্জন দিতে হয়েছে। অ্যাপোলো সিরিজের প্রথম রকেট অ্যাপোলো-১ উৎক্ষেপণের আগেই দুর্ভাগ্যবশত আগুন ধরে নষ্ট হয়ে যায় ফলে পৃথিবীর ভেতরে তিন নভোচারী এই দুর্ঘটনায় নিহত হন। তাছাড়া এরপর চাঁদে পা দেওয়া প্রথম মহাকাশযান অ্যাপোলো-১১ এর অভিযানও বিফল হতো যদি না নীল আর্মস্টং আর এডুইন অলড্রিন তাঁদের উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগাতেন।

এই দুর্ঘটনার কথা বরং এখন বাদ দেই। এর বদলে একটা মজার কথা বলি। জানলে অবাক হবেন যে, এই অ্যাপোলো-১১ এর চন্দ্র অভিযান সফল করতে এর সাথে জড়িত ২০,০০০ কর্মীকে একটা ম্যানুয়াল ফলো করতে হয়। যার পৃষ্ঠা সংখ্যাই ছিল দুই কোটি এবং যার ওজন ছিল প্রায় কয়েক টন! একবার ভেবে দেখুন তাঁদের তখন অবস্থা কেমন ছিল!

কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম না জুল ভার্নের 'ফ্রম দ্যা আর্থ টু দ্যা মুন' আর 'অ্যারাউন্ড দ্যা মুন' এর সাথে প্রথম সফল চন্দ্র অভিযানের অনেক মিল আছে। এই যেমন নভোচারীদের সংখ্যার দিক থেকে। উভয় জায়গায় নভোচারীর সংখ্যা ছিল ৩ জন। আবার ভার্নের গোলা বা মহাকাশযানের নাম ছিল কলাম্বিয়াড আর অ্যাপোলো-১১ এর কমান্ড মডিউল নামও ছিল কলাম্বিয়া। অবাক ব্যাপার না! উৎক্ষেপণের স্থান যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার ২৭ ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশ। আর অ্যাপোলো-১১ এর উৎক্ষেপণের স্থান ছিল কেপ কেনেডি, যা ভার্নের উৎক্ষেপণের স্থান থেকে মাত্র ২২৫ কিলোমিটার দূরে। এমনকি উভয়ের গতিবেগও প্রায় সমান ছিল। এই যেমন কলাম্বিয়াডের গতিবেগ ছিল সেকেন্ডে ৩৬,০০০ ফুট বা ১০,৯৭২ কিলোমিটার। অন্যদিকে অ্যাপোলো-১১ এর তৃতীয় স্টেজের গতিবেগ ছিল সেকেন্ডে ৩৫,৫৩৩ ফুট বা ১০,৮৩০ কিলোমিটার। আরো অবাক করার মতো ব্যাপার হলো, ভার্নের মহাকাশযান চাঁদে যেতে সময় লাগে ৯৭ ঘণ্টা ১৩ মিনিট ২০ সেকেন্ড। আর অ্যাপোলো-১১ এর চাঁদে যেতে সময় লাগে ১০৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

"As you pass from sunlight into darkness and back again every hour and a half, you become startlingly aware how artificial are thousands of boundaries we've created to separate and define. And for the first time in your life you feel in your gut the precious unity of the Earth and all the living things it supports."

—Russell Schweikart, Apollo 9

প্রথমে মানুষ ভাবত চাঁদ বুঝি আমাদের পৃথিবীর মতো। মাটি আকাশ সব। ধারণা আরো পোক্ত হয় জার্মান জ্যোতির্বিদ জোহানেস কেপলারের 'সোমনিয়াম' উপন্যাস থেকে। যেখান থেকে চাঁদের পরিবেশ, চাঁদের জীবজন্তু সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু সে ধারণাকে বুড়ো আঙুল দেখাতে অ্যাপোলো-১১ নামে চাঁদে। সেখান থেকে প্রায় ২২ কেজি চাঁদের মাটি আসে। না, মাটি বললে ভুল হবে। তা হলো- পাথর, ধুলোবালি। যদিও পাথর ধুলোবালি বলছি তবুও তা পৃথিবীর পাথর ধুলোবালির মতো না। তাহলে সেগুলো কী? এটাই হচ্ছে আসল প্রশ্ন।

তো অ্যাপোলো-১১-এর আনা নমুনা পরীক্ষা করা হলো। পাওয়া গেল অনেক অদ্ভুত সব তথ্য।

যখন প্রথম এই ধুলোবালি পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা দেখলেন তখন তাঁরা আন্দাজ করেছিলেন এগুলো চাঁদের চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া নির্দিষ্ট কিছু খনিজের গুড়া। কিন্তু যখন তারা এগুলোকে মাইক্রোস্কোপের নিচে রেখে আইপিসে চোখ রাখলেন তখন তাঁদের চোখ রীতিমতো কপালে উঠে গেছে। তাঁরা দেখেন শুধু এক চামচ ধুলোবালির মধ্যে প্রায় শত শত ক্ষুদ্রাকৃতির পাথর, খনিজ,রাসায়নিক পদার্থ লুকিয়ে রয়েছে। তো এই তথ্য পাওয়ার পর বিজ্ঞানীরা রীতিমতো হামলে পড়েন। তাঁরা সব তথ্য বিশ্লেষণ করে যা পান তাতে তাঁদের চোখ কপাল থেকে

রীতিমতো মাথায় উঠে যায়। তাঁরা অনেক অদ্ভুত রহস্যের সমাধান করেন।
তো তাঁরা যে সব তথ্য পান তা হলো:

চাঁদের ধুলোবালি, পাথর অনেক ধরনের। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রধান হলোঃ
১) ব্রেকিয়া (Breccia),
২) ক্রিস্টালাইন (Crystalline),
৩) কাচ (Glasses),
৪) অ্যানোর্থোসাইট (Anorthosite)।

১) ব্রেকিয়া (Breccia): যা চাঁদের থেকে প্রাপ্ত। ধুলোবালির প্রায় ৫০%ই হলো 'ব্রেকিয়া'। যা একটা ইটালিয়ান শব্দ। যার অর্থ চূর্ণ। এই ব্রেকিয়া হলো একধরনের পাথর- যা
কোনো সংর্ঘষের ফলে ধুলোবালির জমাট হওয়া পাথর।

২) ক্রিস্টালাইন (Crystalline): যা চাঁদের থেকে প্রাপ্ত। বাকি ধুলোবালির ৫০% এর ৪০%-ই ক্রিস্টালাইন। এটিও হলো একধরনের পাথর। যা লাভার উদগিরণ এর ফলে তৈরি হয়। তবে এতে ক্রিস্টালাইন পাথর ছাড়াও আরও অনেক খনিজ পাওয়া গেছে। এর কারণ যখন এই চাঁদে মাটির গভীর থেকে লাভা ওপরে উঠে আসে তখন বিভিন্ন খনিজ তার সাথে লেগে যায়। এরপর যখন এটি চাঁদের পৃষ্ঠে আসে তখন লাভা ঠাণ্ডা হয়ে জমে পাথর হয়ে যায়। আর এই পাথরই ক্রিস্টালাইন।

৩) কাচ (Glasses): কী অবাক লাগছে! ভাবছেন কাচ কীভাবে চাঁদে হতে পারে। হ্যাঁ, সত্যি বলছি চাঁদে কাচ পাওয়া গেছে। তা-ও বাকি ১০% এর ৫%-৬%-ই কাচ। সংঘর্ষের পর গলিত পাথর ধুলোবালি চাঁদের বায়ুশূন্য পরিবেশে দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে কাচ তৈরি করে। যা বিজ্ঞানীদের রীতিমতো অবাক করে দেয়।

৪) অ্যানোর্থোসাইট (Anorthosite): এই পাথরের পরিমাণ প্রায় ৩%-৪%। যা চাঁদে একসময় গলিত অবস্থায় থাকলেও পরে জমে পাথর হয়। এই খনিজে অনেক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ থাকে, কিন্তু অ্যানোর্থাইট থাকে (CaAl2Si2O8) সবচেয়ে বেশি। এই
ক্যালসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়ামসমৃদ্ধ খনিজ স্বয়ং পৃথিবীতেও অনেক কম পাওয়া যায়। তো বিজ্ঞানীদের মাথায় প্রশ্ন জাগে কীভাবে এত পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়ামসমৃদ্ধ খনিজ চাঁদের পৃষ্ঠে এলো। তবে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন এই অ্যানোর্থোসাইট চাঁদে থাকার পেছনে চাঁদের উৎপত্তির রহস্য লুকিয়ে আছে। তা বরং একটু পরেই বলছি। কারণ এটা জানার আগে আরো একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে। তা হলো বিজ্ঞানীরা চাঁদের কোন অংশ থেকে এই অ্যানোর্থোসাইট পেলেন?

তো এই প্রশ্নের উত্তর হলো অ্যাপোলো-১১ যেখানে নামে সেই জায়গাটা হলো ট্র্যাংকুইলিটি বেস। যেখান থেকে বিজ্ঞানীরা এই খনিজ আবিষ্কার করেন। তবে এই জায়গার রং অনেকটা কালচে। আর নমুনার বেশিরভাগ খনিজের রঙও কালচে। তাই ধারণা করা হয় এই ট্র্যাংকুইলিটি বেসের আশেপাশের স্থানেই এই কালচে রঙের খনিজ পাওয়া যায়। তবে অ্যানোর্থোসাইটের বেলায় তা খাটে না। কেননা, অ্যানোর্থোসাইটের রং অনেকটা সাদাটে। আর একমাত্র চাঁদের সাদাটে অঞ্চল হলো টের‍্যা। তাই ধারণা করা হয় সেখান থেকেই কোনো এক বিস্ফোরণে বা সংর্ঘষের পর অ্যানোর্থোসাইট ছিটকে ট্র্যাংকুইলিটি বেসে আসে। কিন্তু টের‍্যা থেকে ট্র্যাংকুইলিটি বেসের মধ্যবর্তী দূরত্ব অনেক বেশি। তাই তখন অনেক বিজ্ঞানী আন্দাজ করেছিলেন হয়তো কোনো এক বিশাল উল্কাপিণ্ডের আঘাতের কারণে এই অবস্থা হয়।

কিন্তু বেশিরভাগ বিজ্ঞানী এই উত্তরে সন্তুষ্ট হননি। তাঁরা ভাবছিলেন অন্য কিছু। তবে তাঁদের মনের এই সন্দেহ দূর

করার জন্য তাঁদের কাছে তেমন কোনো প্রমাণ ছিল না। কিন্তু তাই বলে তাঁরা দমে যাননি। এরপর তাঁরা পরর্বতীতে অন্যান্য অ্যাপোলো সিরিজের মিশনের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলেন- শুধু হাজার হাজার বছর ধরে চাঁদে উল্কা পড়ার ফলে এমন হওয়ার কথা না। তাঁরা নানা হিসেব নিকাশ করে বলেন- এই এত পরিমাণ অ্যানোর্থোসাইট চন্দ্রপৃষ্ঠে উঠে আসার পেছনে পৃথিবীর একটা হাত আছে। এমনকি স্বয়ং চাঁদের উৎপত্তির পেছনেও পৃথিবীর হাত আছে।

তখন বলেছিলাম না চাঁদের সাথে পৃথিবীর একটা সম্পর্ক রয়েছে? এই যে এতক্ষণ ধরে বললাম, লাভা,বিগলিত ধাতু, অ্যানোর্থোসাইটের কথা। এসবের অস্তিত্ব থেকেই তাঁরা জানাতে পারে যে চাঁদ আগে উত্তপ্ত ছিল। কেননা, এত বিপুল পরিমাণ ধাতু খনিজ কখনোই গলতো না, যদি না চাঁদ আগে উত্তপ্ত হতো। এই উত্তপ্ত হওয়ার পেছনের কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা বললেন একমাত্র মঙ্গলের আকৃতির কোনো গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষের ফলে পৃথিবী থেকে কিছু অংশ ছিটকে যায় এবং তা থেকেই তৈরি হয়েছে চাঁদ। আর এই সংঘর্ষের ফলে প্রচণ্ড তাপ তৈরি হবে এটাই স্বাভাবিক। আর এই তাপের ফলেই তৈরি হয় গলিত লাভা।

আর এ থেকে কীভাবে সবকিছু তৈরি হয় তা তো আগেই বলেছি।

"Don't tell me the sky is the limit when there are footprints on the Moon."—Paul Brandt

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষ এখন অসম্ভবকে সম্ভব করতে শিখেছে। আগে চাঁদে যাওয়া ছিল মানুষের কাছে একটা স্বপ্নের মতো। কেননা, চাঁদ আমাদের থেকে কত্ত দূরে। কিন্তু তারপরও বিজ্ঞানীরা আজ দূরত্বকে হার মানিয়ে পা রেখেছে চাঁদে। মানুষকে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে চাঁদে বসবাস করার। কিন্তু আসলেই কি চাঁদে বসবাস করার সৌভাগ্য আমাদের কপালে আছে? চাঁদে বসবাস করা আসলেই কি সম্ভব?

আমরা মোটামুটি সবাই চন্দ্র অভিযাত্রীদের চাঁদে নামার সময় ব্যবহৃত পোশাক দেখেছি। এই পোশাক দেখেই বুঝতে পারা যায় অনেক আঁটঘাট বেঁধেই চাঁদে যেতে হয়। কারণ চাঁদের পরিবেশ আর পৃথিবীর পরিবেশের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। চাঁদে বায়ুমণ্ডল বলতে কিছুই নেই। তবে খুব সামান্য পরিমাণ হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন গ্যাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে চাঁদে। কিন্তু হাইড্রোজেন ছাড়া বাকি সবগুলো গ্যাসই নিষ্ক্রিয় বলে চাঁদে বায়ুমণ্ডল গড়ে ওঠেনি। সেগুলোকে চাঁদের পৃষ্ঠে ধরে রাখার জন্য পর্যাপ্ত মাধ্যাকর্ষণ বলের দরকার হয়। কিন্তু চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ বল পৃথিবীর তুলনায় ১/৬ ভাগ কম। যা চাঁদের বায়ুমণ্ডল ধরে রাখার জন্য পর্যাপ্ত শক্তিশালী নয়। বায়ুমণ্ডল নেই বলে চাঁদের পরিবেশ মানুষের জন্য মারাত্মক।

চাঁদের তাপমাত্রা চরম ভাবাপন্ন। বায়ুমণ্ডল নেই বলে যে স্থানে সূর্যের আলো পড়ে সেই স্থানের তাপমাত্রা প্রায় ১৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠে যায়। আবার যখন সূর্যের আলো ও তাপ থাকে না তখন তাপমাত্রা মাইনাস ১৭৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যায়। চাঁদের গড় তাপমাত্রা মাইনাস ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাহলে কি বলতে পারি চাঁদ একটা ডিপ ফ্রিজ?

চাঁদের দিনরাত্রি পৃথিবীর দিনরাত্রির তুলনায় খুবই দীর্ঘ। চাঁদকে একবার নিজ অক্ষে ঘুরতে ২৮ দিনের মতো সময় লাগে। পৃথিবীর ২৪ ঘণ্টায় একদিকে দিন হলে যেমন অন্যদিকে রাত হয় ঠিক তেমনি চাঁদে ২৮ দিনে একদিকে দিন হলে অন্যদিকে রাত হয়। যেখানে দিন হয় সেখানে টানা ১৪ দিন ধরে একটানা দিনের আলো থাকে আর অন্যদিকে টানা ১৪ দিন ধরে রাতের নিকষ অন্ধকার থাকে। আবার চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই বলে সেখানে কোনো আলোর বিচ্ছুরণ হয় না। ফলে যেখানে সূর্যের আলো সরাসরি পড়ে সেখানে শুধু আলোই থাকে আর অন্যদিকে আলো থাকে না। পৃথিবীর আকাশে এক দিকে সূর্য থাকলে বায়ুমণ্ডলের কারণে সে

আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু চাঁদে সেটা ঘটে না। আবার চাঁদে রাতের আকাশে তারা দেখা যায় তবে সেই তারা পৃথিবীর আকাশের তারার মতো ঝিকিমিকি করে না। যা স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যপ্রেমিক মানুষ ও শখের জ্যোতির্বিদদের জন্য অনেক বড় সমস্যা বটে।

অনেক সমস্যার কথা বললেও একটা মারাত্মক সমস্যার কথাই তো বলা হয়নি। আর এই মারাত্মক সমস্যা হলো তেজস্ক্রিয়তা। চাঁদের তেজস্ক্রিয়তা অনেক বেশি। বায়ুমণ্ডল না থাকার কারণে তেজস্ক্রিয়তা শোষণ করার কোনো উপায় নেই সেখানে। পৃথিবীর অনুকূল বায়ুমণ্ডল আমাদেরকে এই তেজস্ক্রিয়তা থেকে রক্ষা করে কিন্তু চাঁদে এই তেজস্ক্রিয়তা সরাসরি নভোচারীদের পোশাক ভেদ করে শরীরে প্রবেশ করে। আর সেই রকম পরিবেশে বেশিদিন থাকলে তেজস্ক্রিয়তা মানুষের ডি.এন.এ-র ক্ষতি করতে পারে, ক্যান্সার এবং অন্যান্য অসুস্থতার ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। পৃথিবীতে বছরে গড় তেজস্ক্রিয়তা প্রায় ৫ মিলিসিয়েভার্ট। আর চাঁদে তা বছরে প্রায় ৩০০ মিলিসিয়েভার্টের কাছাকাছি। যা এককথায় মাত্রাতিরিক্ত। এই তেজস্ক্রিয়তাজনিত সমস্যা থেকে একবার বের হতে পারলে চাঁদে বসবাসের স্বপ্ন দেখতে কোনো বাধা নেই। খোদ পৃথিবীতেই মারাত্মক তেজস্ক্রিয়তা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ সিসার প্রলেপযুক্ত অ্যাপ্রোন পরে। কিন্তু চাঁদে সিসার কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। কিছু বিজ্ঞানীরা পৃথিবী থেকে চাঁদে সিসা নেওয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু আপনিই বিচার করুন পৃথিবী থেকে কি লাখ লাখ টন সিসা নেওয়া সম্ভব?

চাঁদের মাটির নমুনা থেকে রাসায়নিক উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে অক্সিজেন, ক্যালসিয়াম, হাইড্রোজেন, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, সিলিকন, ম্যাগনেশিয়াম, টাইটেনিয়াম আছে। মোট রাসায়নিক উপাদানের প্রায় অর্ধেক শতাংশের বেশি অক্সিজেনই আছে। তবে এই অক্সিজেন আলাদাভাবে গ্যাস আকারে নেই। মাটির খনিজ থেকে অক্সিজেন আলাদা করলে হয়। আর লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, টাইটেনিয়াম দিয়ে ঘর-বাড়ি বানানো যাবে। আবার চাঁদের মাটি দিয়ে বাড়ির ছাদ বানানো যেতে পারে। আবার এই মাটি তেজস্ক্রিয়তা শোষণ করে সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসে। হলো বাসস্থান, তেজস্ক্রিয়তা, অক্সিজেনের সমস্যার সমাধান।

এখন বাকি রইলো পানি আর খাদ্যজনিত সমস্যা। প্রথমেই বলি পানির কথা। ১৯৯৪ সালে ক্লিমেনটাইনের পাঠানো ছবি থেকে জানা যায় চাঁদে দক্ষিণ মেরুতে জমাট বাধা পানি আছে। এরপর লুনা প্রসপেক্টারও চাঁদে পানির অস্তিত্বের কথা বলে। এরপর ২০০৯ সালে ইসরো ঘোষণা দেয় চাঁদের উত্তর মেরুতে বিপুল পরিমাণ পানির অস্তিত্ব আছে। আবার এরপর ২০১০ সালে নাসাও ঠিক একই ঘোষণা দেয়। এত সব প্রমাণ থেকে মোটামুটি আন্দাজ করা যায় চাঁদের উভয় মেরুতে পানি বরফ আকারে থাকতে পারে। এই বরফ থেকে পানি পাওয়া মোটেও কঠিন ব্যাপার না। তাছাড়া চাঁদের মাটিতে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন যেহেতু পাওয়া গেছে তাহলে পানি তৈরি করতে আর কী লাগে?

এবার আসি খাবারের কথায়। খাবারের বেলায় একটা সমস্যা আছে। কেননা, উদ্ভিদ থেকে আমরা বেশিরভাগ খাদ্য উৎপাদন করি। কিন্তু উদ্ভিদের খাদ্য তৈরির জন্য পর্যাপ্ত আলো ও তাপ প্রয়োজন। যা চাঁদে নেই। তো সেখানে কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। যেহেতু ১৪ দিন দিনের আলো থাকছেই সে আলোর সাহায্যে সোলার প্যানেল ব্যবহার করে বাকি দিনগুলোর জন্য বিদ্যুৎ তৈরি করা আর কী ব্যাপার।

তো সব সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে এখন চাঁদে থাকার স্বপ্ন দেখতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে যে এমন সুন্দর গ্রহ ছেড়ে একটা রুক্ষ উপগ্রহে কে থাকতে চাইবে?

চাঁদ নিয়ে অনেক কথা বললাম। এবার চাঁদকে রেহাই দেই।

রেফারেন্স

এক আলোকবর্ষ মানে কত বছর?

জাভেদ ইকবাল

প্রশ্ন: এক আলোকবর্ষ মানে কত বছর?
উত্তর: "ঠিক এক বছর"।

আমাকে পাগল ভাবার আগে সম্পূর্ণ লেখাটা পড়ার অনুরোধ করব। কয়েক দিন আগে এই প্রশ্ন এসেছে বিসিবিতে। উত্তরটা লিখতে গিয়ে আরেকটা চিন্তা মাথায় এলো, সেই থেকে এই লেখা।

আলোকবর্ষ দূরত্বের পরিমাপ, সময়ের না। তাহলে কেন আমি ঐ উত্তরটা দিলাম?

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার পদার্থবিজ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্নে এই সমস্যাটি এসেছিল। একটি ব্যারোমিটারের সাহায্যে কীভাবে একটি সুউচ্চ ভবনের উচ্চতা পরিমাপ করবে? দেখতে একদমই নিখাদ ও সাদামাটা মনে হলেও প্রশ্নটিতে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা লুকিয়ে ছিল। প্রশ্নকর্তার প্রত্যাশা ছিল অনেকটা এমন- ছাত্ররা প্রথমে ভবনের সবচেয়ে উঁচুতে ব্যারোমিটারের চাপ নির্ণয় করবে এবং পরে ভবনের সবচেয়ে নিচুতে (ভূমি) ব্যারোমিটারের চাপ নির্ণয় করবে। ওপরের চাপ এবং নিচের চাপের পার্থক্য থেকে হিসেব নিকাশ করে ভবনের উচ্চতা বের করা যাবে।

কিন্তু এক ছাত্র এই পদ্ধতির ধারে কাছেও না গিয়ে অনেকটা রসিকতা করেই লিখল- প্রথমে ব্যারোমিটারটিকে ভবনের ছাদে নিয়ে যেতে হবে। তারপর এর সাথে লম্বা একটি দড়ি বাঁধতে হবে। বাঁধার পর একে ছাদ থেকে ধীরে ধীরে ভূমিতে নামাতে হবে। ভূমি স্পর্শ করার পর দড়ির দৈর্ঘ্য ও ব্যারোমিটারের দৈর্ঘ্য যোগ করলে যে ফল আসবে তা-ই হবে ভবনটির উচ্চতা।

ছাত্র তো উত্তর দিয়ে দিল, কিন্তু শিক্ষক তো তাতে কোনোক্রমেই সন্তুষ্ট নয়। এমন দায়সারা অলস উত্তরে শিক্ষক তাকে শূন্য দিয়ে ফেল করিয়ে দিলেন।

তারপর অনেক কিছু হলো এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, বিচারক ছাত্রটির কাছে জানতে চাইলেন সে আসলেই প্রাসঙ্গিক উত্তরটি জানে না কি জানে না? ছাত্র জানায় সে আসলে জানে। কিন্তু সে এমন করেছে কারণ হাই স্কুল ও কলেজের শিক্ষকরা যেভাবে বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করা সম্পর্কে পড়িয়েছে তাতে সে বিরক্ত হয়ে গেছে। (এই গল্পের ছাত্রটি নিলস বোর বলে প্রচলিত, তবে আসলে সেটা সত্যি নয়। বিস্তারিত ওপরের লিঙ্কে)

তাহলে আবার মূল প্রশ্নে ফেরত যাই- এক আলোকবর্ষ মানে কত বছর? এর প্রচলিত উত্তর হচ্ছে, "আরে, আলোকবর্ষ হচ্ছে দূরত্বের একক বা পরিমাপ, সময়ের একক বা পরিমাপ না"। কিন্তু আলোকবর্ষ দিয়ে কি সময়ের পরিমাপ সম্ভব?

ধরলাম, সময় রাত ২টা। একটা গাড়ি ঢাকার জিরো পয়েন্ট থেকে ৩ কি.মি দূরে এবং ঠিক ৩০ কি.মি/ঘণ্টা সমবেগে আগাচ্ছে। যখন জিরো পয়েন্টে পৌঁছাবে, তখন কত সময় যাবে?

এই অঙ্কটা কঠিন না। ৩০ কি.মি/ঘণ্টা বেগে ৩ কি.মি যেতে সময় লাগবে ৩/৩০ ঘণ্টা = ৬ মিনিট।
তাহলে আমরা যদি জানি প্রক্সিমা সেনচুরি ৪.২৪৩ আলোক বর্ষ দূরে, তাহলে একটা ফোটন যদি পৃথিবী থেকে পাঠাই, সেটা যখন পৌঁছাবে, আমরা ঘড়ি না দেখেই বলতে পারব, ৪.২৪৩ বছর কেটেছে। ৬ আলোক বর্ষ দূরে যদি কিছু থাকত, তাহলে আমরা বলতে পারতাম, আলোর গতিতে এক আলোক বর্ষ যেতে কতক্ষণ সময় কাটবে পৃথিবীতে? উত্তর, এক বছর। কেউ আলোকবর্ষ দিয়ে সময় মাপে না, কিন্তু ব্যারোমিটার দড়িতে বেঁধে বিল্ডিংয়ের উচ্চতা মাপার মতোই, সেটা করা সম্ভব।

এত বড়ো প্যাঁচাল পারার কারণ কী? কারণ হচ্ছে, ধরাবাধা চিন্তার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ আমাদের।

চাষা মহাশূন্যে গেলেও ধান চাষে

মনিফ শাহ চৌধুরী

১.

আমার বাবার দুটো ফসলি জমি ছিল আর হালচাষের জন্য চারটা ষাঁড়। তিনি পেশায় একজন কৃষক। আমার নাম অভি। আমি পেশায় একজন নভোচারী। বোটানিতে ডিগ্রি নিয়ে নাসায় হালের বলদের মতো হাড়ভাঙা ট্রেনিং নিয়ে নভোচারী হবার পথে বাবা তাঁর সেই শেষ সম্বলগুলোও বিকিয়ে দেন। চাষার ছেলেকে চাষাই হতে হবে এমন কথায় কান দেননি কখনোই। তার এই অপরিশোধেয় আত্মত্যাগের সুবাদে আজ আমি International Space Station (ISS) এ গবেষণা করার সোনালী সুযোগ পেয়েছি। আমার কাজ? চাষ করা।

জি, ঠিকই শুনেছেন। যতই রাঙিয়ে-চাঙিয়ে, নাক উঁচু করে বলি যে আমি স্পেইস স্টেশনে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে উদ্ভিদের ওপর নানান ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাই এবং কী করে তাদের মাঝে জিনগত পরিবর্তন এনে তাদের টিকে

থাকা আরো নিশ্চিত করা যায় স্পেইসশিপ বা মঙ্গলের মাটিতে, তাই নিয়ে গবেষণায় মজে থাকি, তাও এ সত্য এড়ানো যাবে না যে আমি সাদা স্পেইসস্যুট পরিহিত বোটানিক্যাল ডিগ্রিধারী একজন চাষা।

ভ্রূ কোঁচকান কেন? ডিগ্রি আছে, নাসায় নিয়েছে মানে আমার মাঝে কিছুটা হলেও মকরন্দ আছে তো, না কি ? আচ্ছা, আপনাকে আমার ভার বোঝানোর জন্য আমার চাষবাস নিয়ে বকবক করব কিছুক্ষণ , ঠিক আছে?

প্রথমেই শুরু করি স্পেইস ফার্মিং বা মহাকাশে চাষ কী ? মূলত , মহাকাশের প্রতিকূল পরিবেশে গাছপালা তেমন ভালো জন্মে না। রেডিয়েশন বেশি, তাপ অনেক কম, মাইক্রোগ্র্যাভিটি ইত্যাদি আরো নানান কারণে গাছপালা তেমন সুবিধা করতে পারে না। তবে কিছু গাছ আছে ব্যতিক্রম। তাদের সহ্যক্ষমতা বেশি। কোন গাছের সহ্যশক্তি কত ভালো বা কীভাবে তাদের আরো উন্নত করা যাবে এগুলো নিয়ে কাজ করাই হলো স্পেইস ফার্মিং।

স্পেইস ফার্মিং এর প্রয়োজনীয়তা কী? অন্যভাবে বললে কেন মহাকাশে গাছ জন্মাতে হবে আমাদের? এর কারণ বেশ কয়েকটা। আপনারা জানেন কি স্পেইস স্টেশনে কত জিনিস রিসাইকেল করতে হয়? বা কত কিছু তৈরি করতে হয়? যেমন: পানি। পানি থাকে সীমিত, তাই খুব বেশি খরচ করা যায় না। পানি রিসাইকেল করতে হয়। প্রস্রাব , ঘাম আর অন্যান্য ময়লা পানি মেশিনে ফিল্টার করে আবার ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে হয়। সেই ফিল্টার করা পানি পান করা হয়, খাবার ভেজানো হয় বা অন্য কাজে ব্যবহার করা হয়। এরপর প্রস্রাব , ঘাম তৈরি হলে আবার রিসাইকেল করা, আবার ব্যবহার করা । যতই নাক সিটকান, এই পানি পৃথিবীর অধিকাংশ সুপেয় পানি থেকেও পরিষ্কার আর জীবাণুমুক্ত।

এরপর আসে প্রাণবায়ু অক্সিজেন। অক্সিজেন তৈরি করতে হয় কষ্ট করে। স্পেইস স্টেশনের বিশাল সোলার সেলগুলো থেকে পাওয়া ইলেক্ট্রিসিটি দিয়ে পানিতে থাকা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে আলাদা করতে হয়। কেমিস্ট্রিতে পড়ে থাকবেন, এটাকে ইলেক্ট্রোলাইসিস বলা হয়। অক্সিজেন নাক দিয়ে টেনে নেয়া হয়। আর হাইড্রোজেন ভাবছেন কী হয়? ওটা ব্যবহার হয় চিনি তৈরিতে । যদিও এটা প্রচণ্ড দাহ্য হওয়ার কারণে বেশিরভাগ সময়ই বাইরে বের করে দেওয়া হয়।

এরপর আসে যেই বদ্ধ জায়গায় আপনি কাজ করছেন সেটার বাতাস পরিষ্কার করার বিষয়টা। আপনি অক্সিজেন নিয়ে যেই কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছেড়ে দেন সেটা জমতে জমতে বাতাস বিষাক্ত হয়ে যায়। তাই সেই কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে শুষে নিতে হয় সিলিকা জেল দিয়ে। এরপর সেগুলোকে ফেলে দেওয়া হয়।

ভবিষ্যতে হাইড্রোজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে বিক্রিয়া করে মিথেন তৈরি করার জন্য মডেল তৈরি করা হয়েছে।

এরপর চিন্তা করেন আপনার মলের কথা। সেগুলো থেকে রেহাই পেতে হয়। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, মল তৈরি করার জন্য যে খাবার খাবেন সেটাও তো এত সুস্বাদু নয়। তাদের টিউব টিপে টিপে পেস্ট করা খাবার খেতে হয় যেটাও সীমিত।

মোটামুটি এইসব হলো বিভিন্ন ব্যাপার যেগুলো স্পেইস স্টেশনে সামলাতে হয়। এখন ভাবুন তো, পৃথিবীতে এগুলো নিয়ে ভাবতে হয় না কেন আমাদের? কারণ পৃথিবীতে গাছপালা আছে। গাছপালা এই সব ব্যাপার সামাল দেয়। খাবার তৈরি করে, বর্জ্য কাজে লাগাতে পারে, কার্বন-ডাই-অক্সাইড শুষে নিতে পারে এমনকি অক্সিজেনও তৈরি করে। তাই সেই গাছ যদি স্পেইস স্টেশনে ফলানো যায় তাহলে ওপরের সব বিষয়গুলো সহজেই সামাল দেওয়া যাবে। খরচ অনেক কমে যাবে। এমনকি ক্রু সমেত দূরপাল্লার নভোযাত্রাও সম্ভব হয়ে যাবে।

একটা ছোট্ট বিষয় উল্লেখ না করে পারছি না। একটা বদ্ধ ঘরে কাজ করতে ভালো লাগবে আপনার? কেমন হতো যদি আপনি গাছ-গাছালির মাঝে কাজ করতে পারতেন? কেমন প্রশান্তিদায়ক না ব্যাপারটা? আমাদের নভোচারীদেরও প্রচুর ধকলের মাঝে কাজ করতে হয়। অনেক মানসিক চাপ থাকে। এমন জায়গাটা যদি সবুজ-শ্যামল দৃশ্যে ঘেরা থাকে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য কতই না ভালো থাকবে চিন্তা করুন।

এখন আশা করি স্পেইস ফার্মিং এর গুরুত্ব কিছুটা হলেও বোঝাতে পেরেছি আপনাকে। কী ? ভেবেছেন বকবকানি শেষ? হাহা। সূচনা শেষ। এবার বিস্তারিত।

২.

এবার আমরা কথা বলব কী কী প্রতিবন্ধকতা আছে স্পেইসে চাষ করতে গিয়ে।

প্রথমেই আসে মাইক্রো গ্র্যাভিটির কথা। প্রায় ওজনশূন্য পরিবেশে চাষ করাটা মোটেও সহজ নয়। গাছের বিচি থেকে অঙ্কুর গজাতে দেখেছেন কখনো? অনেক চক্ষুশীতল দৃশ্য। খেয়াল করবেন অঙ্কুর সবসময় ওপরের

দিকে ওঠে আর মূল বা শেকড়ের মতো অংশটা সবসময় নিচের দিকে। গাছের নানা ক্ষমতার মাঝে আছে মাধ্যাকর্ষণ শনাক্ত করা। এটাকে Geotropism বলে। মহাকাশের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মাধ্যাকর্ষণের কারণে অঙ্কুর আর মূল কোন দিকে গজাবে তা বুঝতে পারে না। আবার পানি আর মাটিকেও একসাথে রাখলে সমানভাবে ছড়িয়ে যায় তাই বাতাসের প্রবাহ ঠিক মতো হয় না। গাছের শেকড় অক্সিজেন পায় না।

আবার আলোর সাপ্লাই দিতে হয়। কারণ সরাসরি সূর্যের আলো দিলে বেচারারা ওখানেই রেডিয়েশনের কারণে মারা পড়বে। তাই LED দিয়ে আলো সাপ্লাই দিতে হয়।

তাদের স্পেশাল গ্রোথ চেম্বারে চাষ করা হয় যেখানে তাপ, আলো ইত্যাদি বিষয় কন্ট্রোল করা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে কিছু নির্দিষ্ট ওয়েভলেংথের আলো গাছের পাতা বেশি শোষণ করে। যেমন লাল আর নীলের সংমিশ্রণের 'মভ' আলো।

স্পেইস স্টেশনে জায়গাও অল্প। এত অল্প জায়গায় গাছ চাষ করে যথেষ্ট খাবার উৎপাদন সম্ভব না। এর জন্য প্রয়োজন অনেক জায়গা।

গাছের সব অংশ খাওয়ার উপযোগীও না। সে সব অংশ ঘাসফড়িংদের খাওয়ানো যেতে পারে। এতে তারা জৈব সার উৎপাদন করতে পারবে আর চাইলে তাদেরও প্রোটিনের উৎস হিসেবে খাওয়া যাবে। আর দূরপাল্লার যাত্রার ক্ষেত্রে সিল্কওয়ার্মের তৈরি সিল্ক দিয়ে দড়ি ও কাপড় তৈরি করা সম্ভব। জি , এগুলোও স্পেইস ফার্মিং এর অংশ।

এক মিনিট। ভাবছেন কবে কি না মানুষ সাই-ফাই সিনেমার মতো দূরপাল্লার মহাকাশ যাত্রা করবে তখন এসব কাজে লাগবে, তা এখন এগুলো কী উপকারে লাগবে? লাগবে লাগবে। বলছি, শুনুন।

৩.

পৃথিবীতে চাষযোগ্য জমি কম এটা জানেন? জানবেন কীভাবে? থাকেন তো চাষোপযোগী দেশগুলোর মাঝে অন্যতম একটায়। আর এদিকে খাবার চাওয়ার মুখ যে দিনকে দিন বেড়েই চলছে সে হিসেব রাখছেন?

পৃথিবীতে ভার্টিক্যাল ফার্মিং শুরু করলে অনেক দক্ষতার সাথে জমির ব্যবহার করা যাবে। বহুতল বিশিষ্ট গ্রীনহাউজ। এখানে স্পেইস ফার্মিং এর বিভিন্ন ব্যাপার কাজে লাগানো যাবে। যেমন: আলোর ব্যাপারটাই ধরেন। মনে আছে, বলেছিলাম যে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন নির্দিষ্ট ওয়েভলেংথের আলো গাছের জন্য বেশি উপযোগী? সেই আলো ব্যবহার করা যেতে পারে। কীভাবে অল্প পানি ব্যবহার করা যায় এবং অপচয় বাঁচানো যায় সেই জ্ঞানও কাজে লাগানো যাবে। আরো বেশি করে ফলন হবে, উৎপাদন বাড়বে।

কিংবা মনে আছে স্পেইসে বাতাস পরিষ্কার করার কথা বলেছিলাম? ওয়েল বাতাসে ethylene নামের এক কেমিক্যালের উপস্থিতি ফল তাড়াতাড়ি পাকিয়ে ফেলে এবং তাড়াতাড়ি পচিয়েও ফেলে। এটা বেশ বড়ো সমস্যা স্পেইস ফার্মিং এর। তবে এর সমাধান সেই ১৯৯০ এর দিকেই হয়ে গেছে। Wisconsin Center for Space Automation and Robotics এর সাথে নাসার একটা প্রজেক্টে তারা বাতাস থেকে ethylene শুষে নেয়ার জন্য একটা মডেল প্রস্তুত করে এবং সেটা বেশ ভালোই কাজ করে।

তবে আশ্চর্যের সাথে আবিষ্কার হয় যে এই মডেলটা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে বিভিন্ন বায়ুবাহিত ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস,

ফাংগাস, মাইকোটক্সিন ইত্যাদিও সরিয়ে ফেলতে পারে উচ্চ দক্ষতার সাথে। এই টেকনোলজি এখন ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন সুপারমার্কেট, স্টোরেজ হাউজে, রেস্টুরেন্টে ও খাবার তৈরির ফ্যাক্টরিতে যাতে খাবার ও ফলফলাদি তাড়াতাড়ি পচে না যায়।

এছাড়াও বিভিন্ন হাসপাতালে, ক্লিনিকে, স্কুলেও এটা ব্যবহার করা হচ্ছে রোগ জীবাণুর বিস্তার কমানোর জন্য। দেখলেন তো? কত উপকারে লাগছে স্পেইস ফার্মিং।

স্পেইস ফার্মিং করতে গিয়ে সারাক্ষণ গাছের ওপর চোখ সেঁটে রাখাটাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই গাছের কখন পিপাসা পেয়েছে তা গাছ আমাকে নিজেই টেক্সট করে পাঠিয়ে দেয়। অবাক হলেন?

AgriHouse ও BioServe দুটো কোম্পানি একত্রে তৈরি করেছে এমন কিছু সেন্সর যা গাছের পাতার পুরুত্ব মেপে বুঝতে পারে পাতাতে পানি কতখানি আছে। পানি কম মনে হলে সেন্সর সেই তথ্য নিয়ে আমার কম্পিউটারে পাঠিয়ে দেয়। আমি তখন তাদের পানি দেই।

এই বিষয়টা কাজে লাগিয়ে স্বয়ংক্রিয় কোনো সিস্টেমের সাথে জুড়ে দিলে পৃথিবীতে ভার্টিকেল ফার্মে পানির অপচয় একেবারেই কমে আসবে। পানি শুধু তখনই দেওয়া হবে যখন প্রয়োজন।

৪

তো বুঝতে পারলেন স্পেইস ফার্মিং কী জিনিস? এসব বিষয়ে গবেষণা বাড়লে নিজ গ্রহ ছাড়িয়ে মঙ্গলেও আমরা বসতি স্থাপন করতে পারব, পৃথিবীর বাড়তে থাকা মুখে খাবার যোগাতে পারব। নিজ সৌরজগৎ পেরিয়ে যাত্রা করতে হলে স্পেইস ফার্মিং এর বিকল্প নেই। তাই চাষাদের সম্মান দিন। সাদা স্যুট পরিহিত চাষাদের যেমন, তেমনই কোমরে গামছা প্যাঁচানো ঘর্মাক্তদেরও।

"আমার দেশের সকল চাষা
সোনার চেয়েও খাঁটি
মায়ের মতো আগলে রাখে
ফসল ফলার মাটি।।

নতুন ধানের গন্ধ পেতে
করে আবাদ চাষ
একটু সুখের আশায় তারা
খাটছে বারো মাস।

অনেক দামেও যায় না কেনা
চাষার গায়ের ঘাম
সাোনার ফসল ফলেও তারা
নেয় না ঘামের দাম।

এত খাটা খেটেও জোটে
পান্তা ভাতের জল।
তবুও যে হারায় না ভাই
তাদের মনোবল।"

--আমার দেশের চাষা।
-- মোহাম্মদ মাজেদ হোসেন।

রেফারেন্স লিঙ্ক

শনি (Saturn)

সমুদ্র জিত সাহা

সব গ্রহের টানাটানিতে মাত্র ৩ বছর ২ মাসে তুমি পৌঁছে গেছ শনিতে, সৌরজগতে সাইজের দিক থেকে সেকেন্ড, দূরত্বের দিক থেকে ৬ষ্ঠ, আর ঘনত্বের দিক থেকে লাস্ট গ্রহ । এতই হালকা যে শনিকে পানিতে ফেললে ভেসে থাকবে। বৃহস্পতির মতোই গ্যাস দানব, তাই এর ভেতরে ঢোকার কোনো দরকার নেই। তার চেয়ে এর অনন্য বৈশিষ্ট্য শনির রিং এ সার্ফিং করা তোমার লক্ষ্য।

গ্যাস দানবের চারিদিকে ভাঙাচোরা ইটের সাইজ থেকে বাড়ির সাইজের পাথর দিয়ে তৈরি এই পাতলা রিং, পুরুত্ব ১ কিলোমিটারও হবে না। সবাই তেমন একটা ধাক্কাধাক্কি না করে শান্তি বজায় রেখে ঘুরছে। তুমিও চাও এই শান্তি বজায় রাখতে, নাহলে সামান্য গুঁতোগুঁতিতে অরবিট থেকে বের হয়ে যাওয়া পাথরের মধ্যে পিষে মরতে হবে। এই রিং খুব বেশি পুরাতন না; হলে ধুলো পড়ে যেত, চকচক করত না, খুব বেশিদিন টিকতও না। তাই এই রিং এর পাথরগুলোর শান্তি বজায় রাখাই কাজের কাজ হবে।

অসাধারণ সুন্দর বরফ আর পাথরের চোখ ঝলসানো এই রিংগুলোর ওপর দিয়ে চলতে চলতে তোমার নজরে আসবে সুন্দর নীলচে সাদা এক উপগ্রহ, দানবের ৮২ সন্তানের একটা। যার নিচে ভয়ংকর সুন্দর পানির ফোয়ারা, পানি ফুড়ে বের হচ্ছে এর বরফাবৃত সাগর থেকে। কে জানে, হয়তো ওখান থেকে কোনো অদ্ভুত দর্শন এলিয়েন তোমার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে! আরেকটু আগালে দেখবে হলদে এক মিথেনের ঘন মেঘে ঢাকা উপগ্রহ, তাতে আছে মিথেনের বিশাল বিশাল লেক, আর বরফের পাহাড়। এই লেকে নৌকা ভ্রমণ করে পৃথিবীর মতোই ফিল পাবে, শুধু সমস্যা হলো হলদে আকাশ আর -১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা।

এতক্ষণে তোমার ঠান্ডায় জমে অবস্থা খারাপ, সূর্য থেকে এত দূরের জিনিসগুলো খুব সামান্যই আলো পায়।

এক নজরে শনিগ্রহ

ব্যাস: 1,20,000 কি.মি

সূর্যের থেকে আনুমানিক দূরত্ব: 142 কোটি 70 লক্ষ কি.মি

সূর্য-পরিক্রমার সময়: 29 বছর

নিজ অক্ষে ঘোরার সময়: 10 ঘণ্টার থেকে কয়েক মিনিট বেশি

উপগ্রহ: 82 টি

গড় তাপমাত্রা: মাইনাস 178 ডিগ্রি সেলসিয়াস

ঘনত্ব: 0.6873 গ্রাম/সে.মি

গ্র্যাভিটেশনাল ত্বরণ: 35.49 মি/সে

ভর: 5.6846×10^{26} কেজি
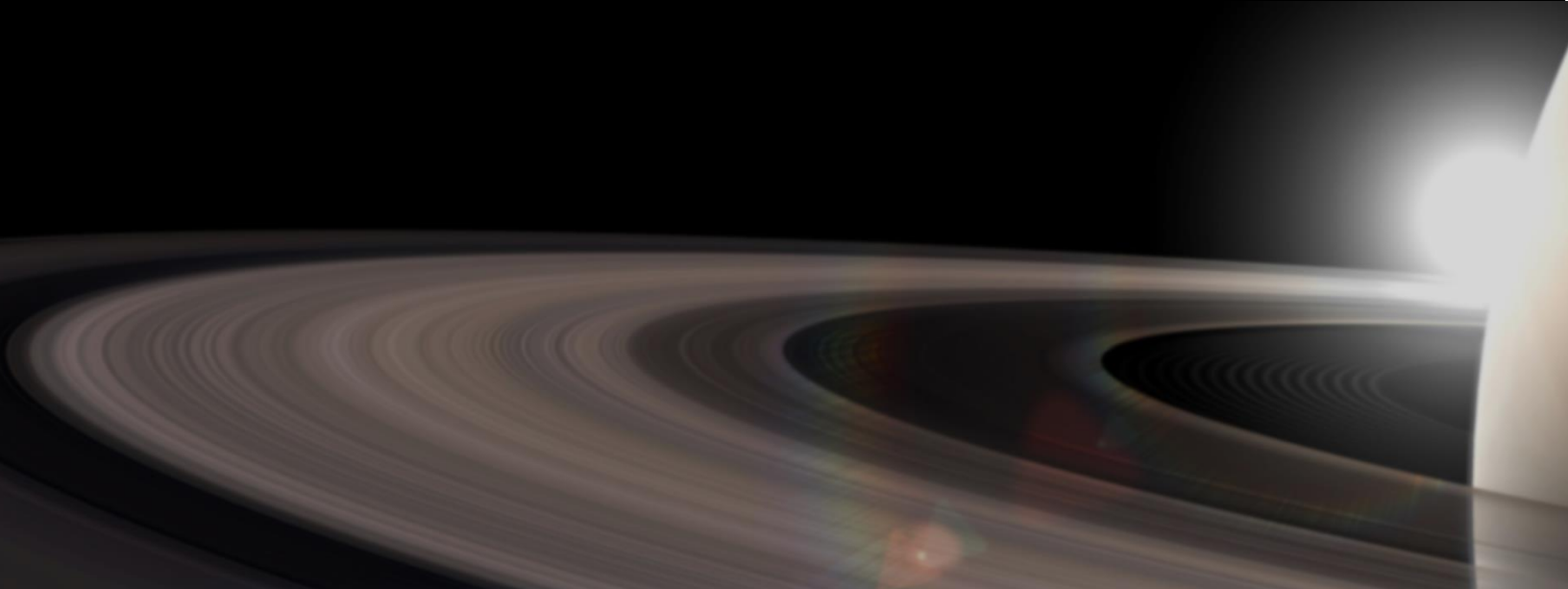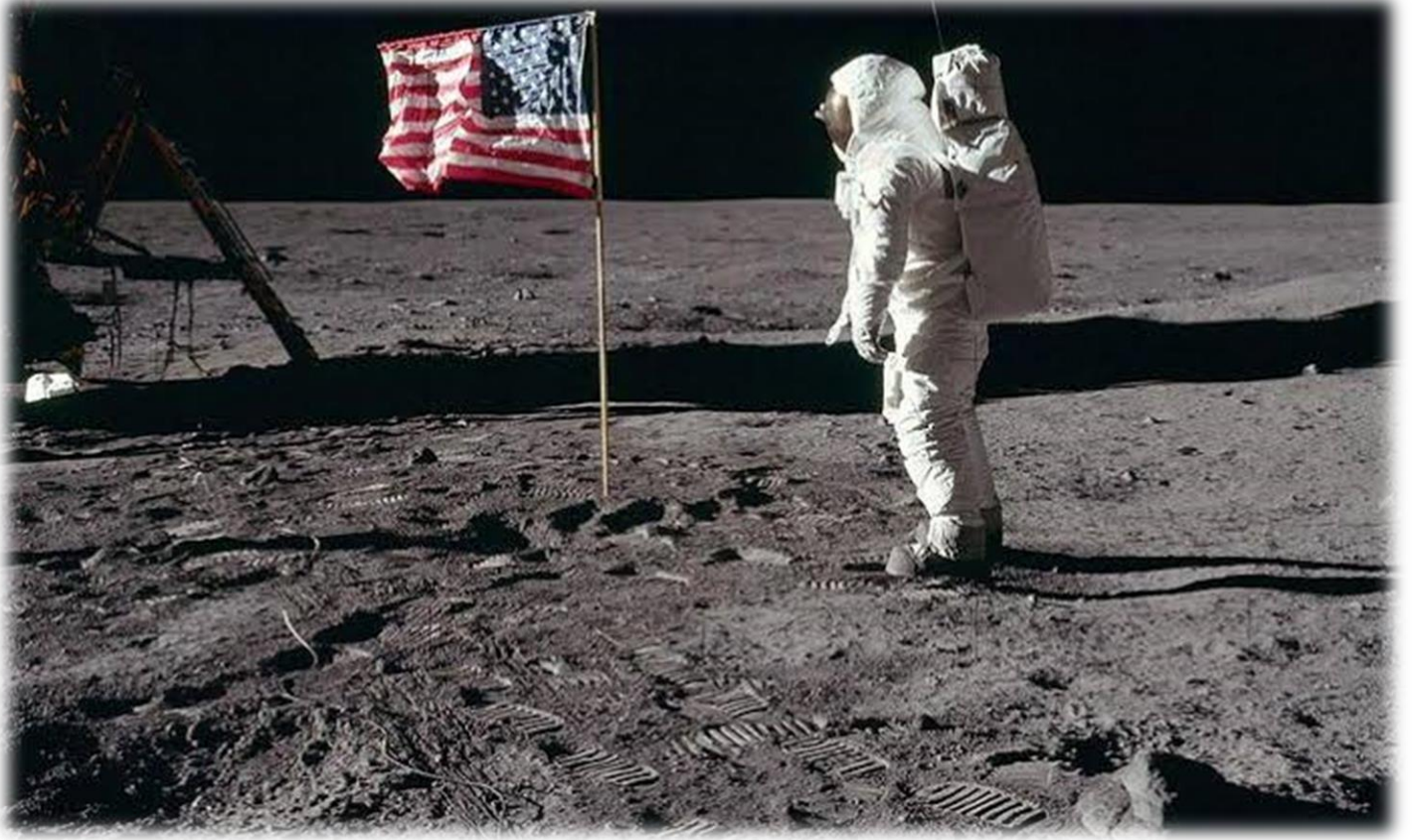
আসলেই কি আমরা চাঁদে গিয়েছি?

মোঃ লিকন

আমরা প্রায় সকলেই জানি ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে নাসা থেকে অ্যাপোলো-১১ নামে একটি মহাকাশযান পাঠানো হয় এবং তিনজন অ্যাস্ট্রোনট এই মহাকাশযানের ভেতরে থাকেন, এবং তাঁরা সফলভাবে আমাদের পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ চাঁদে গিয়ে আবার সেখান থেকে ফিরে আসেন। কিন্তু আসলেই কি সেটা হয়েছে? নিল আর্মস্ট্রং, বাজ অলড্রিন, মাইকেল কলিন্স তাঁরা কি আসলেই চাঁদে গিয়েছিলেন? এমন একটা বাজে প্রশ্ন করা আমাদের মতো সাধারণ জনতার সাজে না। কারণ তাঁরা বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম। আর তাঁদের কাজ নিয়ে আমরা কেন সন্দেহ করব? আসলে তা করার কারণ অনেক। এবং শুধু আমরা না, হাজারো মানুষের সন্দেহ ছিল। এমনকি আছে এখনও। যারা এখনো বিশ্বাসই করে না নিল আর্মস্ট্রং, বাজ অলড্রিন ওনারা চাঁদে গিয়েছিলেন। বিশ্বাস না করার কারণগুলো হলো:

১. আশেপাশের তারা কিংবা নক্ষত্রগুলো কোথায়?

তাঁরা যখন চাঁদে গিয়েছিলেন,তাঁরা ছবি তুলেছিলেন। আর তাঁদের তোলা ছবিটিতে, বাজ অলড্রিনকে দেখা ঠিকই যাচ্ছে। কিন্তু আশেপাশের এলাকাগুলো অন্ধকার এবং কালো, তা কেন হবে? কেননা আমরা পৃথিবী থেকে রাতের বেলা বিভিন্ন

তারা দেখতে পাই, চাঁদে তো কোনো বায়ুমণ্ডল নেই। সেখান থেকে আরো ভালো দেখা যাওয়ার কথা। কিন্তু তাঁদের ছবিতে নক্ষত্রগুলো কই? আসলে নক্ষত্রগুলো ছিলই, উধাও হয়ে যায় নি। আর এটা মহাকাশের কোনো ঘটনার জন্য নয়, বরং ক্যামেরার জন্য। যা হোক এটা হয়েছিল কারণ অ্যাস্ট্রোনটরা চায়-ই নি, যে তারাগুলো দেখা যাক ছবিতে। কেননা, যদি আপনি কোনো ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডে তারা দেখতে চান, তাহলে তার জন্য স্পেশালি সেটিংস ঠিক করে তারপর তুলতে হবে। আর যদি আপনি ক্যামেরায় তারার ছবি তুলতে চান তাহলে "লং এক্সপোজার টাইম" প্রয়োজন। এক্সপোজার টাইম বা শাটার স্পিড বলতে ঐ সময়টুকুকে বোঝায় যে সময় ধরে আলোতে ইমেজ সেন্সর বের হয়ে থাকে। ইমেজ সেন্সর বলতে বোঝায় একটা সেন্সর যেটা আশেপাশের পরিবর্তন বা ঘটনা চিহ্নিত করে এবং তা প্রসেসরে পাঠায়। তো যখন ইমেজ সেন্সরটি বেশিক্ষণ আলোতে থাকবে তখন বেশি আলো প্রবেশ করবে এবং পেছনের তারাগুলো দেখা যাবে। তবে আপনি রাতের বেলা ছবি তুলতে গেলে যদি বেশিক্ষণ ধরে ইমেজ সেন্সর বের করে রাখেন তাহলে ফ্রেমের তুলনামূলক যে আলো কম সেটা একটু ওভার এক্সপোজড এবং ব্লার হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি তারা ঠিকই দেখতে পাবেন। ছবিগুলোতে দেখবেন শাটার স্পিড বেশি থাকলে তারা দেখা যাচ্ছে কিন্তু চাঁদটা ব্লার। আর কম শাটার স্পিড থাকলে চাঁদ দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ার কিন্তু কোনো নক্ষত্র নেই। ঠিক এভাবেই চাঁদে যদি বেশি এক্সপোজার টাইম বা বেশি শাটার স্পিড দিয়ে ছবি তোলা হতো তাহলে সূর্যের আলো চাঁদের পৃষ্ঠে পতিত হয়ে তা রিফ্লেক্ট করত এবং সবকিছু অতিরিক্ত সাদা হতো। ফলে অ্যাস্ট্রোনটদের দেখা যেত না। এনভিডিআর এর ইঞ্জিনিয়াররা এটা নিয়ে ডেমনস্ট্রেশন করেছেন; তাঁদেরকে ধন্যবাদ। ছবিতে দেখতে পারবেন, যদি এক্সপোজার টাইম বেশি হতো, অর্থাৎ বেশিক্ষণ ধরে আলো ক্যামেরার ভেতর ঢুকত তাহলে আমরা সাদা আলো বাদে আর কিছু দেখতে পেতাম না। অ্যাপোলো অ্যাস্ট্রোনটরা সেই জন্য কম এক্সপোজার টাইম ব্যবহার করে ছবিগুলো তুলেছিলেন

। তাই আমরা অ্যাস্ট্রোনটদের দেখতে পেয়েছি কিন্তু তাঁদের পেছনের তারা বা নক্ষত্রদের দেখতে পাই নি।

২. পতাকা কেন উড়ছে?

আমরা সবাই জানি চাঁদে পৃথিবীর মতো কোনো আকাশ নেই অর্থাৎ পৃথিবীর চারপাশে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন যে স্তর আছে তা চাঁদে নেই। আমরা পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল দেখি। বায়ুমণ্ডলের ভেতরে যাবতীয় গ্যাস থাকে। আমরা জেনে আসছি, বায়ুর ৭৮% N(নাইট্রোজেন), ২৬% O(অক্সিজেন)। হ্যাঁ কথাটা ঠিকই। কিন্তু সেটা শুধুমাত্র ঠিক পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ক্ষেত্রে। কিন্তু বাকি গ্রহের ক্ষেত্রে অবস্থা এক না, আর সেখানে উপগ্রহ তো দূরে থাকল। তাই চাঁদ নিউটনের সূত্র অনুযায়ী চারপাশের বস্তুকে আকর্ষণ করে ঠিকই কিন্তু তার চারপাশে বায়ুমণ্ডল নেই, অর্থাৎ বাতাস নেই। আমরা দেখে থাকি আমাদের পৃথিবীতে যখন জোরে বাতাস বয় তখন গাছপালারা শুয়ে পড়ে বা নড়ে, কিন্তু বাতাস ছাড়া কি কখনো নড়ে? না, নড়ে না। তাহলে আমরা চাঁদের থেকে যে ফুটেজটি পেয়েছি সেখানে দেখা যাচ্ছে যখন তাঁরা আমেরিকার পতাকা চাঁদের পৃষ্ঠে লাগান তখন পতাকাটা উড়ছে, তা কেন হবে?

এটা অস্বাভাবিক, কারণ চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই। তার মানে কোনো বায়ু চাপও নেই, তাহলে পতাকা কেন নড়বে? আশ্চর্য! কিন্তু

আসলে ওখানে নিউটনেরই আরেক সূত্রের প্রমাণ দেখা যাচ্ছে মাত্র, এবং বায়ুচাপ না থাকার কারণেই এমন ঘটনা ঘটেছে। নিউটনের গতির প্রথম সূত্র: বল প্রয়োগ না করা হলে স্থির বস্তু স্থির থাকবে, গতিশীল বস্তু গতিশীল থাকবে। আর যখন অ্যাস্ট্রোনটরা পতাকাটি লাগাচ্ছিলেন তখন পতাকাটির ওপর ২ টা বল কাজ করছিল। প্রথমত যখন তাঁরা লাগাচ্ছিলেন তখন তাঁদের হাতের নাড়াচাড়ার কারণে পতাকাটি দুলতে থাকে। এখন ভাববেন হয়তো নিউটনের সূত্র অনুযায়ী সারাজীবনই দোলার বা ওড়ার মতো (যাই বলেন) ওরকম করতে থাকবে, কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি। কারণ চাঁদেরও মহাকর্ষ বল আছে। যেটা যেকোনো বস্তুকে চাঁদের দিকে টানে। কিন্তু এটা তুলনামূলক কম, চাঁদের গ্র্যাভিটি এর মান 1.62

m/s^-2, তাই আপনি পৃথিবীতে যদি কোনো পতাকাকে নাড়ান বা ওড়াতে চান তখন আপনি নাড়াচাড়া করার একটু পরই তা নুয়ে পড়ে (বায়ুচাপ না থাকলে)। কিন্তু সেখানে গ্র্যাভিটি কম হওয়ার কারণে এবং বায়ুচাপ না থাকার কারণে তুলনামূলকভাবে একটু বেশি সময় ধরে দুলছিল। তাহলে অ্যাস্ট্রোনটরা যে পতাকা নাড়িয়েছেন সেই দোলনটাকে থামাবে কে? এটা নিয়েই লোকে ভাবতে থাকে সেখানে বায়ু কোথা থেকে আসলো। আর আরেকটা বিষয় উল্লেখ করে রাখা ভালো, চাঁদের পতাকাটা যাতে নুয়ে না পড়ে তার জন্য পতাকার ওপরে রড দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ বলা যায়, উল্টো L আকৃতির একটা রড ব্যবহার করা হয়েছিল। যার কারণে সিনটা দেখতে লোকদের কাছে আরেকটু অস্বাভাবিক লাগত। কারণ যদি ওই রড না থাকত তাহলে পতাকা নুয়ে পড়ত। আর লোকে তখন সহজেই বুঝতে পারত, পুরো ঘটনাটি ঘটেছে গ্র্যাভিটি এর কারণে কিন্তু সেটা নুয়ে পড়েনি। গ্র্যাভিটি কাজ করছিল এবং যেহেতু বায়ুচাপ নেই সেজন্য অ্যাস্ট্রোনটরা যেটুকু নাড়িয়েছিলেন, তা বাধা দেয়নি কেউ এবং অনেকক্ষণ ধরে তা দুলছিল। সেজন্য লোকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল। আশা করি আপনাদের মনে আর সন্দেহ থাকবে না। কারণ পুরো ঘটনাটি ঘটেছিল, গ্র্যাভিটি এবং বায়ুচাপ না থাকার কারণে।

ল্যান্ডিং এর সময় তো চাঁদের মাটিতে গর্ত তৈরি হওয়ার কথা, সেটা কই? আমরা সাধারণত দেখে থাকি যখনই কোনো রকেট পৃথিবী থেকে লঞ্চ করা হয় তখন তা নিউটনের ৩য় সূত্র ব্যবহার করে মাটির দিকে অনেক জোরে চাপ দেয় স্ফুলিঙ্গ বা অগ্নিকণা নিচের দিকে বিচ্ছুরিত করে। আবার বর্তমানে SpaceX, Blue Origin এর মতো কমার্শিয়াল রকেট কোম্পানিরা পুনরায় ব্যবহার করা যায় এমন রকেট আবিষ্কার করেছে। তারা রকেটের বুস্টার অর্থাৎ যে অংশটুকু স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে, সেটা ল্যান্ড করে লঞ্চ এর খরচ কমিয়ে এনেছে। তারা যখন ল্যান্ড করে তখন খেয়াল করে দেখবেন মাটিতে নামার কিছুক্ষণ আগে বুস্টার থেকে অল্প সময়ের জন্য স্ফুলিঙ্গ বের করে যাতে একটা সুন্দর ল্যান্ডিং করা যায়। সেরকম চাঁদেও করা হয়েছিল। কিন্তু পৃথিবীতে লঞ্চ-প্যাডে ল্যান্ডিং করা হয়। আর চাঁদে তো ধুলোতে ল্যান্ডিং করা হয়েছিল, তাহলে নিশ্চয়ই একটা ক্ষত সৃষ্টি হওয়ার কথা। কিন্তু ক্ষত তো দেখা যায় না, তার কারণও বলা যায় ভ্যাকুয়াম বা বায়ুচাপ না থাকা এবং চাঁদের গ্র্যাভিটি। Saturn V রকেটের দুটো অংশ চাঁদে গিয়েছিল, একটা "কমান্ড মডিউল" যেটাতে করে মাইকেল কলিন্স চাঁদকে প্রদক্ষিণ করেন, আরেকটা "লুনার মডিউল" যেটা চাঁদের পৃষ্ঠে ল্যান্ড করে। আবার লুনার মডিউল এর ২ টা অংশ ছিল- ডিসেন্ট স্টেজ, অ্যাসেন্ট স্টেজ। ডিসেন্ট স্টেজ ছিল শক্তিশালী, এটার সর্বোচ্চ ক্ষমতা ছিল ১০,৫০০ পাউন্ড থ্রাস্ট। কিন্তু চাঁদের পৃষ্ঠে এত পাউন্ড থ্রাস্ট প্রয়োজন হয়নি। আমরা জানি , পৃথিবীর গ্র্যাভিটির প্রায় ৬ ভাগের ১ ভাগ গ্র্যাভিটি চাঁদের। তাই চাঁদে বস্তুর ওজন অনেক কমে যায়। আবার যখন পুরো লুনার মডিউল কমান্ড মডিউল থেকে পৃথক হয় তখন থেকে ডিসেন্ট স্টেজ একটু করে স্ফুলিঙ্গ বের করে এবং তা যাতে বাঁকাভাবে না নামে- তা নিশ্চিত করে। তাই যখন তাঁরা চাঁদের মাটিতে নামেন তখন থ্রাস্ট মাত্র ৩০০০ পাউন্ড ব্যবহার করেন। আবার যখন ল্যান্ডিং হয় তখন বায়ুচাপ না থাকায় এবং গ্র্যাভিটি কম হওয়ায় স্ফুলিঙ্গ খাড়াভাবে না পড়ে তা চারদিকে ছড়িয়ে বের হয়। আর এর কারণেই চাঁদের গায়ে কোনো ক্ষত সৃষ্টি হয় না।

৩. ভ্যান অ্যালেন বেল্ট পেরিয়ে গেল কীভাবে?

প্রথমে আসি কী এই ভ্যান অ্যালেন বেল্ট? এটা মূলত পৃথিবীর বাইরের দুই পাশে ডোনাটের মতো একটা স্তর, যেটার ভেতর বিভিন্ন চার্জিত পরমাণু রয়েছে। অর্থাৎ এখানকার রেডিয়েশন আমাদের শরীরের ক্যান্সার ঘটাতে পারে। আর তার মধ্যে দিয়েই তো ১৯৬৯ সালে অ্যাস্ট্রোনটরা চাঁদে গিয়েছেন। উল্লেখ করে রাখি, ভ্যান অ্যালেন বেল্ট বায়ুমণ্ডলের মতো সব দিক দিয়ে নেই। ধরুন, আপনি একটা গোলককে চার আঙুল দিয়ে হাত মুঠো দিয়ে ধরলেন। তাহলে গোলকটা হচ্ছে পৃথিবী এবং আপনার হাতটা হচ্ছে ভ্যান অ্যালেন বেল্ট। নাসা ইচ্ছে করলে অন্য দিক দিয়ে অর্থাৎ যে দিক দিয়ে বেল্ট নেই সেদিক দিয়ে অ্যাস্ট্রোনটদের পাঠাতে পারত। কিন্তু তাঁরা হিসেব করে দেখেছে যে, বেল্টের ভেতর দিয়ে গেলে যাওয়ার রাস্তা কম হবে, এবং

এই রেডিয়েশন অতটা ক্ষতিকর না। নাসার অফিসিয়াল একটা ডক আছে, সেখানে সব বর্ণনা দেওয়া আছে। ভ্যান অ্যালেন বেল্টে রেডিয়েশন আছে ঠিকই। কিন্তু তা কম এবং যদি সমস্যার স্বীকার হতেই হয় তাহলে বেল্টের নিচের স্তরে (যেটা বেশি ক্ষতিকর) অনেক সময় কাটাতে হবে, এখানের বিষয়টা প্রুফ করার জন্য অনেক অঙ্ক আছে। বেল্টের বিভিন্ন অংশের রেডিয়েশন বিভিন্ন। তাই বিভিন্ন রং দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। তাঁরা "অ্যাপোলো ১১" এ ২৫,০০০ কিমি/ঘণ্টা বেগে গিয়েছিলেন। আর এই পথে যেতে মোট সময় লেগেছিল ৫২.৮ মিনিট। আর এই সময়ে গেলে মোট রেডিয়েশন হওয়ার কথা ১১.৪ rads (rads একক) এবং তাও স্পেইসক্রাফট বা মহাকাশযানের প্রোটেকশন ছাড়া। তবুও মানুষ ঘণ্টায় ৩০০ rads রেডিয়েশন দেহের ভেতরে নিতে পারে। এরপরেও নাসার মহাকাশযানের কারণে রেডিয়েশন আরো কমে যাবে। শেষে দেখা যায়, অ্যাস্ট্রোনটরা আসলে ০.১৮ rads রেডিয়েশন পেয়েছিলেন। যা খুব কষ্টের কিংবা মারাত্মক কিছু নয়। তবে আরো কিছু বিষয় নিয়ে অ্যাপোলো অ্যাস্ট্রোনটদের ভাগ্যের খেলা খেলতে হয়েছিল। ভ্যান অ্যালেন বেল্ট বাদেও কিছু প্রবলেম ছিল। যেমন-

- সোলার ফ্লেয়ার।
- সি.এম.ই বা কোরোনাল ম্যাস ইজেকশন।
- কসমিক রেডিয়েশন।

কোরোনা বলতে বোঝায় নক্ষত্রের গায়ে প্লাজমা এর আবরণ। সোলার ফ্লেয়ার আর সি.এম.ই একই সাথে ঘটে যখন সূর্যের আবৃত প্লাজমাগুলো সূর্য থেকে বের হয়ে অন্য গ্রহের দিকে অনেক দ্রুতবেগে এগিয়ে আসে। সেটা দেহের ভেতরের ডি.এন.এ কে ভেঙে দিতে পারে। যার ফলে ক্যান্সার হতে পারে, কিন্তু এটাকে থামিয়েছে কীভাবে? আসলে এটা ক্ষতিকর কিন্তু এটাকে থামানোর জন্য মহাকাশযানটি বানানো হয়েছিল অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে। আর অ্যালুমিনিয়াম বা প্লাস্টিক- এরা এই সোলার ফ্লেয়ারকে আটকাতে পারে। ইন্টারন্যাশনাল স্পেইস স্টেশনেও ঠিক একই টেকনিক ব্যবহার করা হয় সোলার ফ্লেয়ার থেকে বাঁচার জন্য। তাহলে শেষ সমস্যা থাকল শুধু কসমিক রেডিয়েশন। আসলে হাই এনার্জি কসমিক রেডিয়েশনের প্রভাব জানা নেই, নাসার ডকুমেন্টে লেখা আছে। আর এটাকে আটকানোর কোনো পদ্ধতিও নেই। এটা অ্যালুমিনিয়াম, প্লাস্টিক কিছু দিয়েই আটকানো যায় না, নক্ষত্রের বিস্ফোরণ, ব্ল্যাকহোল ইত্যাদি কারণে নানা কসমিক রেডিয়েশন সৌরজগতে প্রবেশ করে। কিন্তু তখন অ্যাস্ট্রোনটদের জীবন লাকের ওপর নির্ভর করেছিল। আর তাঁরা ভাগ্যের জোরে কোনো কসমিক রে এর সন্ধান পাননি। আসলে পেতেও পারেন, কারণ অ্যাপোলো-১১ এর রিপোর্ট অনুযায়ী তাঁরা ফ্লাশ লাইটের মতো কিছু দেখেছিলেন। নাসাও এটা ক্লিয়ার করতে পারেনি। এটা ব্রেইনের বা চোখের ইলিউশন হতে পারে বা কসমিক রে-ও হতে পারে। যা হোক অ্যাপোলো অ্যাস্ট্রোনটরা সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিলেন। খুব বেশি ক্ষতিকর কসমিক রেডিয়েশন তাঁদের দেহে ঢোকেনি। কিন্তু মনে প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে কি ইন্টারন্যাশনাল স্পেইস স্টেশনে সবার জীবন ঝুঁকির মধ্যে? না, তা নয়। তার কারণ গবেষণায় দেখা যায়, সোলার ফ্লেয়ার এবং সি.এম.ই হওয়ার সময় তাঁরা কসমিক রে এর সাথে যুদ্ধ করে বা কসমিক রে কে সরিয়ে দেয়। তার কারণে কসমিক রে যদিও ইন্টারন্যাশনাল স্পেইস স্টেশন ভেদ করে ভেতরে ঢুকে ক্ষতি করতে পারত। কিন্তু সোলার ফ্লেয়ার আর সি.এম.ই তা আটকে দেয় । আবার সি.এম.ই অ্যাস্ট্রোনটদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। কারণ তাঁরা অ্যালুমিনিয়াম বা যেটা দিয়ে সোলার ফ্লেয়ার এবং সি.এম.ই আটকানো যায় সেটার ভেতর থাকেন।

৪. চাঁদ থেকে ফিরে আসার সময় লিফট অফ এর সময় স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়নি কেন?

বেশিরভাগ মানুষ স্পেইস শাটল এর স্ফুলিঙ্গের কথা জেনে থাকবেন, কিংবা পৃথিবীর অধিকাংশ রকেট বুস্টারই যখন দেখবেন, তখন দেখা যাবে রকেটের বুস্টারের নিচ দিয়ে আগুনের ফুলকি বা কণা বের হচ্ছে। এই আগুনের কণা মাটির বিপরীতে রকেটে বল প্রয়োগ করে। তার ফলে রকেট

ওপরের দিকে যায়। আর ঠিক সেরকম ভাবে চাঁদের থেকে ফিরে আসার সময় হয়েছিল। শুধু একটা সমস্যা, চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে চলে আসার সময় সেই ভিডিওটা সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। আর সেই ভিডিওতে দেখা যায় যে, সেই লুনার মডিউলের অংশটি ওপরে ওঠার সময় তার কোনো স্ফুলিঙ্গ নেই, তা কেন হবে? এরকম হওয়ার কারণটা হলো জ্বালানি। পৃথিবীর রকেটের বুস্টারে লিকুইড হাইড্রোজেন (স্পেইস শাটল), রিফাইনড কেরোসিন, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু লুনার মডিউলে ব্যবহার করা হয়েছিল হাইড্রাজাইন (N_2H_4), ডাইনাইট্রোজেন টেট্রাঅক্সাইড (N_2O_4)। আর এই দুটোর মিশ্রণে যে অগ্নিশিখা বা স্ফুলিঙ্গ বা আগুণের কণা তৈরি হয়েছিল বা হয় তা স্বচ্ছ। আর তার কারণেই সেই স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়নি। United Launch Alliance (ULA) এর একটা ডেলটা ৪ হেভি রকেটের ছবি আছে সেখানেও একই ফুয়েল বা জ্বালানি ব্যবহার করা হয়। দেখলেই বুঝতে পারবেন।

অ্যাস্ট্রোনটদের পায়ের ছাপ ঠিকই আছে কিন্তু মহাকাশযানের ছাপ নেই কেন?

আমিও এই প্রশ্ন দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলাম এবং সত্যিই মনে করেছিলাম যে মানুষ চাঁদে যায়নি কারণ পায়ের ছাপ থাকলেও লুনার মডিউলের ছাপ থাকবে না এটা হতে পারে না। কিন্তু পরে দেখি এটা একটা হাস্যকর প্রশ্ন। তবুও কেন জানি লোকে এটা জিজ্ঞেস করে, তাও একটু বর্ণনা দিয়ে নিই। লুনার মডিউল (অ্যাসেন্ট ও ডিসেন্ট স্টেজ সহ) পৃথিবীতে ১৭ টন ওজন ছিল, তো চাঁদে গিয়ে তার ওজন কমবে ঠিকই কিন্তু তাও সেটা অনেক ওজন। আর চাঁদের গায়ে ক্ষত করার জন্য যথেষ্ট। তো অ্যাস্ট্রোনটরা নিজেই বলেছেন যে তাঁদের পায়ের ছাপের চাইতে লুনার মডিউলের লেগগুলো বেশি গভীর গর্ত করেছিল। কিন্তু আপনি কি কোনো দিন লুনার মডিউলের তৈরি করা ক্ষত দেখেছেন? কিন্তু পায়ের তৈরি করা ক্ষত অনেকেই দেখেছেন। তাহলে কেন লুনার মডিউলের ছাপ নেই? তার কারণ লুনার মডিউলের ডিসেন্ট স্টেজ চাঁদেই ছিল, শুধু অ্যাসেন্ট স্টেজটা দিয়ে অ্যাস্ট্রোনটরা ফিরে এসেছে। তাহলে যে জিনিস সেখানেই আছে তার তৈরি করা ক্ষত আমরা কীভাবে দেখব? অ্যাস্ট্রোনটরা পা রেখে পা সরিয়ে তার ছবি তুলেছেন কিন্তু লুনার মডিউলের পা রাখার পর তার নিচের অংশকে সরানোই হয়নি। তাই তার ক্ষত এর ছবিও আপনি কোনো দিন দেখেন নি।

বিভিন্ন দিকে ছায়া কেন? সূর্য তো একটাই

চাঁদে যখন মানুষ গিয়েছিল তখন সেখানে দিন ছিল, আর তখন সূর্যের দিকে মুখ করে ছিল। আর ছবিতে দেখেন বিভিন্ন বস্তুর ছায়া বিভিন্ন দিকে। যেহেতু আলোর উৎস শুধু সূর্যই তাহলে এতগুলো ছায়া হবে কীভাবে? তার কারণ চাঁদের পৃষ্ঠ। চাঁদের পৃষ্ঠ কিন্তু সমান নয়, এটা এবড়োখেবড়ো। আর অ্যাস্ট্রোনটদের যে ছায়া তৈরি হয়েছে তা সূর্যের আলোর জন্য। আর যেকোনো অসমতল পৃষ্ঠে এরকম ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক। আলোর উৎস একটা হলে এবং অসমতল পৃষ্ঠে অপেক্ষাকৃত উঁচু পর্যায়ের বস্তুর ছায়া, অপেক্ষাকৃত নিচু পর্যায়ের বস্তুর ছায়া হতে ভিন্ন কোণে তৈরি হবে যেহেতু চাঁদের পৃষ্ঠ সমান নয় তাই বিভিন্ন বস্তুর ছায়া বিভিন্ন দিকে পড়ে।

ছায়ায় থাকা অ্যাস্ট্রোনটের স্যুটটা দেখতে আলোকিত লাগছে কেন?

চাঁদ থেকে একটা ছবি তোলা হয়েছিল। সেই ছবিতে দেখা যায় যে, বাজ অলড্রিন যখন চাঁদে নামেন তখন তিনি লুনার মডিউলের ছায়ায় থাকেন। তবুও মনে হয় তাঁর ওপর এক্সট্রা লাইট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা কেন হবে? আমরা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে দেখি কোনো বস্তু ছায়ায় থাকলে তাকে কালো দেখায়। কিন্তু চাঁদে বাজকে আলোকিত দেখার কারণ হলো চাঁদের প্রতিফলক ধর্ম। চাঁদের পৃষ্ঠে যে আলো পড়ে তার কিছু অংশ (১০-১২%) আলো প্রতিফলিত করে। আর তার কারণে সূর্যের আলো চাঁদের পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়ে বাজের শরীরে পড়ে বাজ অলড্রিনকে আলোকিত করে। কিন্তু তবুও লক্ষ করলে দেখা যাবে বাজ অলড্রিনকে একটু অতিরিক্ত

আলোকিত দেখা যাচ্ছিল অন্যান্য লুনার মডিউলের অংশ থেকে। তার কারণ- তাঁদের স্পেইস স্যুটেরও চাঁদের মতো প্রতিফলন ধর্ম ছিল। তাঁদের স্যুটগুলো ৯০% আলো প্রতিফলিত করতে পারত যার কারণে নিলের স্যুট হতে প্রতিফলিত আলো বাজ অলড্রিনকে অধিক আলোকিত করেছিল এবং তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তাঁর ওপর অতিরিক্ত আলো দেওয়া হয়েছে। ছবিতে নিল ছাড়া আর নিলের সাথে দুটো ছবির পার্থক্য দেখানো হয়েছে।

৫. আমরা ১৯৬৯ সালে চাঁদে গিয়েছি, এখন আর যাই না কেন?

এরকম অনেকে বলে থাকে। আমরা এখন থেকে কত বছর আগে চাঁদে গিয়েছি, তো এখন আর যাই না কেন? আসলে এখানে সবারই ভুল ধারণা আছে। আর যারা এসব থিওরি বানিয়ে প্রচার করে তাদের মাথায় নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা আছে। হয় পাবনা থেকে পালিয়েছে, নইলে কাউকে বলেনি এরা পাগল। হ্যাঁ, মানুষ চাঁদে ১৯৬৯ সালে ১ম গিয়েছিল। কিন্তু তারপরে অনেক বার মানুষ চাঁদে গিয়েছে। শুধু ১ বার না অনেক বার, অনেক বার। ১ম চাঁদেরপৃষ্ঠে যায় ১৯৫৯ সালে, যা সোভিয়েত ইউনিয়ন পাঠিয়েছিল। তবে মানুষ যায়নি, ১ম মানুষ যায় চাঁদে ১৯৬৯ সালে আমেরিকা, তারপর ১৯৬৯ এবং ১৯৭২ সালের মধ্যে ৬টা "ম্যানড মিশন" চাঁদে যায়। এছাড়াও অনেক আনম্যানড মিশনও চাঁদে যায়। তবে ১৯৭৬ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সঠিকভাবে কোনো মিশন সম্পন্ন হয়নি।তবে আপনি কি জানেন? বর্তমান বছরের ৩ জানুয়ারি একটা যান চাঁদে পাঠানো হয়েছে, আর আপনাদের সুবিধার জন্য নিচে লিস্ট দিচ্ছি, কে কে চাঁদে গিয়েছে:

Neil Armstrong
Edwin "Buzz" Aldrin
Charles "Pete" Conrad
Alan L. Bean
Alan Shepard
Edgar D. Mitchell
David Scott
James B. Irwin
John Young
Charles M. Duke Jr.
Eugene A. Cernan
Harrison "Jack" Schmitt

কেনই বা হবে চাঁদে যাওয়া মিথ্যা?

অনেকে মনে করে চাঁদে যাওয়া মিথ্যা। আচ্ছা তাহলে ধরলাম চাঁদে যাওয়া মিথ্যা, তাহলে ভাবি NASA কে কী করতে হবে-

- কয়েক বিলিয়ন ডলার খরচ করে রকেট বানিয়ে তা হারাতে হবে!!!
- নাসাতে বর্তমানে ১৪ হাজারের মতো কর্মী আছে। তখন কত ছিল জানি না, কিন্তু সবাইকে টাকা দিতে হবে সত্যিটাকে গোপন রাখার জন্য!!!
- ভিডিও বানানোর জন্য নিশ্চয়ই ডিরেক্টর এবং অন্যান্য কর্মী লাগবে। তাদের টাকা দিতে হবে সত্যিটা গোপন রাখার জন্য!!
- যে মানুষদের আকাশে পাঠানো হয়েছিল তাদের একেবারে ঠিক সময়ে আকাশ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে।
- চাঁদের পাথর বা স্যাম্পল লাগবে
- শেষে, চাঁদের শরীরে একটা পতাকা, কিংবা কোনো চিহ্ন রেখে আসতে হবে।

কারণ প্রথম চাঁদে যাওয়ার পথ, চিহ্ন সব চাঁদে আছে। পরে নাসার Lunar Reconnaissance Orbiter দিয়ে ছবিতে প্রমাণ পাওয়া গেছে। কারণ সেখানে সব ক্ষত তখনো ছিল যেহেতু কোনো বায়ুমণ্ডল নেই।
করতে পারবেন? বিলিয়ন ডলার দিলেও, যদি না পারেন তাহলে আমার মনে হয় এতক্ষণে সবার ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে, আসলেই আমরা ১৯৬৯ সালে চাঁদে গিয়েছি।

টেলিস্কোপ, মহাবিশ্ব দেখার জানালা

সমুদ্র জিত সাহা

মহাবিশ্বের মতো বিশাল জায়গায় আমরা পৃথিবী নামক ছোট্ট এক ঘরে বদ্ধ হয়ে আছি, বাইরের অসাধারণ মহাবিশ্ব দেখার জন্য প্রয়োজন জানালা; টেলিস্কোপ আমাদের সেই জানালা। তাই মহাজগৎ সম্পর্কে জানার জন্য টেলিস্কোপ সম্পর্কে জানা আবশ্যক।

টেলিস্কোপ বলতেই আমাদের মাথায় সবার আগে আসে, ভূমিতে রাখা, ট্রাইপডের ওপর দাঁড়ানো লম্বা নল! সামনে তার কাচ, পেছনেও কাচ, পেছনে চোখ রাখলে দূরের জিনিস বড়ো দেখা যায়! স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু কেন? চাঁদের দিকে তাকালে চাঁদের নির্দিষ্ট ক্রেটারের কোনো একটা পাথর খণ্ড থেকেও আলো আমার চোখে আসছে রিফ্লেক্ট হয়ে, কিন্তু আমি ঐ ছোট্ট পাথর খণ্ডটাকে আলাদা করতে পারছি না। কারণ আমার চোখের পিউপিল ছোটো। ব্যাস বড়োজোর ১ সে.মি ও হবে না। এই ছোট্ট ফুটো দিয়ে খুব কম আলো ঢুকতে পারে, যে কারণে রাতের আকাশের বেশিরভাগ জিনিসই আমাদের চোখের আড়ালে থেকে যায়। সমাধান একটাই, বেশি আলো জড়ো করে চোখে বা ক্যামেরায় পৌঁছে দেওয়া। ক্যামেরার ক্ষেত্রে যেমন দেখেন অনেকক্ষণ শাটার খোলা রেখে (এক্সপোজার টাইম বাড়িয়ে) ছবি তুললে কত কিছু দেখা যায়, যা খালি চোখে দেখা যায় না। এর কারণ ক্যামেরার সেন্সরে বেশি আলো প্রবেশের সুযোগ দিচ্ছি, কিন্তু এটা আইডিয়াল কোনো সমাধান না, চোখের ক্ষেত্রে তো না ই! আমাদের ব্রেইন তো চোখে পড়া আলো সাথে সাথেই প্রসেস করে। এমন কোনো উপায়ও নেই যে অনেকক্ষণ ধরে আলো সংগ্রহ করে একবারে দেখব!

সমাধান হলো টেলিস্কোপ, টেলিস্কোপের সামনের লেন্সে যতটুকুই আলো পড়ে সবটুকু চোখে পৌঁছে দিতে পারলেই কাজ হয়ে যাবে। তাই যত বড়ো টেলিস্কোপ, তত বেশি আলো, তত ভালো। Size does matter! এই ব্যাপারটাকে বলা যায় অ্যাংগুলার রেজ্যুলিউশন। অ্যাংগুলার রেজ্যুলিউশন যত বেশি, তত স্পষ্ট দেখা যাবে সবকিছু। অর্থাৎ, ছোটো সাইজের কোনো টেলিস্কোপ থেকে হয়তো ১ মিনিট (১ ডিগ্রির ৬০ ভাগের একভাগ) পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়, তার চেয়ে বড়ো কোনো টেলিস্কোপে হয়তো ১ সেকেন্ড (১ মিনিটের ৬০ ভাগের এক ভাগ) পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। এগুলো ৬০ ভিত্তিক কৌণিক পরিমাপ; মিনিট, সেকেন্ড এখানে কোনো সময়ের একক না। আধুনিক টেলিস্কোপগুলোতে ১ সেকেন্ডের মিলিয়ন থেকে বিলিয়ন অংশের ১ অংশ পর্যন্ত অ্যাংগুলার রেজ্যুলিউশন পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

এই যা! শুরু থেকেই লেন্স লেন্স বলে চিল্লাচ্ছি। যেখানে কিনা প্রফেশনালরাই লেন্স অলা টেলিস্কোপ ব্যবহার করে না।
টেলিস্কোপ প্রধানত দুই প্রকার:
রিফ্র্যাক্টিং টেলিস্কোপ বা প্রতিসরক টেলিস্কোপ
আর রিফ্ল্যাক্টিং টেলিস্কোপ বা প্রতিফলক টেলিস্কোপ।
এদের মধ্যেও ভাগ আছে; কোপার্নিকান টেলিস্কোপ, গ্যালিলিয়ান টেলিস্কোপ, নিউটোনিয়ান টেলিস্কোপ হ্যান ত্যান। সে আলোচনায় আজকে যাব না। টেলিস্কোপের গঠন নিয়েও খুব বেশি বলব না। কারণ এ লেখায় অবজার্ভেটরি আর স্পেইস টেলিস্কোপ নিয়েও কথা থাকবে।

রিফ্র্যাক্টিং টেলিস্কোপঃ

রিফ্র্যাক্টিং টেলিস্কোপে লেন্স দিয়ে অনেক আলো প্রতিসরিত করে ছোট্টো একটা জায়গায় আনে, যা আমরা খালি চোখে দেখি। দুটো উত্তল লেন্স ব্যবহার করা হয় সাধারণত। সিম্পল আইডিয়া, বেশ কাজেরও। যদিও এটা বাম-ডান আর ওপর নিচ উল্টে দেয় (বিশেষ লেন্সের কম্বিনেশনে এটাও এড়ানো যায়) তবে তা কোনো সমস্যার কারণ না। সাথে একটা ভিউ ফাইন্ডার লাগানো থাকে এ সমস্যা আরো দূর করতে। সমস্যা আরেক জায়গায়, এ ধরনের টেলিস্কোপ কত বড়ো হতে পারে তার সীমা আছে, কারণ বেশি বড়ো টেলিস্কোপের ক্ষেত্রে লেন্স এতই ভারী হবে যে নিজের ভারে নিজের আকৃতিই ধরে রাখতে পারবে না। আর বিশাল লম্বা টিউব, ব্যবহারের সময় নড়াচড়া করতে সমস্যা এসব তো বাদই দিলাম। কারিগরি লিমিটের মধ্যে সর্বোচ্চ যত বড়ো রিফ্র্যাক্টিং টেলিস্কোপ বানানো যায় তা আমরা অলরেডি বানিয়ে ফেলেছি। যেটা এখন রাখা আছে Yerkes Observatory তে। পাশাপাশি এ ধরনের টেলিস্কোপের আরেকটা সমস্যা হলো ভিন্ন ভিন্ন রং এর আলোর প্রতিসরণাঙ্ক ভিন্ন। নীল আলো বেশি প্রতিসরিত হয়, লাল আলো কম। ফলস্বরূপ টেলিস্কোপ যত বড়ো হয়, তারাগুলোর রংগুলো আলাদা আলাদা অ্যাঙ্গেলে আসে তত বেশি। ফলে তারার চারপাশে রংধনুর মত রং দেখা যায়। যদিও বিশেষ লেন্স কম্বিনেশন ব্যবহার করে এই সমস্যাও এড়ানো যায়।

রিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপঃ

প্রতিফলক টেলিস্কোপ বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং প্রফেশনাল কাজের প্রায় সব জায়গায় ব্যবহৃত হালকা জটিল আইডিয়ার টেলিস্কোপ। উদ্ভাবকের নামানুসারে নিউটোনিয়ান টেলিস্কোপ নামে অধিক পরিচিত এই টেলিস্কোপ। নিউটোনিয়ান টেলিস্কোপে দর্পণ ব্যবহার করা হয়, দুটো দর্পণ, প্রাথমিক বা প্রাইমারি অবতল দর্পণে আলো প্রতিফলিত হয়ে ২য় একটা ছোটো দর্পণে যায় এবং সেখান থেকে আবার প্রতিফলিত হয়ে আইপিসে এসে পড়ে, যেখান থেকে আমরা দেখতে পারি। অ্যামেচার অ্যাস্ট্রোনমারদের থেকে গ্রাউন্ড অবজার্ভেটরি, এমনকি সব স্পেইস টেলিস্কোপও রিফ্ল্যাক্টিং টেলিস্কোপ। যদিও এর সামান্য অসুবিধা হলো আলো আসার পথে থাকে ২য় দর্পণটি, ফলে ঠিক মাঝ বরাবর সামান্য আলো ১ম দর্পণে পৌঁছাতে পারে না, যদিও এটা তেমন কোনো সমস্যা না।

এ ধরনের টেলিস্কোপ বানানো ও ব্যবহার তুলনামূলক সহজ এবং শক্তপোক্ত। এর কোনো সাইজ লিমিটও নেই। দর্পণ

ব্যবহারের ফলে লম্বা টিউবেরও প্রয়োজন পড়ে না।

অবজার্ভেটরি টেলিস্কোপঃ

অবজার্ভেটরি হলো এমন স্থাপনা যেখান থেকে মহাজাগতিক সব কিছু অবজার্ভ করা হয়। প্রাচীনকাল থেকেই এসব স্থাপনা মানুষেরা তৈরি করে আসছে মহাকাশ দর্শনের সুবিধার জন্য। বর্তমানে সাধারণত কম আলোক দূষণের জায়গায় উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় এসব অবজার্ভেটরিতে বিশাল বিশাল সব টেলিস্কোপ রাখা হয়। অন্যথায় আলোক দূষণের কারণে তারার পাশাপাশি মানুষের কাজের আলো বায়ুমণ্ডলে প্রতিফলিত হয়ে টেলিস্কোপে আসে। আর পাহাড়ের চূড়ায় রাখার ফলে বাতাসও কয়েক কিলোমিটার কম থাকে, এয়ার টার্বুলেন্সও কম হয়। রাতে আকাশে তাকালে কিছু তারাকে মিটিমিটি করতে দেখেছেন? আপনার দেখতে সুন্দর লাগলেও অ্যাস্ট্রোনমারদের জন্য এটা বিশাল সমস্যার। এমনটা হয় কারণ অনেক অনেক দূরের তারা থেকে আসা আলো অনেকটা একটা বিন্দু হয়ে আসে। আর বাতাসের ঘনত্বও বায়ুমণ্ডলের সব জায়গায় একই না, তাপমাত্রা আর বায়ুপ্রবাহের জন্য। ভিন্ন ঘনত্বের তাপমাত্রার প্রতিসরণাঙ্কও ভিন্ন, ফলস্বরূপ আলো ভূমিতে পৌঁছানোর রাস্তায় এঁকেবেঁকে আসে, আর আলো ছড়িয়ে ছড়িয়ে যায়। এখানে আসে নিউটোনিয়ান টেলিস্কোপের আরেক সুবিধা, Adaptive Optics। তুলনামূলক নতুন এই প্রযুক্তি অসাধারণ কাজে আসছে।

Adaptive Optics:

বায়ুর টার্বুলেন্সের এফেক্ট কমানোর চেষ্টায় ব্যবহৃত প্রযুক্তি। প্রথমে অবজার্ভেটরি টেলিস্কোপের পাশ থেকে লক্ষ্য বরাবর আলোক রশ্মি নিক্ষেপ করা হয়। এই আলোর চলনপথ দেখে বাতাসের কোথায় কেমন প্রতিসরিত হচ্ছে তা মাপা হয়, এবং সেই অনুযায়ী ২য় মিররের ছোটো ছোটো অংশ সামান্য বাঁকানো। হয় ছোটো ছোটো অ্যাকচুয়েটর নামের যন্ত্র দিয়ে। ২য় দর্পণের পেছনে একটা তলে সাজানো থাকে হাজার হাজার অ্যাকচুয়েটর, যেগুলো দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী জায়গায় চাপ দিয়ে বাঁকানো হয়, যেন আলো কাঙ্ক্ষিত জায়গায় আসে। এভাবে এয়ার টার্বুলেন্সের প্রভাব অনেক কমানো সম্ভব হয়েছে।

Airborne Observations:

এয়ার টার্বুলেন্সের প্রভাব কমাতে বিমানে লেন্স বসিয়ে তা দিয়েও স্পেইস অবজার্ভেশন করা হয় অনেকসময়। এটার একটা বাড়তি সুবিধা হলো, অনেক আলো যেগুলো বায়ুমণ্ডলে শোষিত হয়ে ভূমিতে পৌঁছাতে পারে না সেগুলোও দেখা যায়, তবে খুব বেশি না।
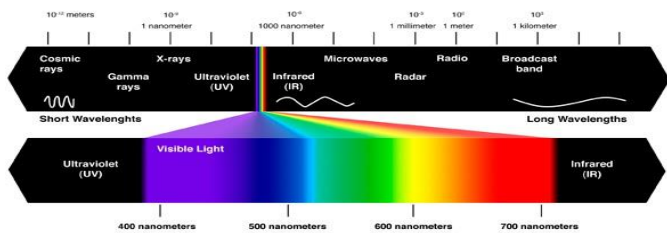
লাইট স্পেক্ট্রামের খুব সামান্য একটা অংশ আমরা দেখতে পারি আর বাকি অংশেরও খুব সামান্য অংশ ভূমিতে পৌঁছাতে পারে। কারণ দৃশ্যমান আলোর ওপরের সব আলো আমাদের বায়ুমণ্ডল শোষণ করে নেয়। যেমন: UV, X-ray, Gamma Ray ইত্যাদি। অর্থাৎ অর্ধেকের বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর ক্ষেত্রে আমরা অন্ধ ভূমিতে। যেটুকু আসে (রেডিয়ো ওয়েভ, ইনফ্রারেড ও দৃশ্যমান আলো) তা দিয়ে কাজ চালানো হয় গ্রাউন্ড বেজড অবজার্ভেটরি টেলিস্কোপগুলো দিয়ে।

বিশাল সাইজের টেলিস্কোপ সূক্ষ্মভাবে তৈরি করা অনেক কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আবার বড়ো টেলিস্কোপ স্থানান্তরও অনেক কঠিন ও ব্যয়বহুল। কিন্তু বিশাল একটা টেলিস্কোপের বদলে অনেকগুলো ছোটো টেলিস্কোপ ব্যবহার করেও একই রেজাল্ট পাওয়া সম্ভব। যে কারণে ভূমিতে অনেক জায়গায় প্রচুর রেডিয়ো টেলিস্কোপ একসাথে দেখতে পাওয়া যায়।

তারপরও, যত চ্যালেঞ্জিংই হোক, কিছু মানুষ কিছু জিনিস করবেই! পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো রেডিয়ো টেলিস্কোপ এখন চায়নায় কাজ করছে।

প্রথম ব্ল্যাকহোলের ছবিও তোলা হয়েছে গ্রাউন্ড বেজড রেডিয়ো টেলিস্কোপ ইভেন্ট হরাইজনের দ্বারা।
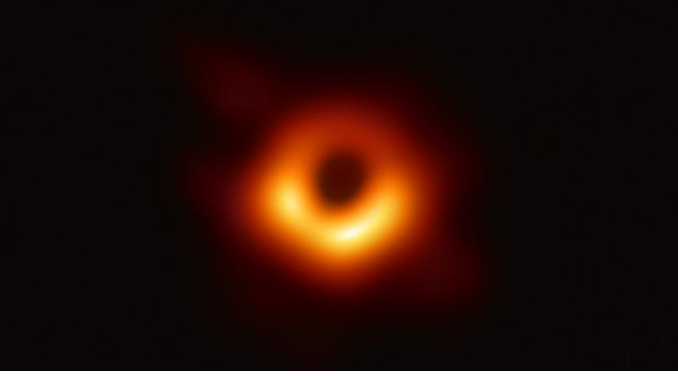
Space telescopes:

মহাবিশ্ব দেখার জন্য আমাদের দৌড় ভূমিতে এ পর্যন্তই শেষ। ইনফ্রারেড, রেডিয়ো আর ভিজিবল লাইট দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। কিন্তু এর মানে আমরা অর্ধেক অন্ধ। তাই বায়ুমণ্ডলের বাইরে, যেখানে সব ধরনের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো দেখা যায়। পৃথিবীর অরবিটে টেলিস্কোপ পাঠানো সহজ কাজ না, ব্যয়ও কম না। কিন্তু স্পেইস টেলিস্কোপ পাঠানো আবশ্যক। আপাতত পাঠানো পুরোনো সব টেলিস্কোপ যেসব অসাধারণ ছবি ও তথ্য আমাদের পাঠিয়েছে তা দেখে আরো শক্তিশালী টেলিস্কোপ পাঠানোর কাজ চলছে। এক্সোপ্লানেট খোঁজার ক্ষেত্রেও এসব টেলিস্কোপ অতুলনীয়।

Hubble Telescope:

নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় টেলিস্কোপ হলো হাবল টেলিস্কোপ। মাত্র আড়াই মিটার দর্পণের এই টেলিস্কোপ ৩০ বছর ধরে আমাদের বিস্ময়কর সুন্দর সব ছবি দিয়েছে। দিয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডেটা। এই টেলিস্কোপ আল্ট্রা ভায়োলেট, নিয়ার ইনফ্রারেড আর ভিজিবল স্পেক্ট্রামে ছবি তুলত। হাবল পাঠানোর পর সামান্য একটা ভুলের জন্য বেশ কথা শুনতে হয়েছিল নাসাকে। বিশ্বব্যাপী পরিহাসের শিকারও হতে হয়েছিল। মিররে একটা সমস্যার জন্য ঘোলা ছবি আসছিল। যা ফিক্স করতে আরেকটি মিশন লঞ্চ করা হয়, এবং অ্যাস্ট্রোনটরা হাতে করে ফিক্স করেন এই টেলিস্কোপ। হাবল টেলিস্কোপের তোলা অসাধারণ প্ল্যানেটারি নেবুলার ছবি:

Chandra X-ray Observatory:

ভারতীয় নোবেলজয়ী গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরের নামে নামকরণ করা Chandra X-ray observaotory মূলত X-ray রেঞ্জের আলো দেখত। বিজ্ঞানীদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ডেটা ও ছবির যোগান দিয়েছে এই টেলিস্কোপ।

Spitzer Space Telescope:

২০০৩ সালে পাঠানো ইনফ্রারেড আলোর টেলিস্কোপ স্পিতজার স্পেইস টেলিস্কোপ। ১৭ বছর ধরে অসাধারণ সব ছবি দিয়েছে আমাদের।
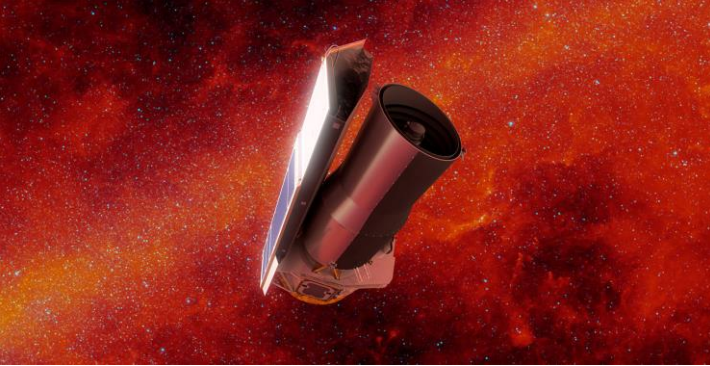
TESS:

Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) এর মূল কাজ ছিল এক্সোপ্লানেট বা সৌরজগতের বাইরের গ্রহ খুঁজে বের করা। এখনো পর্যন্ত ৬৩ হাজারের বেশি এক্সোপ্লানেট ট্রাঞ্জিট মেথডে (গ্রহ যখন নক্ষত্র ও আমাদের মাঝ দিয়ে যায় তখন যে পরিমাণ আলো আসতে বাধা দেয় তা পরিমাপ করে)।
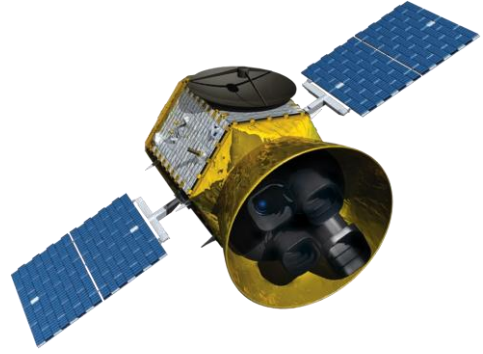
James Webb Space Telescope:

এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং প্রজেক্ট হলো জেমস ওয়েব স্পেইস টেলিস্কোপ। বিশাল সাড়ে ৬ মিটার প্রাইমারি গোল্ড প্লেটেড অসম্ভব সূক্ষ্ম মিররের এই বিশাল টেলিস্কোপ পাঠানোর চ্যালেঞ্জে লঞ্চ শিডিউল বারবার পেছাচ্ছে বছরের পর বছর ধরে। এত বড়ো টেলিস্কোপ রকেটে রাখার জায়গাই নেই। ফলস্বরূপ অরিগ্যামির মতো ভাঁজ করে একে পাঠানো হবে এবং এটা আনফোল্ড করবে স্পেইস তার অরবিটে গিয়ে, এজন্যই এই প্রজেক্টটা এত চ্যালেঞ্জিং। সামান্য ভুল হলেই হাবলের মতো ফিক্স করার কোনো সুযোগ নেই এর। তাই বারবার টেস্ট চলছে। এতে আছে সূর্যের প্রবল তাপ থেকে বাঁচতে বিশাল হিট ইনসুলেটর। এটাও অরবিটে গিয়ে ভাঁজ খুলে বের হবে। নিয়ার আল্ট্রা ভায়োলেট, নিয়ার ইনফ্রারেড এবং ভিজিবল আলোর রেঞ্জে কাজ করা সুবিশাল এই টেলিস্কোপ স্পেইস অবজার্ভেশনে আমাদের বিশাল মাইলফলক এবং স্টেপ-আপ! হাবলের রিটায়ারের পর এটি হাবলের উত্তরসূরি। অসাধারণ সব ছবির আশা করা যাচ্ছে বিশাল বাজেটের এই টেলিস্কোপ থেকে।
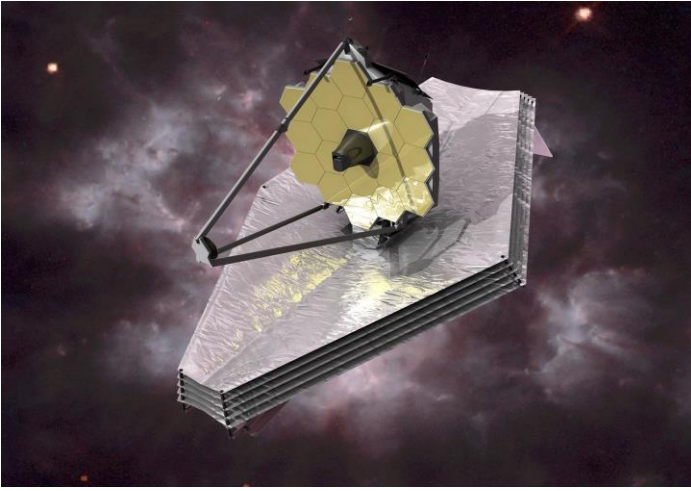
টেলিস্কোপের বাজেটঃ

শেষ করতে চাই টেলিস্কোপের বাজেটের ব্যাপারে কিছু কথা বলে। বিজ্ঞানের অন্যসব ক্ষেত্রের মতোই (বরং বেশি) এখানেও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। টেলিস্কোপের বাজেট পেতে স্পেইস অর্গানাইজেশনগুলোর বেশ বেগ পেতে হয়। স্পেইস টেলিস্কোপ গুলোও প্রচণ্ড ব্যয়বহুল, কিন্তু এদের সুবিধার কথা চিন্তা করে এদের পাঠানো আবশ্যক। স্পেইস রেস শেষ হওয়ার পর থেকেই বাজেট কমতে শুরু করে এসব সায়েন্স প্রজেক্টে। এসবের গুরুত্ব বোঝে না রাষ্ট্রপ্রধানরা, যে কারণে হাবলের সামান্য ভুলের জন্য এত কথা শুনতে হয়েছিল। কারণ ফিক্স করার মিশনে ৫০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার খরচ হয়েছিল।

মানুষের ইন্টারেস্টও এক্ষেত্রে একটা বড়ো ভূমিকা রাখে। গত কয়েক দশকে একটা স্পেইস ক্রাফট পাঠানোর খরচ আর একটা মুভি তৈরির খরচের গ্রাফ একসাথে দেখলে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়। আজকাল মুভি তৈরির চেয়ে কম খরচে মহাকাশে স্পেইসসিপ পাঠানো যায়। অথচ বছরে কয়টা মুভি তৈরি হয় আর কয়টা স্পেইস ক্রাফট পাঠানো হয়? তাছাড়াও একেকটা ফুটবল লীগের বাজেটে বছরে কয়েকটা করে জেমস ওয়েব স্পেইস টেলিস্কোপ পাঠানো যাবে, যেখানে বাজেটের চাপে ভুলত্রুটি এড়াতে বছরের পড় বছর পেছাচ্ছে এর লঞ্চ ডেট, দশক ধরে অপেক্ষার পর পাঠানো সম্ভব হচ্ছে একেকটা স্পেইস-ক্রাফট, রোভার, টেলিস্কোপ। স্পষ্ট বোঝা যায়, সায়েন্সে বিনিয়োগ করার কারণ সাধারণ মানুষ বোঝে না। এ তো গেল মাত্র দুটো ইন্ডাস্ট্রির কথা। এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। এসবের যে গুরুত্ব নেই তা নয়, বিনোদন অপরিহার্য, বিনোদনের দরকার আছে। কিন্তু তারপরও এখানে ব্যবহৃত অর্থ আর সায়েন্সের বিনিয়োগ করা অর্থে আকাশপাতাল পার্থক্য কেন? আর সায়েন্সে কি বিনোদন, রোমাঞ্চ নেই? আমি তো মনে করি ওসবের চেয়ে অনেক বেশি আছে। শুধুমাত্র বাজেটের অভাবে হিগস বোসন আবিষ্কারে দশকের পর দশক পিছিয়ে গিয়েছি , গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ আবিষ্কারে পিছিয়ে গিয়েছি, সূর্যকে ব্যবহার করে টেলিস্কোপ বানাতে পারছি না, যার প্রযুক্তি আমাদের ইতোমধ্যেই আছে। তাহলে আমরা কি সঠিক পথে আগাচ্ছি?
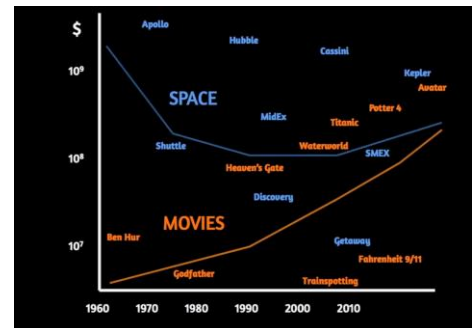
ফ্ল্যাট আর্থারদের যুক্তি খণ্ডন

আবু রায়হান

সমতল পৃথিবী (Flat Earth) বলতে পৃথিবী গোলাকার নয় বরং সমতল, এই রকম ধারণাকে বোঝানো হয়।
চারপাশে তাকালে দেখা যাবে আপাত দৃষ্টিতে পৃথিবীকে সমতল বলেই মনে হচ্ছে। কারণ পৃথিবী এত বড়ো গোলক যে যেকোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে চারপাশটা সমতল বলেই মনে হয়। বিজ্ঞানের যে পরীক্ষাগুলোতে পৃথিবীর উপরিতলের ছোটো কোনো অংশ নিয়ে কাজ করা হয় সেখানে পৃথিবীকে সমতলই হিসেবেই ধরা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ফলাফলের খুব একটা হেরফের বা পার্থক্য হবে না। কিন্তু বৃহৎ দূরত্বের ক্ষেত্রে অবশ্যই পৃথিবীর গোলাকার আকৃতিটা হিসেবে ধরতে হবে।

কিন্তু ফ্ল্যাট আর্থ সোসাইটি নামে একটি সংগঠন আছে যার সদস্যরা সমতল পৃথিবীতে বিশ্বাস করে এবং এ বিশ্বাস প্রসারের জন্য কাজ করে। অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু এই একবিংশ শতাব্দীতেও এমন কিছু মানুষ আছে, যারা মনে করে পৃথিবী গোলাকার না, বরং সমতল।

এদের ধারণা অনুযায়ী গোলাকার পৃথিবী সম্পর্কিত যত গবেষণা এবং ছবি বা ভিডিয়ো প্রমাণ আছে, সব নাসা এবং উন্নত বিশ্বের সরকারগুলোর ষড়যন্ত্র। বাস্তবে পৃথিবী একটি চাকতির মতো সমতল পৃষ্ঠ বিশিষ্ট, চন্দ্র এবং সূর্যের আকার খুব বেশি না, সেগুলো মাত্র তিন হাজার কিলোমিটার ওপর দিয়ে পৃথিবীর ওপর বিচরণ করে এবং পৃথিবী একটি নির্দিষ্ট বেগে ওপরের দিকে ছুটে যায় (ক্রমাগত লাফিয়ে উঠছে) বলেই মাধ্যাকর্ষণের সৃষ্টি হয়।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, পৃথিবী যে আসলেই গোলাকার সেটি বোঝার জন্য নাসা বা কোনো দেশের সরকারের ওপর নির্ভর করার কোনো দরকার নেই। নাসা বা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই মানুষ জানত পৃথিবী গোলাকার। অনেকের ধারণা, আমেরিকা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ক্রিস্টোফার কলম্বাস পৃথিবীকে গোলাকার প্রমাণ করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে পৃথিবী যে গোলাকার, তা আরো আগে থেকেই মানুষ জানত। কোনো প্রকার জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়াই অতি সাধারণ কিছু পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আপনিও সহজেই বুঝতে পারবেন পৃথিবী আসলে সমতল নয়, বরং গোলাকার।

আজকের এই ২৬ শতকে দাঁড়িয়ে এই আজব দাবিটাকে অষ্টমাশ্চর্য বলে মনে হচ্ছে তাই না?
যাইহোক, তাদের দাবি প্রতিষ্ঠা করার পেছনে 'ফ্ল্যাট আর্থ সোসাইটি'-র সদস্যরা কী কী যুক্তি (কুযুক্তি) দেয় এবং সেসব যুক্তিগুলোর (কুযুক্তিগুলোর) জবাব কী?

ওদের কুযুক্তির জবাব তো বর্তমান বিজ্ঞানের কাছে স্পষ্টভাবেই আছে তবে জবাব দেওয়ার আগে হালকা করে

প্রথমেই ফ্ল্যাট আর্থ সোসাইটির মতে সমতল পৃথিবী নিয়ে তাদের দাবি করা যুক্তিগুলো (কুযুক্তিগুলো) জানা যাক।
তাদের মতে:-

1. পৃথিবী একটা চ্যাপ্টা চাকতি/ডিস্কের মতো। এর কেন্দ্রে রয়েছে সুমেরু বৃত্ত, এই চাকতিকে ঘিরে থাকা একটি উঁচু বরফের দেওয়ালই কুমেরু। নাসার লোকেরা এই প্রাচীরটি পাহারা দেয়। তারা মানুষকে ওই প্রাচীর ডিঙাতে বাধা দেয়/আটকিয়ে রাখে, না হলে লোকজন পৃথিবীর বাইরে পড়ে যাবে।
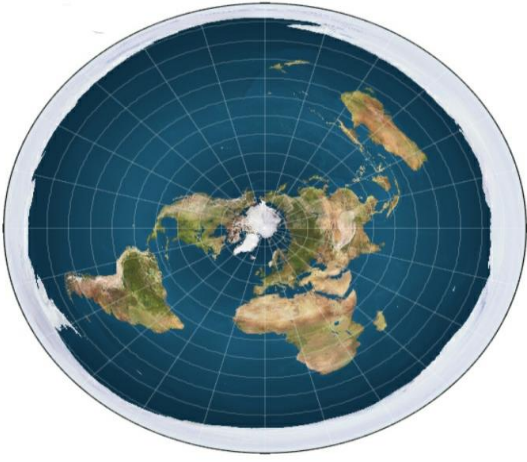
2. চাঁদ ও সূর্য এই চাকতির ওপরে পাক দেয়, তাই দিন-রাত্রি হয়। আর একটা 'অ্যান্টিমুন'/Shadow object যাকে তারা রহস্যময় সোলার স্যাটেলাইটও বলে থাকে সেটা এই ঘুরপাকের খেলায় রয়েছে যা মাঝে মাঝে চাঁদ সূর্যের মাঝখানে এসে পড়ে, যাকে চোখে দেখা যায় না। তবে এর কারণেই চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ হয়।
3. পৃথিবীর অভিকর্ষ আসলে একটা ইলিউশন। বরং 'ডার্ক এনার্জি' নামের একটা বল সেকেন্ডে ৩২ ফিট (৯.৮মিটার) বেগে ওপর দিকে ঠেলে পৃথিবীর এই চাকতিকে। এর ওপরে দাঁড়িয়ে মনে হয় নিচের দিক থেকে কেউ টানছে যাকে আমরা অভিকর্ষ বল বলে মনে করে থাকি। আসলে অভিকর্ষ একটা ভুয়া শব্দ।
4. পৃথিবীর গোলকাকৃতি ছবিগুলো সবই নকল। মহাকাশ-টহাকাশও বাজে কথা। নাসা ও অন্যান্য সংস্থা মহাকাশ গবেষণার নামে বিপুল অর্থোপার্জন করে।
5. অন্যান্য গ্রহ গোলাকার হলেও পৃথিবী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হয়ে সমতল (ডিস্কের/প্যানকেকের মতো)। পৃথিবী কোনো গ্রহই নয়। অন্য গ্রহ, উপগ্রহ গোল হলেও পৃথিবী সমতল হতেও পারে। এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হলো অন্যান্য গ্রহ গোল হওয়ার সাথে পৃথিবীর গোল হওয়ার তুলনা করা বা সাদৃশ্যতা মিলানো ঠিক নয় কারণ পৃথিবীর যে অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য (পানি,জীবন) আছে তা অন্য কোনো গ্রহ বা উপগ্রহের নেই।
6. পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রে এবং চাঁদ সূর্য এর ওপরে ঘোরাফেরা করে দিনরাত ঘটায়। মানে সূর্য পৃথিবীর ওপর ঘোরাফেরা করে।
7. সায়েন্টিফিক মেথডের বাইরে 'জেটেটিক মেথড' নামের এক পদ্ধতি অনুসরণ করে 'ফ্ল্যাট আর্থ সোসাইটি'-র সদস্যরা দেখান, গোলাকার পৃথিবীর ধারণাটাই নাসা-র ষড়যন্ত্র।
8. রাতের আকাশ পরিবর্তিত হয় না এবং constellations তার অবস্থান থেকে সরে যায় না। (আমরা কিন্তু সবসময়,সবজায়গায় আকাশে একইরকম constellations এর দেখা পাই না।)
9. পৃথিবী ঘূর্ণায়মান নয়।
10. মানুষের চাঁদে যাওয়ার ঘটনা পুরোটাই শ্যুটিং করা,ভুয়া।

ইত্যাদি।

<u>সমতল পৃথিবীর প্রমাণে কথিত কিছু কুযুক্তি ও জবাব</u> :

সমতল পৃথিবীর প্রমাণে কথিত কিছু কুযুক্তি-

প্রমাণ-১:

এক গ্লাস পানি নিন। এবার একটা ফুটবল নিন। গ্লাসের পানিটুকু ফুটবলের ওপরে ঢেলে দিন। কী দেখলেন?

পানিটুকু ফুটবল গড়িয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছে । অর্থাৎ গ্লাসের পানি আর ফুটবলের পৃষ্ঠ জুড়ে নেই।

প্রমাণ-২:

এবার একটা সসপ্যান নিন। সাথে আগের মতো এক গ্লাস পানি। পানিটুকু সসপ্যানে ঢেলে দিন। দেখবেন গ্লাসের পানি সুন্দরভাবে সসপ্যানের মধ্যে রয়েছে এবং পানির পৃষ্ট সমতল হয়ে আছে।

সমতল পৃথিবী বিশ্বাসীর সিদ্ধান্ত:

এর থেকে বোঝা গেল যে, গোল কিছুর ওপরে পানি থাকে না। কারণ পানি হচ্ছে তরল পদার্থ। এর ধর্মই টলমলে এবং স্থির অবস্থায় থেকে সমতল থাকা যেটা কিনা আমরা সসপ্যানে দেখতে পেয়েছি। সসপ্যান সমতল হওয়ায় সেখানে পানি সমতল ভাবে দেখতে পাই।

পর্যবেক্ষণ থেকে এসব কথা বলাই যায়, তাই না?

এবার পৃথিবীর সাথে মিলিয়ে দেখুন। সাগরে গিয়ে দেখবেন পানি সমতল এবং নদীতে, পুকুরেও তাই দেখবেন। সুতরাং পৃথিবীতে পানি যেহেতু সমতল সেহেতু পৃথিবীকেও সমতল হতে হবে।

সুতরাং, পৃথিবী সমতল (প্রমাণিত)।

<u>পৃথিবী সমতল নয়:</u>

বিজ্ঞানের আলোকে যুক্তি:

ওপরে দেখতেই পেলেন যে, পর্যবেক্ষণগত যুক্তি দিয়ে কত সহজেই পৃথিবীকে সমতল করে ফেলা যায়। কিন্তু এখানে বাস্তবতা কী? পর্যবেক্ষণের কি কোনো ত্রুটি আছে না কি ঠিক আছে? দেখা যাক-

1.

প্রথমতঃ

পৃথিবী বিশাল আর অবশ্যই বিশাল বৃত্ত। বিশাল একটা বৃত্তের ওপর আমাদের ক্ষুদ্র মানুষের কাছে এর একটা অংশকে সমতল মনে হবে সেটাই স্বাভাবিক।

সুতরাং, আপাত দৃষ্টিতে কোনো কিছু সমতল মনে হলেও দূর থেকে পূর্ণ পর্যবেক্ষণ করলে সেটার আকার বদলে যেতে পারে। এটাই হচ্ছে পর্যবেক্ষণের ত্রুটি। সম্পূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণ না করে সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

2.

দ্বিতীয়তঃ

ফ্ল্যাট আর্থাররা হয়তো গ্র্যাভিটির কথা ভুলে গিয়েছেন। তারা গ্র্যাভিটি বিশ্বাস করে না।

কোনো কিছু কেন নিচে পড়বে? অবশ্যই এর পেছনে কোনো কারণ থাকতে হবে? আর পৃথিবীর ওপরে ফুটবলের এই এক্সপেরিমেন্ট এবং পৃথিবীর পানির পরীক্ষা এক হতে পারে না। ফুটবলে পানি ঢাললে তা ফুটবলের পৃষ্ঠে থাকে না, কারণ হচ্ছে পৃথিবীর আকর্ষণ। কিন্তু পৃথিবীতে পানি ঘিরে থাকে, এর কারণও পৃথিবীর আকর্ষণ। অন্য কিছু আকর্ষণ করলে হয়তো পৃথিবীতে পানি থাকত না, পড়ে যেত। যদি সেটার আকর্ষণ পৃথিবী থেকে অনেক অনেক বেশি হতো। সূর্য অনেক দূরে হওয়ায় সেই আকর্ষণ কমে যায়। তাই সূর্য বা চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীর পানি চাঁদ বা সূর্যে চলে যায় না কিন্তু এর ক্ষীণ প্রভাবে জোয়ার-ভাটা ঠিকই হয়।

ঠিক একইভাবে ফুটবলকে যদি পৃথিবী থেকে অনেক দূরে মহাকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন দেখা যাবে পানি ঢাললে সেটা ফুটবলের পৃষ্ঠকে ঠিকই ঘিরে রাখছে (যদি সেখানে পৃথিবী বা অন্য কোনো মহাজাগতিক বস্তুর আকর্ষণের প্রভাব অনেক কম থাকে)।

তাহলে সার্বিকভাবে বলতে পারি ওপরের প্রথম পরীক্ষা দুটোতে পর্যবেক্ষণগত ত্রুটি ছিল এবং এ কারণেই সেই পরীক্ষা থেকে ভুল সিদ্ধান্ত এসেছে।

আবার, পৃথিবী সহ কোনো মহাজাগতিক বস্তু যদি আকারে বেশ বড়ো হয় তাহলে সেটা কোনোভাবেই সমতল বা প্লেটের মতো কিছু হতে পারবে না। এরকম কিছু থাকলেও সেটা নিজের সাথে আকর্ষণে গোল বা প্রায় গোল আকারে পরিণত হতে বাধ্য। মহাবিশ্বের ফিজিক্স মেলাতে হলে পৃথিবীকে গোল হতেই হবে।

নাসা, ইসা এবং অন্যান্য স্পেইস এজেন্সির তোলা ছবিগুলো ফটোশপড বা ফিস আই লেন্সের কারসাজিও যদি হয় তবুও পৃথিবীকে গোল হতেই হবে।

3.জাহাজের উদাহরণ:

যুক্তি (কুযুক্তি):

সমুদ্রে যখন জাহাজ চলে তখন অনেক দূরে গেলে জাহাজ ধীরে ধীরে ছোটো হয়ে আর দেখা যায় না। ফ্ল্যাট আর্থারদের মতে এই ব্যাপারটি নাকি প্রমাণ করে পৃথিবী সমতল। কোনো একটা জাহাজ ছোটো হতে হতে দেখা না যাবার কারণ হচ্ছে জাহাজটি দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাওয়া। এখানে পৃথিবী গোল হওয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।

যুক্তি খণ্ডন:

ওপরের সমতল পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের যুক্তি থেকেই পৃথিবীকে গোল প্রমাণ করা যায়। কিন্তু তারা তাদের এই যুক্তিকে ব্যবহার করছে পৃথিবীকে সমতল প্রমাণ করতে। ব্যাপারটা খুবই হাস্যকর। চলুন দেখা যাক সমুদ্রে জাহাজের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সাথে গোল পৃথিবীর কী সম্পর্ক।

কোনোকিছু যদি সমতল হয় তাহলে সেখান দিয়ে কোনোকিছু দৃষ্টিসীমার বাইরে থাকলেও দুরবিন দিয়ে ঐ বস্তুটিকে ঠিকই দেখতে পাওয়া উচিত যদি ভিজিবিলিটি যথেষ্ট থাকে। কিন্তু ঐ বস্তুটিকে দেখা যাবে না যদি বস্তুটি সমতলে না গিয়ে ঢালুতে যায়। তাহলে একসময় ঢালুতে চলে গেলে দুরবিন দিয়ে দেখাও সম্ভব হবে না।

জাহাজের ক্ষেত্রেও তাই হয়। জাহাজ বহুদূর গেলে সেখানে পৃথিবীর বক্রতা শুরু হয়। তাই যে ব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করে তার সাপেক্ষে বহুদূরের জাহাজ নিচে চলে যায় এবং নিচে চলে যাওয়ায় সাগরের পানি মাঝে বাধা হিসেবে কাজ করে। এর জন্যই বহুদূরে জাহাজ চলে গেলে আর দেখা যায় না, দুরবিন দিয়েও না। এটাই প্রমাণ করে পৃথিবী গোলাকার।

আবার আপনি যদি সাগরের কোনো একটা তীরে দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলে দেখতে পাবেন জাহাজের পাল আগে দেখা যাচ্ছে (পাল তোলা জাহাজকে বিবেচনা করছি ব্যাখ্যার সুবিধার্থে।)। ধীরে ধীরে জাহাজের মাস্তুল আপনার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এই ঘটনা কেবল সম্ভব গোল পৃথিবীর ক্ষেত্রে। পৃথিবী যদি সমতল হতো তাহলে আপনি প্রথম থেকেই পুরো জাহাজটিকে পাল এবং মাস্তুলসহ দেখতে পেতেন। প্রথমে হয়তো ছোটো দেখতেন তারপর ধীরে ধীরে পাল-মাস্তুলসহ জাহাজ বড়ো হতো।
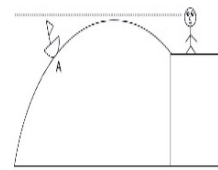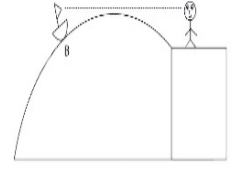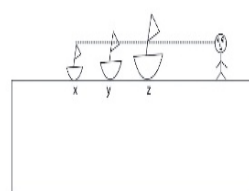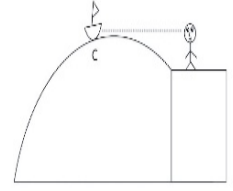
এটাকে আরো একভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। মনে করুন আপনি সাগরের তীরে আছেন আর একটি জাহাজ আপনার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিছু দূর যাওয়ার পর জাহাজটি অদৃশ্য হয়ে

যাবে। আপনি শক্তিশালী দুরবিন দিয়েও জাহাজটাকে দেখতে পাবেন না আর।

কিন্তু আপনার আশেপাশে যদি কোনো পাহাড় থাকে আপনি তাতে উঠে পড়েন তাহলে দুরবিন দিয়ে তাকালেই জাহাজটিকে সহজে দেখতে পাবেন। এইসব ঘটনা সমতল পৃথিবীর ক্ষেত্রে কোনোভাবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব না; কেবল পৃথিবী গোলাকার হলে তবেই এই ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করা যায়।

যদি পৃথিবী সমতল হতো, তাহলে একটা জাহাজ যত দূরে যাবে তত ছোটো হতে থাকবে, শেষে একটা বিন্দুতে পরিণত হবে এবং একসময় আর দেখা যাবে না তাকে।
তবে তা ঘটে না। দূরে যেতে থাকলে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পুরো জাহাজটাই দেখতে পাওয়া যায়। জাহাজের ওপরের পাল আর নিচের কাঠামো দুটোই দেখা যায়। কিন্তু একটা দূরত্ব অতিক্রম করার পর জাহাজের কাঠামোটা আর দেখা যায় না, তবে পাল তখনো দেখতে পাওয়া যায়। মনে হয় পানি জাহাজের ওপরে উঠে এসেছে আর জাহাজটা হয়তো ডুবতে বসেছে। একসময় মনে হয় পুরো জাহাজটাই ডুবে যাচ্ছে পালসহ। তখন শুধু পালের ওপরের প্রান্তটাই দেখতে পাওয়া যায়। এর কিছু সময় পরে আর কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। যেন পুরো জাহাজটাই ডুবে গেছে।

কিন্তু আসলে তো তা হয় না। বেশিরভাগ জাহাজই দেখা যায় আবার নিরাপদে ফেরত আসে। আর কোনো নাবিকই জাহাজের পাল পর্যন্ত পানি উঠে যাওয়ার গল্প বলেনি কাউকে কোনোদিন।

তাহলে এর ব্যাখ্যা কী হতে পারে?
এর একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। ধরুন, পৃথিবীর পৃষ্ঠটা আসলে সমতল না, বক্রাকার (গোলাকার)। সেই ক্ষেত্রে একটা জাহাজ যখন সেটার ওপর দিয়ে যাবে, পৃষ্ঠের বক্রতার কারণে তা ধীরে ধীরে তার নিচের অংশ থেকে অদৃশ্য হওয়া শুরু করবে।

জাহাজের ক্ষেত্রে, সেটি যেদিকেই যাক না কেন তা একইরকমভাবে অদৃশ্য হয়- নিচের কাঠামো থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে পালের ওপর পর্যন্ত।
আরও একটি বিষয় হলো, সবদিকেই অদৃশ্য হওয়ার সময়টুকু সমান, মানে একই বেগে অদৃশ্য হয়। যদি একটা জাহাজ দুই মাইল দূরে থাকে, তবে কাঠামোর একটা নির্দিষ্ট অংশ পর্যন্ত অদৃশ্য হয়, জাহাজটি যেদিকেই যাক না কেন। এ থেকে বোঝা যায় পৃথিবীর পৃষ্ঠটা হয়তো সবদিকেই বাঁকানো এবং মোটামুটি প্রায় একই পরিমাণে।

কিন্তু সবদিকে বাঁকানো পৃষ্ঠ, তাও আবার সমান পরিমাণে- এই রকম আকৃতি আছে মাত্র একটি আকৃতির, সেটি হলো গোলকের। আপনি যদি একটি ফুটবল নিয়ে সেটার ওপর একটা বিন্দু আঁকেন আর সেই বিন্দু থেকে কয়েকটা রেখা যেকোনো দিক বরাবর এঁকে ফেলেন, তখন দেখতে পাবেন সবগুলো রেখাই সমান পরিমাণ বাঁকানো।
জাহাজ যেভাবে সমুদ্রে অদৃশ্য হয়, তা থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় পৃথিবী আসলে সিলিন্ডার না, সমতল না বরং ফুটবলের মতো গোল। সেই গোলকটা মোটামুটি বিশাল আকারের গোলক। যেহেতু আমরা খুব ক্ষুদ্র একটা অংশ আমাদের চোখ দিয়ে দেখি, তাই আমাদের কাছে পৃথিবীর পিঠটা সমতল বলেই মনে হয়।

4.গোলাকার পৃথিবী ধারণার যাত্রা:

অ্যারিস্টটল ৩৪০- ৩৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে প্রকাশ করেন “De Caelo et Mundo”(On the Heavens)
অ্যারিস্টটল তার বই ‘অন দ্য হ্যাভেন’-এ পৃথিবীর গোলাকৃতির পক্ষে যে যুক্তিগুলো দেখান তার মাঝে প্রধান ৩টি যুক্তি হলো-

(১) চন্দ্রগ্রহণের কারণ সূর্য এবং চাঁদের মাঝে পৃথিবীর অবস্থান। চাঁদের ওপর পৃথিবীর ছায়া সবসময় গোলাকৃতির। পৃথিবী যদি সিলিন্ডার বা চ্যাপ্টা থালার মতো হতো তাহলে ছায়াটি লম্বাটে বা উপবৃত্তাকার হতো।

(২) গ্রিকরা ভ্রমণের ফলে জেনেছে- পৃথিবীর দক্ষিণ ভাগ থেকে তাকালে উত্তর ভাগ থেকে দেখা ধ্রুবতারাকে আকাশের অনেক নিচুতে দেখা যায়। যত উত্তরে যাওয়া যায় মনে হবে তারাটি ঠিক মাথার ওপরে উঠে যাচ্ছে। কিন্তু বিষুবরেখা থেকে এর অবস্থান দেখা যায় দিগন্ত রেখায়।

(৩) দূর থেকে যখন কোনো জাহাজ আসত তখন মাস্তুল আগে দেখা যেত। এর মানে জাহাজের উঁচু অংশ আগে দেখা যেত যা গ্রিকরা অনেকদিন ধরেই খেয়াল করেছিল।

ওপরের যুক্তিগুলো থেকে অ্যারিস্টটল সিদ্ধান্ত নেন যে, পৃথিবী গোল। কোনোভাবেই সমতল নয়। মিশর এবং গ্রিসে ধ্রুবতারার অবস্থানের তারতম্য থেকে পৃথিবীর পরিধির অনুমানও করেন তিনি। অ্যারিস্টটল পৃথিবীর পরিধি ৪ লক্ষ স্ট্যাডিয়া নির্ধারণ করেছিলেন (১ স্ট্যাডিয়া = ১৫৭ মিটার এর মতো)। তবে বাস্তবে আমাদের গ্রহের পরিধি এর প্রায় অর্ধেক।

অ্যারিস্টটল ভাবতেন পৃথিবীটা স্থির। সূর্য এবং অন্য গ্রহ তারকারা পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে। সেই সময়ে মানুষ বিশ্বাস করত পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত। ২য় খ্রিষ্টাব্দে টলেমি মহাকাশের কেন্দ্রে পৃথিবীকে কল্পনা করে ব্রহ্মাণ্ডের মানচিত্র তৈরি করেন। চার্চের গুরুরা এই মানচিত্রটি মেনে নেয়। চার্চ একে মেনে নেওয়ার কারণ হলো- টলেমির মডেলটি ছিল গোলাকার এবং এর বাইরে স্বর্গ এবং নরকের জন্য জায়গা ছিল।

১৫১৪ সালে কোপার্নিকাস নামে একজন পোলিশ পুরোহিত সূর্যকে কেন্দ্রে রেখে একটি মডেল প্রকাশ করেন। চার্চের ভয়ে অবশ্য তিনি নিজের নাম দিয়ে প্রকাশ করেননি। এক শতাব্দী পর গ্যালিলিও এবং কেপলার কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে সমর্থন করেন। গ্যালিলিও তার আবিষ্কৃত টেলিস্কোপ দিয়ে পর্যবেক্ষণের পর সিদ্ধান্ত নেন সূর্য সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে। এরপর গ্যালিলিওর কী হয়েছিল সেটা সম্ভবত সবারই জানা আছে।

5.পৃথিবী গোল হলে দিগন্তরেখা সমান দেখায় কেন? বক্রাকার নয় কেন?

পৃথিবীর আকৃতির তুলনায় মানুষের আকৃতি এতই ছোটো যে পৃথিবীর বক্রতা আমরা সহজে বুঝতে পারি না। এমনকি ১৫,০০০ ফুট উঁচুতে থাকা বিমান থেকেও না। যত ওপরে উঠতে থাকা যায় দিগন্তের বিস্তৃতি তত বৃদ্ধি পায়। এমনকি ৪০,০০০ ফুট উঁচুতেও দিগন্তের বাঁক মাত্র ৩.৫ ডিগ্রি (স্থানভেদে পরিবর্তিত হতে পারে)

কিন্তু ওদের মতে আমরা বিমান থেকে পৃথিবীর যে বক্রতা বা কার্ভেচার দেখে থাকি তা নাকি ভুয়া, কারণ আমরা বিমানের কার্ভড(বক্র) জানালা দিয়ে পৃথিবীর ওসব বক্রতা দেখে থাকি যা পৃ্থিবীর প্রকৃত বক্রতা নয় কিন্তু নাসা সহ বিভিন্ন স্পেইস এজেন্সি পৃথিবীর বক্রতা বা কার্ভেচারের অসংখ্য ছবি আমাদের দেখিয়েছেন, আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে পৃথিবীর সুস্পষ্ট কার্ভেচার আমাদের দেখিয়েছে কিন্তু এসব না কি বলে ভুয়া!!

তারা নাকি ফিসআই লেন্স ব্যবহার করে এবং এডিট করে ওসব পিক ভুয়া ভাবে আমাদের কাছে উপস্থাপন করে!!

6.

উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থেকে তারার অবস্থানে ভিন্নতা:

উত্তর মেরুতে পরিষ্কার আকাশে তারা পর্যবেক্ষণ করলে কিছু তারকা-বিন্যাস পাওয়া যাবে। কিন্তু যদি দক্ষিণ মেরু থেকে আকাশ পর্যবেক্ষণ করা হয় তাহলে আগের বিন্যাসের মতো কিছুই পাওয়া যাবে না। নতুন একটি তারকা বিন্যাসের দেখা মিলবে।

উত্তর গোলার্ধে আপনি Big Dippers, Little Dippers, Arcturus, Pleiades দেখতে পাবেন কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধে এদের কোনোটাই দেখতে পাবেন না। পৃথিবী সমতল হলে একই আকাশের নিচের সবাই এই নক্ষত্রমণ্ডল, নক্ষত্রগুলো দেখতে পেতো কিন্তু তা হয় না। বরং দক্ষিণ গোলার্ধে ওসবের পরিবর্তে

আপনি Alpha Centauri, the Magellanic Clouds এবং the Southern Cross দেখতে পাবেন যা কিনা উত্তর গোলার্ধে দেখা যাবে না। পৃথিবী গোলাকার বলেই এমনটা ঘটে থাকে।

দুই মেরুতে ভিন্ন ভিন্ন তারকা বিন্যাস গোলাকার পৃথিবীর পক্ষে সমর্থন প্রদান করে। পৃথিবীর গোলাকৃতির জন্য উত্তর মেরুর পর্যবেক্ষক নিচের দিকের (দক্ষিণ মেরু) তারা দেখতে পায় না, একইভাবে দক্ষিণ মেরুর পর্যবেক্ষক ওপরের অংশের (উত্তর মেরু) তারা দেখতে পায় না। তাই তাদের স্ব-স্ব আকাশে তারার বিন্যাসের ভিন্নতা দেখা যায়।
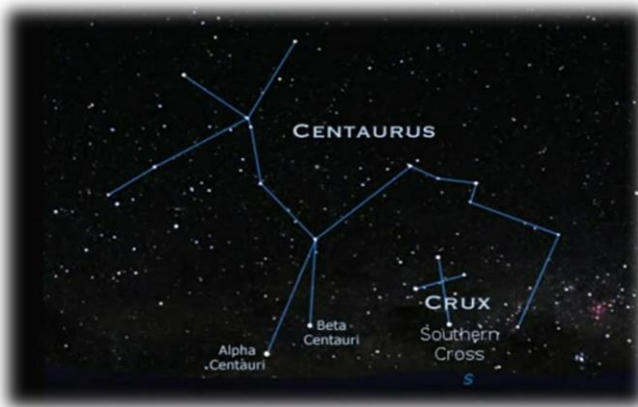
পৃথিবীর এক প্রান্তের মানুষ আরেক প্রান্তের আকাশের তারকারাজি একইরকম ভাবে দেখতে পায় না। পৃথিবী সমতল হলে দেখতে পেতো।
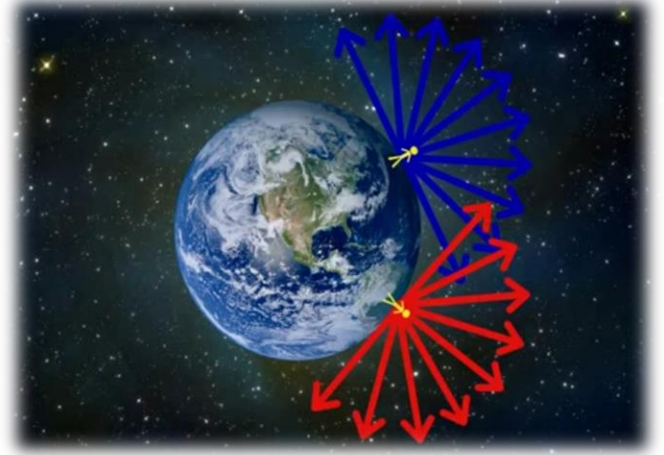
আজ থেকে প্রায় ২,৩০০ বছর পূর্বেই গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল লক্ষ করেন, বিষুবীয় রেখা থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে যেতে থাকলে আকাশের নক্ষত্রগুলোর অবস্থান পরিবর্তিত হতে থাকে। যেসব নক্ষত্রকে বিষুবীয় অঞ্চলে ঠিক মাথার ওপরে দেখা যায়, উত্তরে বা দক্ষিণে গেলে সেগুলো একদিকে হেলে পড়ে এবং বিপরীত দিক থেকে নতুন নতুন নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটতে থাকে।

অ্যারিস্টটল যখন মিসর এবং সাইপ্রাস ভ্রমণ করেন, তখনই প্রথম তিনি ব্যাপারটি লক্ষ করেন। ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে তিনি লিখেন, মিসর এবং সাইপ্রাসের আকাশে এমন কিছু তারা দেখা যায়, যেগুলো গ্রিসের আকাশে দেখা যায় না। তিনি সিদ্ধান্তে আসেন, পৃথিবীর পৃষ্ঠ গোলাকার হলেই কেবল এরকম ঘটনা ঘটতে পারে।

7. চাঁদের দূরত্ব এবং পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণ:

পৃথিবীর দুই মেরু থেকে চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করে ত্রিকোণমিতির সাহায্যে চাঁদ এবং পৃথিবীর দূরত্ব পাওয়া যায় প্রায় ৩,৮৪,৪০০ কিলোমিটার। কিন্তু ফ্ল্যাট আর্থ মডেলে পৃথিবী থেকে সূর্য ও চাঁদের দূরত্ব হয় মাত্র ৩ হাজার মাইল

(৪.৮২ হাজার কিলোমিটার) এবং হাস্যকরভাবে এটিই ফ্ল্যাট আর্থ বিশ্বাসীরা প্রচার করে।
তাহলে উড়োজাহাজ নিয়েই বিকেলে চাঁদ থেকে ঘুরে আসা যাক!
এত কাছে সূর্য আছে, তো পৃ্থিবী জ্বলে যাচ্ছে না কেন?

8.

অন্য গ্রহ, উপগ্রহ গোলাকার কেন?-

তাদের মতে অন্য গ্রহ, উপগ্রহ গোল হলেও পৃথিবী সমতল হতেই পারে। এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হলো- অন্যান্য গ্রহ গোল হওয়ার সাথে পৃথিবীর গোল হওয়ার তুলনা করা ঠিক নয়, কারণ পৃথিবীর যে অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য (পানি,জীবন) আছে তা অন্য কোনো গ্রহ বা উপগ্রহের নেই।

আমাদের প্রতিবেশি সব গ্রহই গোলাকৃতির।
টেলিস্কোপ দিয়েই প্রতিবেশি গ্রহদের পর্যবেক্ষণ করা যায়। অন্যসব গ্রহ গোল হলে পৃথিবী আসলে কোন যুক্তিতে সমতল হতে পারে সেটার কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা ফ্ল্যাট আর্থ সোসাইটি দিয়ে থাকে না।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে, পিথাগোরাস সর্বপ্রথম লক্ষ করেন যে, চাঁদ বৃত্তাকার। সেখান থেকেই তিনি ধারণা করেন, পৃথিবী সহ অন্যান্য মহাকাশীয় বস্তুও বৃত্তাকার। এখনও যদি আমরা টেলিস্কোপের সাহায্যে অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে নিশ্চিতভাবেই দেখতে পারব মহাবিশ্বের প্রায় সকল বস্তুই মোটামুটি বৃত্তাকার। চাকতির মতো সমতল কোনো গ্রহের অস্তিত্ব কোথাও নেই। স্বাভাবিকভাবেই আমরা ধরে নিতে পারি, পৃথিবীর আকারও অন্যান্য গ্রহের মতোই হবে।

9.চন্দ্রগ্রহণ:

চাঁদের একটা মজার ব্যাপার হল এটি হঠাৎ হঠাৎ তার উজ্জ্বলতা হারায়। একটা কালো ছায়া একে ধীরে ধীরে গ্রাস করে যতক্ষণ পর্যন্ত না খুব মৃদু একটা লাল আভা দেখতে পাওয়া যায়। একে আমরা বলি চন্দ্রগ্রহণ। কালো ছায়াটা তারপরই সরে যেতে থাকে আর চাঁদ আবারও নিজের উজ্জ্বলতা ফেরত পেতে থাকে।
সূর্য, চাঁদ এবং পৃথিবী যদি একই সমান্তরালে আসে, তখন পৃথিবীর ছায়া চাঁদের ওপর পড়লে সেটাকে আমরা চন্দ্রগ্রহণ বলি। পৃথিবী গোলাকার বলেই পৃথিবীর যেকোনো স্থান থেকে দিন বা রাতের যেকোনো সময় চন্দ্রগ্রহণ উপভোগ করার সময় চাঁদের ওপর গোলাকার পৃথিবীর ছায়া পড়তে দেখা যায়। কিন্তু যদি পৃথিবী সমতল হয়, তাহলে চাঁদের ওপর গোলাকার ছায়া পড়ার ঘটনাটি, অর্থাৎ পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ হবে খুবই বিরল ঘটনা।

কারণ, অধিকাংশ সময়ই পৃথিবী-চন্দ্র-সূর্য একই সমান্তরালে আসার পরেও দেখা যাবে, পৃথিবীর সাথে তাদের অবস্থান এমন এক কৌণিক তলে যে চাঁদের ওপর গোলাকার পৃথিবীর ছায়া পড়ছে না, কেবলমাত্র একটি সরু দাগ দেখা যাচ্ছে।

যখন পৃথিবীর ছায়া চাঁদের ওপর পড়ে, সেই ছায়া দেখেই পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব। প্রথমত, ছায়ার বাঁকা রেখাটি দেখে বৃত্তের কথাই মনে পড়ে আমাদের প্রথমে, যেন একটা বৃত্তের একটা অংশ সেটা।
গ্রিকরা চন্দ্রগ্রহণ খুব মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা করেছিল। আকাশে চাঁদের অবস্থানের সাথে চন্দ্রগ্রহণের ছায়ার কোনো পরিবর্তন হয়
কি না তা পর্যবেক্ষণ করেছিল তারা।

তারা লক্ষ করলেন আকাশে চাঁদ যেখানেই থাকুক না কেন চাঁদে পতিত ছায়ার আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয় না। চাঁদ আকাশে মাথার ওপর থাকলে ছায়া যেরকম, দিগন্তে থাকলেও তা একই।
আবার দিগন্ত আর মাথার ওপরের মাঝামাঝি অবস্থানেও ছায়ার আকারের কোনো পরিবর্তন নেই। আকাশের বিভিন্ন অবস্থানে সূর্যের আলো চাঁদের ওপর বিভিন্ন কোণে পড়ে, কিন্তু চাঁদের ওপর পতিত ছায়ার আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয় না, সেটি দেখতে তখনও বৃত্তেরই একটা অংশ বলে মনে হয়।

তার মানে পৃথিবী সম্ভাব্য সকল কোণেই বৃত্তাকার ছায়া সৃষ্টি করে। এরকম জ্যামিতিক গঠন সৃষ্টি করতে পারে মাত্র একটি জিনিসই- তা হলো গোলক।

পিথাগোরাসের মৃত্যুর প্রায় ২৫০ বছর পর, অ্যারিস্টটল সর্বপ্রথম বৃত্তাকার পৃথিবীর পক্ষে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি দেখান। তিনি লক্ষ করেন, চন্দ্রগ্রহণের সময় যখন পৃথিবীর ছায়া চাঁদের ওপর পড়ে, তখন ছায়ার আকার অর্ধবৃত্তাকার হয়ে থাকে। এ থেকেই তিনি সিদ্ধান্তে আসেন- পৃথিবী গোলাকার। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে চন্দ্রগহণের সময় মোটামুটি একই রকম অর্ধবৃত্তাকার ছায়া দেখে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, পৃথিবী শুধু গোলাকারই না, তা প্রায় নিরেট বৃত্তাকার।

সমতল পৃথিবী বিশ্বাসীদের মতে 'অ্যান্টিমুন'/Shadow object যাকে তারা রহস্যময় সোলার স্যাটেলাইটও বলে থাকে সেটা এই ঘুরপাকের খেলায় রয়েছে যা মাঝে মাঝে চাঁদ সূর্যের মাঝখানে এসে পড়ে, যাকে চোখে দেখা যায় না। তবে এর কারণেই চন্দ্রগ্রহণ হয়।

অ্যান্টিমুনের ঘনত্বের প্রভাবে চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদে রেডনেস দেখা যায়।

অ্যান্টিমুন যথেষ্ট ঘন (আধা স্বচ্ছ) নয় যার কারণে সূর্যের কিছু আলো লিকড হয়ে চাঁদের সারফেসে পতিত হয় এবং চাঁদে রেডনেস সৃষ্টি করে।
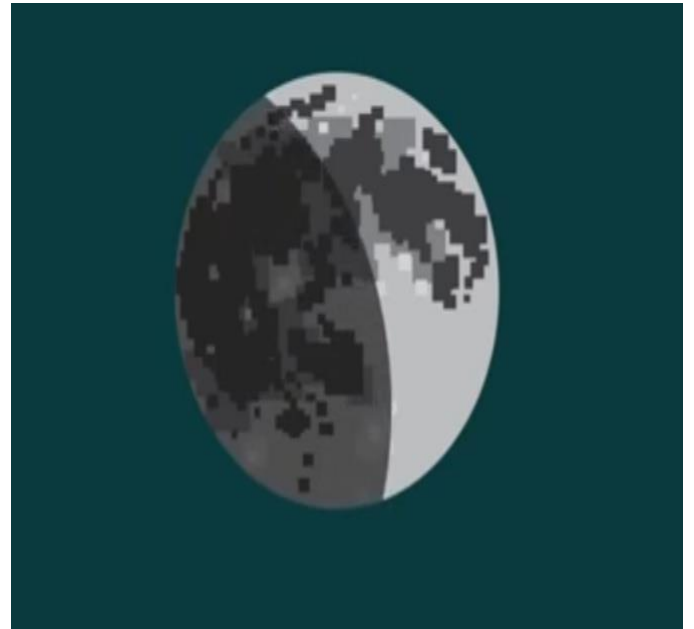
10.

গোল পৃথিবী থেকে সবকিছু ছিটকে পড়ে না কেন?

সমতল পৃথিবী বিশ্বাসীদের কমন প্রশ্ন পৃথিবী গোলই যদি হয় তবে গোলাকার বস্তু থেকে সবকিছু ছিটকে পড়ে যাচ্ছে না কেন?

যদি পৃথিবী গোলই হয়ে থাকে, আর আমরা সবাই তার ওপর দাঁড়িয়ে আছি, আমরা কেন পিছলে পড়ে যাই না গোলকটার ওপর থেকে? আর সমুদ্রের পানিই বা কেন আটকে আছে যেটার কিনা উপচে পড়ার কথা? বাতাসই বা কীভাবে আটকে আছে পৃথিবীর সাথে?

এটা নিয়ে চিন্তা করা যাক। সব বস্তুই নিচের দিকে পড়ে। আমরা পাহাড়ের চূড়া থেকে বা যেকোনো জায়গা থেকেই কিছু ফেললে তা নিচের দিকে পড়ে। কিন্তু অপেক্ষা করুন। 'নিচে' বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন? যদি পৃথিবী গোলক হয়ে থাকে, আর কোনো বস্তু নিচের দিকে পড়ে, তার অর্থ সে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে পড়ছে। (গোলকের পৃষ্ঠের ওপর যেকোনো বিন্দুতে লম্ব আঁকলে তা কেন্দ্র দিয়েই যায়)

এটি আমাদের সকলের জন্য সত্য। আমরা যে যেখানেই দাঁড়িয়ে থাকি না কেন, গোলকের এক প্রান্তে থাকি বা বিপরীত প্রান্তে, অথবা এর মাঝামাঝি কোনো অবস্থানে; আমরা প্রত্যেকেই পৃথিবীর কেন্দ্র দ্বারা আকৃষ্ট হচ্ছি। আমরা যেখানেই দাঁড়িয়ে থাকি না কেন, আমাদের পায়ের অবস্থান সবসময়ই পৃথিবীর কেন্দ্র বরাবর থাকছে। তাই আমাদের পা আমাদের কাছে নিচে আর মাথা ওপরে মনে হয়।

সমুদ্র আর বায়ু কীভাবে গোলাকার পৃথিবীতে আছে, কেন উপচে পড়ে না বা পিছলে যায় না- তা এখন ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কোনো বস্তু যেখানেই থাকুক না কেন, সেটা 'নিচে', অর্থাৎ কেন্দ্রের দিকে টান অনুভব করে।
এছাড়া বিজ্ঞানের কাছে এর স্পষ্ট গাণিতিক প্রমাণও আছে যে কেন আমরা পৃথিবী থেকে ছিটকে মহাকাশে পড়ে যাই না।

11.

কৃত্রিম স্যাটেলাইট তাহলে কী?

তাদের মতে কৃত্রিম স্যাটেলাইট বলতে আমরা যা মনে করে থাকি তা সবই ভুয়া। কারণ নাসা বা কোনো স্পেইস এজেন্সি এখন পর্যন্ত এসব স্যাটেলাইটের কোনো সত্যিকারের ইমেইজ আমাদের দেখায়নি। স্যাটেলাইটের কাজ বেলুন দিয়ে হচ্ছে এবং নাম হচ্ছে স্যাটেলাইটের। নাসা অন্য সবার চেয়ে সবচেয়ে বেশি হিলিয়াম ব্যবহার করে থাকে যা বেলুন উড়াতে প্রয়োজন।

এখন কথা হলো পৃথিবী সমতল হলে স্যাটেলাইট তখন ফ্লাট আর্থকে কীভাবে প্রদক্ষিণ করত? তারা তো স্যাটেলাইটকেও ভুয়া বলে।
স্যাটেলাইট নাই, Navigation, GPS কিচ্ছু নাই। তাহলে, ফেইসবুক চালাচ্ছে তারা কীভাবে, ইউটিউব দেখে কীভাবে?

12.

অভিকর্ষ/মহাকর্ষ ভুয়া:

সমতল পৃথিবী বিশ্বাসীদের মতে পৃথিবীর অভিকর্ষ/মহাকর্ষ বলতে কিচ্ছু নেই। বরং তার বদলে 'ডার্ক এনার্জি' নামের একটা বল ৩২ ফিট(৯.৮মিটার/সেকেণ্ড) বেগে ওপর দিকে ঠেলে পৃথিবীর এই চাকতিকে। এর ওপরে দাঁড়িয়ে মনে হয়, নিচের দিক থেকে কেউ টানছে যাকে আমরা অভিকর্ষ বল বলে মনে করে থাকি। আসলে অভিকর্ষ একটা ভুয়া শব্দ।

আগে জানতাম যে, Flat Earth বিশ্বাসীরা গ্র্যাভিটিতে বিশ্বাস করেন না। এর বিকল্পরূপে ব্ল্যাক ম্যাজিক বলকে বিশ্বাস করে,যা সমতল পৃথিবী চাকতিকে 32 feet/sec (9.8 মিটার/সেকেণ্ড) বেগে ওপরের দিকে ধাক্কা দেয়। ফলে মনে হয়, পৃথিবী আমাদেরকে আকর্ষণ করছে।
তবে, পৃথিবীর g এর মান তো সর্বত্র একরকম নয়। 9.7639 m/s থেকে 9.8337 m/s এর মধ্যে ওঠা-নামা করে। ফলে ৭ গ্রামের মতো ওজন হেরফের ঘটতে দেখা যায়।
এ মানটা মেরুর কাছে বা মেরুতে তুলনামূলক বেশি এবং বিষুবরেখার কাছে কম।

তাদের ব্ল্যাক এনার্জির ব্যাখ্যায় এ মানটা কিন্তু ধ্রুব মানে জাস্ট 9.8 মিটার/সেকেন্ড।
তারমানে তাদের যুক্তিতে অভিকর্ষও ভুয়া

এখন প্রশ্ন হলো আমরা পৃথিবীর একেক জায়গায় যে একেকরকম ওজন পাই সেটার ব্যাখ্যা কি তাদের কাছে আছে?
পৃথিবীর একেক অংশ কি তাহলে একেক গতিতে ওপরের দিকে লাফ দিচ্ছে বা লাফিয়ে ওঠে? হাহাহা।

13.

পৃথিবী সমতল হলে বুর্জ খলিফা, এভারেস্টকে টেলিস্কোপ দিয়েও দেখা যায় না কেন?-

তাদের মতে ফ্ল্যাট আর্থে আমরা সবাই একই সমতলে অবস্থান করছি। তাহলে তো বুর্জ খলিফা টাওয়ার বা পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ এভারেস্টও আমাদের সাথে সমতলে অবস্থান করছে।
কই আমরা তো দুরবিন ব্যবহার করে বুর্জ খলিফা,এভারেস্ট কখনো দেখতে পারলাম না। নাকি টেলিস্কোপ ব্যবহার করতে হবে?
পৃথিবী সমতল হলে তো দুরবিন (প্রয়োজন হলে টেলিস্কোপ) ব্যবহার করে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে বুর্জ খলিফা,এভারেস্টকে দেখা যাবে, তাই না? তাহলে দেখা যাচ্ছে না কেন?
নাকি এভারেস্ট কিংবা বুর্জ খলিফাও মিথ্যা, ভুয়া বা নাসার ষড়যন্ত্র?

14.সমতল পৃথিবীতে অভিকর্ষ (মহাকর্ষ):

মহাকর্ষ থাকলে পৃথিবী গোলাকারই হতো, সমতল হতো না। তবুও ধরে নিলাম সমতল পৃথিবীতে মহাকর্ষ রয়েছে।
এবার কল্পনা করা যাক, পৃথিবীটা একটা চাকতির মতো চ্যাপ্টা ও সমতল। পৃথিবী চাকতির মতো হলে এর কেন্দ্রের বদলে পৃথিবীর অভিকর্ষজ বল (মহাকর্ষ বল) সবকিছুকে চাকতির মধ্যবিন্দু (চাকতির কেন্দ্রে) বরাবর আকর্ষণ করত। পৃথিবীর অভিকর্ষজ বল সবসময় এর কেন্দ্রের দিকে সব বস্তুকে টানতে থাকে।

পৃথিবীর আকৃতি চাকতির মতো হলে সবগুলো সমুদ্র অবস্থান করত পৃথিবীর একদম মাঝ বরাবর, গঠন করত অত্যন্ত বিশাল এক সমুদ্রের।

যেহেতু পৃথিবী নামক চাকতিটি সবকিছুকে তার কেন্দ্র বরাবর আকর্ষণ করবে, তাই পৃথিবীর সব সাগর,মহাসারের অবস্থান হবে পৃথিবীর কেন্দ্রে। অন্য কোথাও কোনো জলাধারের অস্তিত্ব থাকবে না। অর্থাৎ পুরো পৃথিবীর শুধুমাত্র যে দুটো জায়গায় স্বাভাবিক মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বিরাজ করবে তার একটি (কেন্দ্র) হবে মহাসাগর, আর অন্যটি (চাকতির প্রান্তের ধারের ওপর) হবে পানিবিহীন সম্পূর্ণ মরুময়।

পৃথিবীর এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ভ্রমণ করাও খুব কষ্টকর হয়ে যেত। কারণ চাকতির কেন্দ্রের কাছাকাছি অনেক বেশি অভিকর্ষ টান অনুভব হবে, সামান্য নড়াচড়াও হয়ে যাবে কষ্টকর। আবার কেন্দ্র থেকে যতো দূরে যাওয়া যাবে, অভিকর্ষ টান তত কমতে থাকবে। এভাবে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন অভিকর্ষ টান অনুভব করতে পারত।
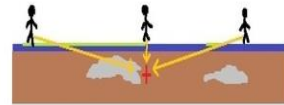
15.

সমতল পৃথিবীর স্বরূপ:
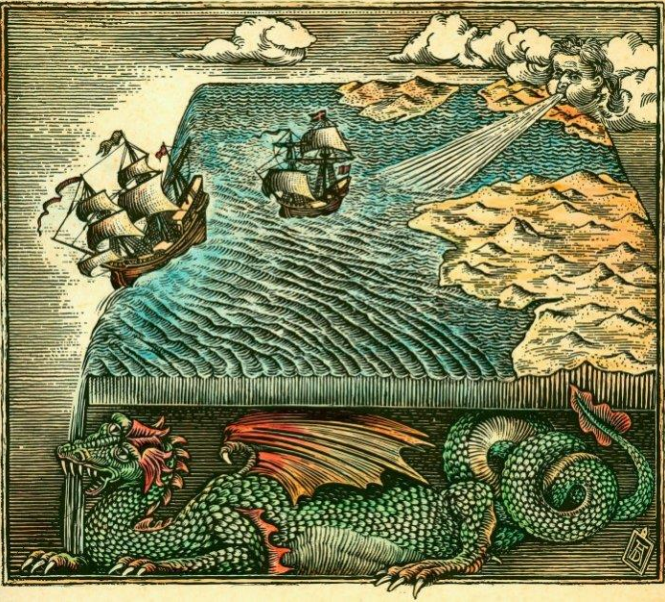
পৃথিবী বা অন্য কোনো গ্রহের পক্ষেই আসলে সমতল হওয়া সম্ভব না। মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবেই গ্রহ-নক্ষত্রগুলো প্রায় বৃত্তাকার হতে বাধ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির গ্রহবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডেভ স্টিভেনসনের মতে, এই মুহূর্তে যদি পৃথিবীকে জোর করে প্যানকেকের মতো সমতল করে দেওয়া হয়, তাহলে যা ঘটবে তা হচ্ছে, মহাকর্ষীয় বলের প্রভাবে এটি আবার গোলকে রূপান্তরিত হওয়ার চেষ্টা করবে। সমতল বানিয়ে ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথেই পৃথিবী এত প্রবলভাবে গোলক রূপে ফিরে যেতে চাইবে যে, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এমন কোনো পদার্থ নেই, যা দিয়ে পৃথিবীর পুনরায় গোলকে রূপান্তরিত হওয়ার প্রচেষ্টা ঠেকিয়ে রাখা যাবে। তার মতে, মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই পৃথিবী গোলকে রূপান্তরিত হতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।

লন্ডনের রয়্যাল অবজারভেটরির জ্যোতির্বিজ্ঞানী ম্যারেক কুকুলাও স্টিভেনসনের মতো একই ধারণা পোষণ করেন। তার মতে পৃথিবীকে যদি সমতল অবস্থায় রাখতে হয়, তাহলে এমন একটি সুইচের প্রয়োজন হবে যার মাধ্যমে মহাকর্ষকে গায়েব করে দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল বলে কিছু থাকবে না; বায়ুমণ্ডল সহ পৃথিবীর সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত নয় এমন সবকিছুই ভাসতে ভাসতে মহাশূন্যে উড়ে যাবে। তাছাড়া বায়ুমণ্ডল না থাকায় অক্সিজেনের অভাবে সেখানে কোনো প্রাণীর পক্ষে বেঁচে থাকাও সম্ভব হবে না।

কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, কোনো অলৌকিক ক্ষমতা বলে পৃথিবীকে সমতল করে ফেলা হলো এবং এর আকর্ষণ শক্তিও বজায় রাখা হলো, সেক্ষেত্রে কী ঘটতে পারে?

সমতল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কেন্দ্র হবে চাকতিটির পৃষ্ঠের কেন্দ্রবিন্দুতে। ফলে আপনি যদি চাকতির মতো আকৃতি বিশিষ্ট পৃথিবী পৃষ্ঠের কেন্দ্রে বা এর আশেপাশে অবস্থান করেন, তাহলে অনেকটা এখনকার মতোই আকর্ষণ অনুভব করবেন। কিন্তু কেন্দ্র থেকে যত দূরে যেতে থাকবেন, পৃথিবী সমতল হওয়ার কারণে মাধ্যাকর্ষণ বল আপনাকে তত তীর্যকভাবে আকর্ষণ করতে থাকবে। ফলে আপনার হাঁটতে কষ্ট হবে এবং মনে হবে আপনি বুঝি ঢালু পথ বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছেন,গাছপালার বৃদ্ধি অস্বাভাবিক হতো, খেলাধুলায় সমস্যা হতো ইত্যাদি।

16.

দিবা-রাত্রের দৈর্ঘ্য ও ঋতু:

পৃথিবী গোলক হওয়ায় নিজ অক্ষের ওপর আবর্তনের ফলে দিন-রাত সংঘটিত হয়। কিন্তু পৃথিবী যদি সমতল হয়, তাহলে দিন বা রাত বলে পৃথক কিছু থাকবে না। সবসময় সমগ্র পৃথিবী একই রকমের আলো পাবে। অবশ্য আমরা যদি কল্পনা করে নিই যে, পৃথিবী না, বরং সূর্যই পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে, সেক্ষেত্রে অবশ্য ভিন্ন কথা। সেক্ষেত্রে দিন এবং রাত সংঘটিত হবে ঠিকই, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীতে একই সাথে দিন হবে, আবার একই সাথে রাত হবে।

বাংলাদেশে যখন দুপুর ১২টা, অর্থাৎ সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপরে, বিশ্বের কিছু কিছু এলাকায়, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তখন রাত ১২টা। সূর্যের কোনো অস্তিত্বই সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। পৃথিবী যদি সমতল হতো, তাহলে সময়ের খুবই সামান্য ব্যবধান হতো। এক দেশে রাত, অন্য দেশে দিন হতো না। পৃথিবী প্রায় বৃত্তাকার বলেই কোনো স্থানে সূর্য যখন মাথার ওপরে থাকে, বিপরীত পৃষ্ঠ তখন সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পর্যায়ক্রমে দিন এবং রাতের

আগমন ঘটে। এছাড়াও পৃথিবী গোলাকার বলেই বিষুবীয় অঞ্চলের সাথে উত্তর বা দক্ষিণ গোলার্ধে দিন এবং রাতের দৈর্ঘ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

যেমন- যদি পৃথিবী সমতলই হতো তবে নিউইয়র্ক এবং লস অ্যাঞ্জেলস-এ একই সময় সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখা যেত। কিন্তু এ দুটি স্থানে এ দুটি আলাদা আলাদা ঘটনা সংঘটিত হওয়ার মাঝে সময়ের পার্থক্য প্রায় ৩ ঘণ্টা।

সমতল পৃথিবী বিশ্বাসীদের মতে, সূর্য বৃত্তাকারভাবে পৃথিবীর কেন্দ্রে যে উত্তর মেরু রয়েছে তার চারপাশে বৃত্তাকারভাবে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরার সময় যখন এটা আপনার মাথার ওপর আসে তখন দিন এবং যখন আসে না তখন রাত।
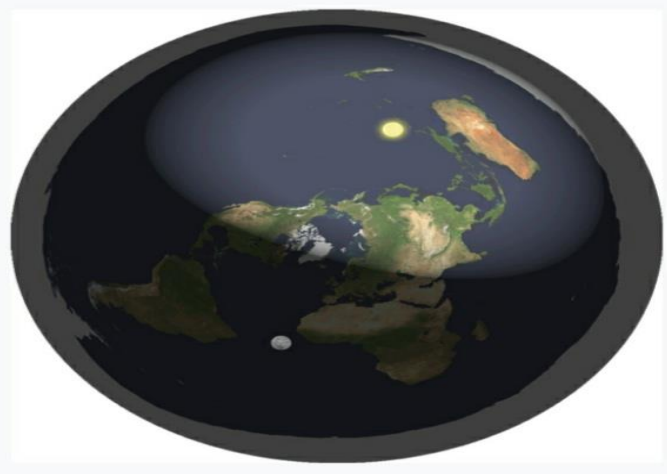
পৃথিবীর অক্ষের ২৩.৪৪ ডিগ্রি কোণে হেলে থাকা ও সৌররশ্মির পতনের ভিন্নতার কারণে দিন রাত্রের দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি, বিভিন্ন ঋতু, ভৌগোলিক বৈচিত্র্যতা সৃষ্টি হয় যা পৃথিবী গোলাকার বলেই সম্ভব। কিন্তু সমতল পৃথিবী সমর্থনকারীরা এসব ঘটনার কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম নয়। সক্ষম হবে কী করে? তাদের পৃথিবীটা যে সমতল যা কিনা এসব ঘটনা সৃষ্টির পেছনের ব্যাখ্যা প্রদানে সমর্থ নয়।
পৃথিবী গোলাকার ও হেলানো বলেই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় সৌররশ্মি বিভিন্ন কোণে পতিত হয় এবং ওসব ঘটনার সৃষ্টি করে। কিন্তু সমতল পৃথিবীতে সৌররশ্মি এভাবে পতিত হতো না বরং তার বদলে একই কোণে সর্বত্র পতিত হতো ফলে পৃথিবীর সর্বত্র একই ঋতু থাকত, দিবা-রাত্রের হ্রাস-বৃদ্ধিও ঘটত না, বিভিন্ন জলবায়ুর ভৌগোলিক অঞ্চলও সৃষ্টি হতো না।
সমগ্র পৃথিবীর তাপমাত্রা মোটামুটি একই রকম থাকত। উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু নামে কিছু না থাকায় কোথাও কোনো বরফও থাকত না।

17.
দৃষ্টিসীমা:
পৃথিবী গোল হওয়ার কারণে আমরা মাটিতে থাকা অবস্থায় যতদূর পর্যন্ত দেখতে পারি, উঁচু স্থানে উঠলে তার চেয়ে আরো অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পারি। কিন্তু পৃথিবী সমতল হলে পাহাড়ের চূড়ায় উঠলে খুব বেশি লাভ হবে না। পৃথিবী গোল বলেই সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়ালে দূর থেকে কোনো জাহাজ যখন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন আমরা প্রথমে তার মাস্তুলের চূড়াটি দেখি, এরপর পুরো জাহাজটির বিভিন্ন অংশ ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকে। কিন্তু সমতল পৃথিবীর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জাহাজ একসাথে আমাদের চোখের সামনে ছোটো থেকে ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকবে। এখন যেরকম বিমানে চড়লে আমরা পৃথিবীর বক্রতা বুঝতে পারি, তখন সেরকম ঘটবে না। বিমান থেকেও দিগন্তকে সমতল বলে মনে হবে।

পৃথিবীর আকৃতিঃ-
যদিও পৃথিবী ‘উপবৃত্ত’ (Ellipsoid/Spheroid) দিয়েই সবচেয়ে ভালোভাবে উপস্থাপিত হয়, তবুও প্রায় সময়ই পৃথিবীকে একটি গোলক (Sphere) হিসাবে বিবেচনা করা হয় শুধুমাত্র গাণিতিক হিসাব সহজে করার জন্য।
পৃথিবীর মধ্যবর্তী অংশ হলো স্ফীত ও দুই মেরুর দিকে কিছুটা চ্যাপ্টা।
এই আকৃতিকে আমরা জিওড (geoid) বলতে পারি।
পৃথিবীর বিখ্যাত নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাসের (Christopher Columbus) পৃথিবী ভ্রমণের কথা জেনে

মানুষের মধ্যে পৃথিবীর আকৃতি নিয়ে পুনরায় আগ্রহ জন্মেছিল।

1519 সালে আরেকজন বিখ্যাত নাবিক ম্যাগলন ফারদিনান্দ (Magellan Ferdinand) পুনরায় পৃথিবী ভ্রমণে যাত্রা করেন। যদিও তিনি সফল হননি তবুও তার এই প্রশ্ন বহু মানুষের মধ্যে আলোড়ন তৈরি করে এবং সেই সময় বিখ্যাত জ্যামিতিবিদ পিথাগোরাস পৃথিবীর গোলকত্বের প্রমাণ দেন।
এছাড়া বর্তমান যুগে কৃত্রিম উপগ্রহ বা বিমান থেকে তোলা বিভিন্ন চিত্রের মাধ্যমে খুব সহজেই আমরা পৃথিবীর গোলকত্বের প্রমাণ করতে পারি।

18.

পরিবর্তনশীল ছায়া:

মাটির ওপর একটি খুঁটি পুঁতে রাখলে তার ছায়া পড়বে। যেহেতু সূর্যের অবস্থান পৃথিবী থেকে অনেক দূরে এবং সূর্য থেকে আগত আলোক রশ্মিগুলো প্রায় সমান্তরাল, তাই পৃথিবী সমতল হলে পাশাপাশি দুটো এলাকায় একই সময়ে একই দৈর্ঘ্যের খুঁটির ছায়ার দৈর্ঘ্য একই হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না।
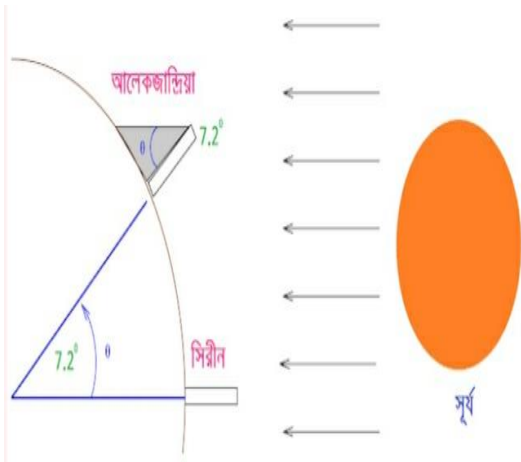
আজ থেকে প্রায় ২,৩০০ বছর পূর্বে মিসরের আলেক্সান্দ্রিয়া লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান ইরাটোস্থিনিস সর্বপ্রথম বিষয়টি লক্ষ করেন। তিনি একটি নির্দিষ্ট দিনে ঠিক দুপুর বেলা আলেক্সান্দ্রিয়া এবং কয়েকশ কিলোমিটার দূরবর্তী শহর সিয়েনে একই দৈর্ঘ্যের দুইটি খুঁটির ছায়া পরিমাপ করেন। সিয়েনে সূর্য ঠিক মাথার ওপরে থাকার কারণে কোনো ছায়া পড়েনি, কিন্তু আলেক্সান্দ্রিয়ায় সামান্য একটু ছাড়া পড়ে। এ থেকে তিনি নিশ্চিত হন যে পৃথিবী বৃত্তাকার।

ইরাটোস্থিনিস ছায়ার দৈর্ঘ্য থেকে সূর্যরশ্মির কোণ পরিমাপ করেন। শহর দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং তাদের ছায়ার কৌণিক পার্থক্য থেকে তিনি প্রায় নিখুঁতভাবে পৃথিবীর পরিধিও নির্ণয় করতে সক্ষম হন। ইরাটোস্থিনিস পৃথিবীকে সম্পূর্ণ বৃত্তাকার মনে করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে পৃথিবী উত্তর-দক্ষিণ দিক একটু চাপা হওয়ায় তার হিসেবে খুব সামান্য পরিমাণ ভুল ছিল।

19.

উঁচু স্থান থেকে দূরের দৃশ্য:
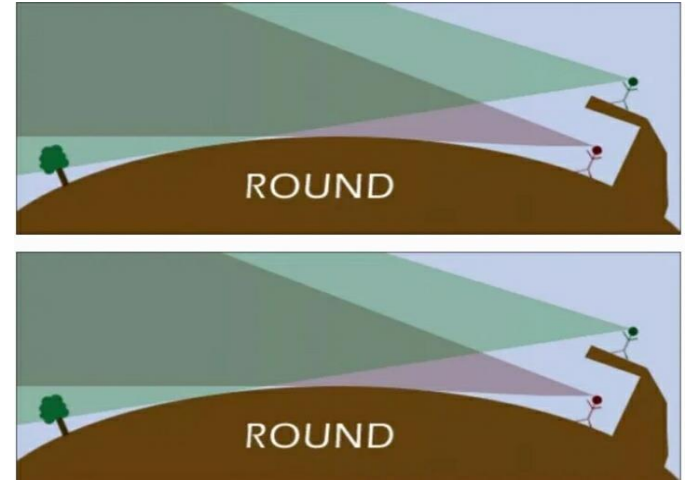
কোনো গাছ বা উঁচু ভবনের নিচে দাঁড়িয়ে খালি চোখে অথবা দুরবিনের সাহায্যে সর্বোচ্চ যতদূর পর্যন্ত দেখা যায়, সেই গাছের ওপরে অথবা ভবনের ছাদে উঠে তাকালে তার চেয়েও দূর পর্যন্ত দেখা যায়। পৃথিবী সমতল হলে এটি সম্ভব হতো না। সমুদ্রের তীরে সূর্যাস্তের সময় খুব সহজেই এই পরীক্ষাটি করা সম্ভব। সূর্যাস্তের সময় মাটিতে শুয়ে থাকলে ঠিক যে মুহূর্তে সূর্য ডুবে গেছে বলে মনে হবে, তখন উঠে দাঁড়ালেই দেখা যাবে সূর্য পুরোপুরি ডোবেনি, তার কিছু অংশ তখনও দৃশ্যমান। একই স্থানে যদি আরও উঁচুতে ওঠা যায়, তাহলে সম্পূর্ণ সূর্যাস্তটিই

পুনরায় উপভোগ করা সম্ভব হয়। পৃথিবীপৃষ্ঠ গোলাকার বলেই এটি সম্ভব।

20.

পৃথিবীর প্রান্তে গিয়ে কেউ পড়ে যাচ্ছে না কেন?

প্রাচীন ধারণার অনুসারীরা এর উত্তরে বলেছেন, পৃথিবী নামক চাকতির পরিধিজুড়েই নাকি অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ! এই বিশাল বরফের অঞ্চলই আমাদের নাকি গড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা করছে। বিমানগুলো বা কোনো মানুষ পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে কেন পড়ে যায় না?

তার কীরকম অযৌক্তিক ব্যাখ্যা তারা দেয় সেটা হলো -"Pac-Man Effect"

প্যাক-ম্যান গেইমে প্যাক-ম্যান যখন স্ক্রিনের এক প্রান্ত পৌঁছে গিয়ে আবার স্ক্রিনের আরেক প্রান্ত দিয়ে আবির্ভূত হয় তেমনই বিষয়টা।

বিমান, মানুষ যখন পৃথিবীর প্রান্তে পৌঁছায় তখন প্যাক-ম্যানের মতো টেলিপোর্ট হয়ে পৃথিবীর অন্য সাইডে চলে যায় ফলে বিমান বা আমরা পৃথিবীর প্রান্ত থেকে পড়ে যাচ্ছি না। আর প্রান্তের দেওয়াল হিসেবে বরফ তো আছেই।

আচ্ছা,দেওয়াল হিসেবে বরফ তো আছেই বুঝলাম কিন্তু সে বরফ কি সূর্যের তাপে গলে যায় না? সাগরের এত এত উঁচু ঢেউ কি সে দেওয়ালকে ভেঙে ফেলে না?

সে দেওয়ালটা কি তারা বানিয়ে রেখেছে?

ওরকম দেওয়াল হওয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কী?

দেওয়াল না হয়ে অন্য কিছু ওখানে হলো না কেন?

21.

সমতল পৃথিবীর নিচে কী আছে?

এ বিষয়টা ফ্ল্যাট আর্থারদের কাছে অজানা তবে বেশিরভাগ ফ্ল্যাট আর্থাররা বিশ্বাস করে পৃথিবীর নিচের অংশ শিলা দ্বারা তৈরি।

তা না হয় আংশিক ঠিক কিন্তু আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দিয়ে যে আগুন বের হয় সেসব কোথা থেকে আসে তাহলে?

পৃথিবী সমতল হলে কী কী সমস্যা হতো তার লিস্ট করলে এবং তাদের সকল কুযুক্তিগুলো খণ্ডন করলে একটা বিশাল বই হয়ে যাবে।

সংক্ষেপে এগুলো আপাতত জানালাম, বাকিগুলো গুগল করলেই জেনে যাবেন।

এছাড়া সমতল পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের কিছু অংশে আরো অনেক উদ্ভট দাবি করতে মাঝেমাঝে শোনা যায়। এই যেমন - অস্ট্রেলিয়া বলতে কোনো দেশ নেই। প্রকৃতপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার কোনো অস্তিত্বই নেই! অস্ট্রেলিয়ার অস্তিত্ব নিয়ে প্রমাণ হিসেবে যা দেখছেন, তার সবই সুন্দর করে সাজানো একটা মিথ্যা। ফ্ল্যাট আর্থ সোসাইটির মতে, অস্ট্রেলিয়ায় যারা আছে, তারা হয় ভাড়া করা অভিনেতা, না হয় কম্পিউটারে তৈরি মানুষ!

এদের কথাবার্তা যে পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছুই না তা এরপর আশা করি বুঝতে বাকি থাকার কথা না। দুনিয়ার মানুষ যখন অন্য গ্রহে বাস করতে প্ল্যান প্রোগ্রাম সাজাচ্ছে সেখানে এরা এখনও সে পুরোনো বস্তাপচা বিশ্বাসের ওপরেই ভর করে আছে; থাকুক সমস্যা নেই।

পরিশেষে বলছি, দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি একটু বিনোদন লাভেরও দরকার আছে, তা না হলে দুনিয়া পানসে হয়ে যাবে। তাই আমাদের বিনোদিত করতে এসব ফ্ল্যাট আর্থারদের অস্তিত্ব থাকাটা একেবারে মন্দ নয়।

শেষে একটি কবিতার লাইন মনে পড়ল-

"চক্ষু থাকিতে অন্ধ যাহারা আলোকের দুনিয়ায়,
সিন্ধু সেঁচিয়া বিষ পায় তাহারা, অমৃত নাহি পায়"।

তথ্যসূত্র

ব্যাক টু দ্যা আর্থ

দ্যা সিক্রেট সোলজার

মহাকাশযানের স্বচ্ছ জানালা দিয়ে নীল পৃথিবীটার দিকে তাকিয়ে ছিল ক্যাপ্টেন রিহান। দরজা খোলার শব্দ পেয়ে ঘুরে তাকাল সে। নীহা নামের অল্প বয়স্ক মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি সবসময় রিহানের ওপর অধিকার দেখানোর চেষ্টা করে। রুমে নক করে ঢুকবে না, সবসময় মুখে মুখে তর্ক করবে। অথচ রিহানের বদমেজাজের কারণে কেউ ওর সাথে কথা বলার সাহস পায় না। রিহান গলার স্বরকে যতটা সম্ভব গম্ভীর করে বলল, "তুমি কি জানো না কারো রুমে ঢুকতে অন্তত দরজা নক করে ঢুকতে হয়?"

নিহা অনেকটা অপ্রস্তুতের মতো উত্তর দিল, "হলরুমে সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে ক্যাপ্টেন।"

রিহান আরেকটু এগিয়ে গিয়ে বলল, "আমি যে প্রশ্ন করেছি তার উত্তর দাও নিহা।"

-জি, আমি জানি, কারও রুমে ঢুকতে গেলে দরজা নক করে ঢুকতে হয়।

- মহাকাশযানের ক্যাপ্টেনের রুমে অনুমতি ছাড়া ঢোকা কত মাত্রার অপরাধ?

- দ্বিতীয় মাত্রার অপরাধ।

- তাহলে তুমি জেনেশুনে এই অপরাধ বারবার করো কেন?
- তোমার রুমে অনুমতি নিয়ে ঢুকতে আমার ভালো লাগে না। তুমি জানতে চাও কেন?

রিহান ভালো করেই জানে কেন মেয়েটি এরকম করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন জ্যোতির্বিজ্ঞান পড়ানোর সময়ই মেয়েটি তার ভালোবাসার কথা রিহানকে বলেছিল। এমনকি এই দীর্ঘ অভিযানে সে নাম লিখিয়েছে শুধু রিহানের কারণেই। কিন্তু রিহান ভালো করেই জানে এই মেয়েটিকে তো নয়ই, কোনো মেয়েকেই ভালোবাসা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বরং তাদের জন্য রিহানের মনে আছে অসীম পরিমাণ ঘৃণা। অনাথ আশ্রমে বড়ো হওয়া রিহান কোনোদিন মায়ের ভালোবাসা পায়নি। যৌবনে যে মেয়েটিকে সে জীবনের থেকেও বেশি ভালোবেসেছিল সেও একদিন নির্বিকারচিত্তে অন্য পুরুষের ঘর করতে চলে যায়। তার কাছে নারী মানেই ছলনাময়ী, নারী মানেই স্বার্থপর। নিহাকে পাশ কাটিয়ে হলরুমের দিকে চলে গেল সে। সবাই শীতল ঘরে ঘুমিয়ে পড়ার আগে অধিনায়ক হিসেবে কিছু কথা বলা মহাকাশযানের অতি জরুরী কর্তব্যের একটি।

২.

হালকা পানীয়টিতে এক চুমুক দিয়ে কথা শুরু করল রিহান, "তোমরা সবাই জানো, আমাদের এই অভিযান দীর্ঘ দশ বছরের। আন্তঃগ্যালাক্টিক অভিযানের এই দীর্ঘ সময় আমরা মহাকাশযানে জেগে থেকে নিজেদের শক্তি নষ্ট করব না। আমাদের সবার জন্য একটি করে ক্রায়োজেনিক ক্যাপসুল আছে। আমরা ক্যাপসুলে ঘুমিয়ে থাকব প্রায় পাঁচ বছর। তবে সবসময় দুইজন করে জেগে থাকবে জরুরী কর্তব্য পালন যেমন এই যানের কক্ষপথ, গতি ইত্যাদির ত্রুটি বিচ্যুতি ঠিক করা কিংবা প্রয়োজনীয় মেইন্টেন্যান্স সাপোর্ট দেওয়ার জন্য।"

রিহানের কথা শেষ না হতেই নিহা হাত ওপরে তুলে বলল, "আমি কি পুরো সময়টা জেগে থাকতে পারি ক্যাপ্টেন?"

রিহান প্রায় চিৎকার করে বলল, "আমি কি তোমাকে কথা বলার অনুমতি দিয়েছি নিহা? তুমি কি জানো জাহাজের যেমন লাইফবোট থাকে, তেমনি এই মহাকাশযানেরও লাইফ বোট আছে?"

- জানি ক্যাপ্টেন। ওটা একধরণের স্কাউটশিপ।
- স্কাউটশিপে কয়টি বাটন আছে তুমি জানো?
- একটি মাত্র বাটন আছে ক্যাপ্টেন। সেটাতে লেখা আছে ব্যাক টু দা আর্থ।
- ওটাতে প্রেস করলে কী হবে?
- স্কাউটশিপটি যেখানেই থাকুক না কেন সেটা পৃথিবীর দিকে রওনা দেবে। ওটাকে অন্য কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না।
- তুমি যদি আর একবার কথা বলো তাহলে তোমাকে ওই স্কাউটশিপে করে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেব এখনি।

রিহান নিজেকে একটু সংযত করে বাকি কথাটা সংক্ষেপে বলল। তারপর সিদ্ধান্ত নিল লটারির মাধ্যমে ঠিক হবে কোন সময় কারা জেগে থাকবে। সবার নাম আলাদা আলাদা কাগজে লিখে একটা বাক্সে রাখা হলো। মহাকাশযানের সর্বকনিষ্ঠ অভিযাত্রী রিটিয়ার ওপর দায়িত্ব পড়ল লটারির কাগজ ওঠানোর। প্রথম দুইমাসের জন্য নাম উঠলো নিহা ও মহাকাশযানের সেকেন্ড ইন কমান্ড জিসানের। নিহা এর জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। সে কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। কিন্তু ক্যাপ্টেন রিহানের চোখের দিকে তাকিয়ে খুব একটা সুবিধা করতে পারল না। এরপর এক এক করে সবার স্লট ঠিক করে ক্রায়োজেনিক ক্যাপসুলে ঘুমিয়ে গেল সবাই। জেগে রইল শুধু নিহা আর জিসান।

৩.

মহাকাশযানটি যখন মঙ্গল গ্রহকে অতিক্রম করে সৌরজগতের গ্রহাণু বেষ্টনিতে প্রবেশ করল তখনই ঘটল বিপত্তি। আচমকা এক উল্কাপিণ্ড এসে আঘাত করল মহাকাশযানটিকে। পেছনের অংশ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, ছিটকে গেল অনেকগুলো ক্রায়োজেনিক ক্যাপসুল মহাশূন্যে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ও এর আশেপাশের কয়েকটি অংশ তখনো টিকে রইল অনেকগুলি ফাটলসহ। মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা ও চাপ ক্রমেই কমতে শুরু করেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মূল দরজাটিও ভেঙে পড়ল।

৪.

রিহানের মনে হতে লাগল ভয়ানক ভূমিকম্প হচ্ছে আর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে জেগে ওঠার জন্য কিন্তু কিছুতেই পারছে না। তারপর ধীরে ধীরে সে চোখ মেলে তাকাল কিন্তু ভূমিকম্প যেন থামছেই না। তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, চারিদিকে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল। কে যেন 'ক্যাপ্টেন রিহান' বলে ডাকছিল। সে নিজের হাতটা ওঠাতে পারছিল না, মনে হচ্ছিল ভারী কাদার মধ্যে তার হাত আটকে গেছে। সবকিছু অসহ্য লাগছিল তার। দুটো কোমল হাত তাকে ধরে উঠিয়ে বসাল। রিহানের চোখ দুটো যেন ক্রমেই ভারী হয়ে আসছিল। অনেকটা জোর করেই সে দেখতে চেষ্টা করল কী কী ঘটেছে। ছিপছিপে গড়নের একটি মেয়ে হাতে স্পেইসস্যুট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটিকে খুব চেনা চেনা লাগছে তার। তার সীমাহীন জড়তা দেখে মেয়েটি নিজেই স্পেইসস্যুট পরাতে শুরু করল আর কাঁদতে লাগল। মেয়েটিকে এবার চিনতে পেরেছে রিহান। কিন্তু নিহা তার সামনে কাঁদছে কেন?

রিহান বাধ্য ছেলের মতো স্পেইসস্যুটটি পরে নিল। হেলমেট পরার আগে সে নিহাকে জিজ্ঞেস করল, "নিহা, তুমি কাঁদছ কেন?"

নিহা কোনো উত্তর না দিয়ে নিজের স্পেইসস্যুটটি পরে নিল। তারপর রেডিয়ো টান্সমিটারে রিহানকে বলল, "আমাদের মহাকাশযান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ক্যাপ্টেন, আমাদের খুব তাড়াতাড়ি একটা স্কাউটশিপ নিতে হবে।"

এখনো রিহানের শরীরের রক্তসঞ্চালন স্বাভাবিক হয়নি। নিহার কাঁধে ভর করে সে অনেক কষ্টে স্কাউটশিপের কাছে পৌঁছুতে লাগল। সবকিছুই রিহানের কাছে স্বপ্নের মতো লাগছে। পুরো মহাকাশযানটা যেন একটা ধ্বংসপুরী। ক্যাপসুলগুলো সব মহাশূন্যে ভাসছে, জিসানের ক্ষত-বিক্ষত দেহটা পড়ে আছে নিয়ন্ত্রণকক্ষের বাইরে। শুধুমাত্র বেঁচে আছে সে আর নিহা নামের এই কমবয়সী মেয়েটি। মহাকাশযানের ক্যাপ্টেন হিসেবে এই মেয়েটিকে যেভাবেই হোক রক্ষা করবে সে। নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও। এমন সময় আরেকটি বিস্ফোরণ হলো। মূল দরজাটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মহাকাশযান থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে বের হয়ে গেল তারা দুজন। মহাশূন্যে ভাসতে লাগল স্কাউটশিপগুলি। অন্ধকার মহাশূন্যে চকচক করে উঠছিল অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী স্কাউটশিপগুলি, ভেসে বেড়াচ্ছিল দেয়ালের বিভিন্ন অংশ। নিহা শক্ত করে ধরে আছে রিহানের হাত, ছাড়লেই যে আলাদা হয়ে যাবে দুইজন। ক্রমেই তারা ভাসতে ভাসতে দূরে সরে যাচ্ছিল স্কাউটশিপ থেকে। এভাবে যেতে থাকলে আর কোনোদিন পৃথিবীতে ফেরা হবে না তাদের। রিহান বুঝতে পারছিল না কীভাবে স্কাউটশিপের কাছে যাবে। এই বিশাল মহাশূন্যে নিয়তির হাতে জীবনকে ছেড়ে দিয়ে অনিয়মিতভাবে ভেসে থাকা ছাড়া কীইবা করার আছে তাদের!

৫.

নিহা রিহানকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, "প্রথম যেদিন তুমি আমাদের ক্লাস নিতে এসেছিলে সেদিন আমি কী করেছিলাম জানো ক্যাপ্টেন?"

রিহান এবার চরম বিরক্তিসহ নিহার দিকে তাকাল, উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না। নিহাও উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে বলতে লাগল, "তুমি নিউটনের বলবিদ্যার সূত্রগুলো পড়াচ্ছিলে আর আমি তোমার দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে ছিলাম। ভাবছিলাম এই মানুষটির সাথে যদি সারাটা জীবন কাটাতে পারতাম!"

রিহান অনেকটা অনুরোধের সুরে বলল, "নিহা, তুমি কি দয়া করে একটু চুপ করবে?"

নিহা নির্বিকার হয়ে বলতে লাগল, "এইতো আর কিছুক্ষণ। আর একটু সহ্য কর। তুমি জানো না, তোমার শেখানো তৃতীয় সূত্রটা আমি প্রচণ্ড ভালোবাসি। কারণ আমি তোমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি ক্যাপ্টেন।"

এই বলেই রিহানের হাতটা ছেড়ে দিল নিহা। রিহান সাথে সাথে বলে উঠল, "এটা কী করছ নিহা?"

আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিল নিহা। রিহান ভেসে যাচ্ছে স্কাউটশিপের দিকে আর নিহা ঠিক তার বিপরীত দিকে, সমান গতিতে। রিহান হতবিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছে নিহার দিকে। ধীরে ধীরে দূরে চলে যাচ্ছে নিহা, আরও দূরে, আরও দূরে। মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার মহাশূন্যে। দূর থেকে নিহার অস্পষ্ট কণ্ঠ ভেসে আসছে রেডিয়ো ট্রান্সমিটারে, "ভালোবাসি তোমায় রিহান, বিদায়।"

স্কাউটশিপের হাতলটা ধরে ফেলল রিহান। ভিতরে ঢুকে আরেকবার দেখার চেষ্টা করল নিহাকে কিন্তু খুঁজে পেল না সে। হয়তো নিহা চলে গেছে অনেক দূরে কিংবা চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গেছে তার দৃষ্টি। রিহান প্রতিজ্ঞা করেছিল, কোনো নারীর জন্য আর কখনো চোখের জল ফেলবে না। কিন্তু এবারও পারল না সে। আরও একবার তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। ভালোবাসার অশ্রু। তারপর কাঁপাকাঁপা হাতে একমাত্র বাটনটি প্রেস করল "ব্যাক টু দ্যা আর্থ।"

পুরাজ্যোতির্বিদ্যা

ইফতেখার আহমেদ

পুরাজ্যোতির্বিদ্যা (ইংরেজি: Archaeoastronomy) বলতে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে যেভাবে প্রথাগত জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে চর্চা করা হয়েছে সেগুলোকে তাদের দৃষ্টিকোণ ও উপায়-উপকরণের সাপেক্ষে অধ্যয়ন করাকে বোঝায়। মূলত প্রত্নতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিক প্রমাণাদির মাধ্যমে এই গবেষণা করা হয়। সমকালীন বিভিন্ন সমাজে আকাশ

পর্যবেক্ষণ কীভাবে করা হয় তার অধ্যয়নকে অনেক সময় নৃজ্যোতির্বিদ্যা (ethnoastronomy) বলা হয়।

পুরাজ্যোতির্বিদ্যার সাথে ঐতিহাসিক জ্যোতির্বিজ্ঞানেরও নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া এর সাথে সম্পর্ক রয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসের। ঐতিহাসিক জ্যোতির্বিজ্ঞান হচ্ছে জ্যোতিষ্কসমূহের ঐতিহাসিক উপাত্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছার বিদ্যা, আর জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস হচ্ছে লিখিত দলিলসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে অতীতের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গবেষণাসমূহের মূল্যায়ন করার বিজ্ঞান।

প্রাচীনকালের মানুষদের জ্যোতির্বিদ্যা অনুশীলনের চিহ্ন আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, যেমন: প্রত্নতত্ত্ব, নৃবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, ইতিহাস ইত্যাদির কৌশল প্রয়োগ করা হয়। এত শত কৌশলের সার্থক সমন্বয় করতে গিয়ে অনেক বিতর্কের জন্ম হয় যা এখনও পুরাজ্যোতির্বিদদের জন্য একটি বড়ো সমস্যা।

ক্লাইভ রাগলসের মতে, পুরাজ্যোতির্বিদ্যাকে ঠিক প্রাচীন মানুষদের জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চা বিষয়ক গবেষণা বলা যাবে না; কারণ বর্তমানে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিজ্ঞানের একটি শাখা কিন্তু প্রাচীনকালে জ্যোতির্বিদ্যার সাথে জ্যোতিষশাস্ত্রের তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না এবং আকাশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তখন মূলত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হতো। আকাশ পর্যবেক্ষণ, তার সাথে জীবনের মিল খোঁজার চেষ্টা এবং বিভিন্ন সংকেতসমৃদ্ধ সংস্কৃতি- সবকিছুই পুরাজ্যোতির্বিদ্যা খতিয়ে দেখে। কোনো অঞ্চলে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের সাথে আকাশপটের কিছু বিন্যাসের মিল পাওয়া গেছে, অনেক সময় ভূমির নকশার মাধ্যমে প্রাচীন মানুষেরা প্রকৃতির চক্র সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ফুটিয়ে তুলত।

প্রস্তরযুগে জ্যোতির্বিদ্যার বিকাশ

মানব সভ্যতার সূচনালগ্নে বিজ্ঞানের যে কয়টি শাখা বিকশিত হতে শুরু করেছিল, তার মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যা অন্যতম। জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায় আজ থেকে প্রায় ২৫,০০০ বছর আগে, সেই প্রাচীন প্রস্তরযুগেও। প্রসিদ্ধ পুরাজ্যোতির্বিদ ক্লাইভ রাগল্স, আলেক্সান্ডার থমসহ আরও কিছু পুরাজ্যোতির্বিদের কল্যাণে আজ আমরা সেই আদি জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার নমুনা ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পেরেছি। নব্য প্রস্তরযুগে (প্রায় ২০,০০০ বছর পূর্বে) একটি বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব সংঘটিত হয়, যখন মানুষের মহাবিশ্ব সম্পর্কে ধারণা বিকাশ লাভ করতে শুরু করেছিল মাত্র ।

তবে তখন জ্যোতির্বিদ্যা শুধুমাত্র খালি চোখে বস্তুর গতি পর্যবেক্ষণ এবং পূর্বাভাস এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অনেক স্থানে আবার আকাশের বস্তুগুলোর গতিবিধি বোঝা এবং তাদেরকে উপাসনা করার জন্য মানমন্দির বানানো হয়েছিল। সেগুলো ছিল একইসাথে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক মানমন্দির এবং উপাসনালয়, সমাধি বা বিভিন্ন সামাজিক আচারাদি পালনের স্থান।

সময় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা মানুষ সূর্য পর্যবেক্ষণ করেই পেয়েছিল। ছায়া পরিমাপের সাহায্যে আদিম মানুষ সূক্ষ্মভাবে সময়ের হিসাব রাখতে শিখেছিল। চাঁদের আকার পরিবর্তন ও পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে

আসাকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই দিন গণনার সূত্রপাত হয়। ২৯-৩০ দিন পরপর নতুন চাঁদের বা পূর্ণিমার পুনরাবর্তনকে কেন্দ্র করেই মাস হিসেব করা হয়। মানুষ তখন সবে কৃষিকাজ শিখছে, আর কৃষির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঋতু পরিবর্তনের, যে ঋতু নিয়ন্ত্রিত হয় সূর্যের মাধ্যমে। ঋতুর সাথে আবার আকাশের অনেক তারার অবস্থান মিলে যায়। তাই আকাশ জানাটা তাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

পাখির হাড়ের খণ্ডে চন্দ্রের ক্যালেন্ডার

প্রাগৈতিহাসিক কালে মানুষের বাসকৃত গুহার দেয়াল বা ছাদে আবিষ্কার করা নানা রকম গুহাচিত্রে দিক ও ঋতু নির্দেশনার জন্য চন্দ্রচক্র ও বিভিন্ন নক্ষত্রমণ্ডলের নানা প্রকার চিত্রকর্মের সন্ধান পাওয়া গেছে। আফ্রিকা ও ইউরোপের প্রাচীন গুহাতে প্রায় ৩০,০০০ বছর পুরোনো, হাড়ে খোদাই করা হাড় এবং পাথর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এগুলো সম্ভবত চাঁদের ক্যালেন্ডার ছিল।

চিত্র: ফ্রান্সের আব্রি ব্লানচার্ডের একটি গুহাতে ৩২,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের সময়ে ঈগল পাখির হাড়ের খণ্ডে চন্দ্রের ক্যালেন্ডার আঁকা পাওয়া গেছে। এতে হ্রাস-বৃদ্ধিরত চাঁদের অবস্থানের চিত্র সর্পিলাকারে খোদাই করা হয়েছে।

দ্য ভেনাস অব লসেল”

দক্ষিণ ফ্রান্সের মারকুয়েতে ২৩,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের **“দ্য ভেনাস অব লসেল”** নামে লাইমস্টোনের এক নারীমূর্তির ভাষ্কর্যের হাতে ধরে থাকা ‘শিং’-এর গায়ের ১৩টি কাটা খাঁজ এক সৌর বছরে ১৩টি চন্দ্রচক্রকে নির্দেশ করে (লিউনিসোলার ক্যালেন্ডার)।

সমাধি-সুড়ঙ্গ

নব্য প্রস্তরযুগের শুরুর দিকের (৩,৫০০-৩,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) সময়ের শতাধিক সমাধি-সুড়ঙ্গ নিয়ে গবেষণা করে জানা গেছে, সেগুলোর প্রবেশদ্বারগুলোর বেশিরভাগেরই অবস্থান সূর্যের উত্তরায়ন বা দক্ষিণায়নের উদয়-অস্ত কিংবা পূর্ণিমার চাঁদের উদয়-অস্ত অবলোকনের উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছিল।

চিত্র: আয়ারল্যান্ডের মিথ কাউন্টির বয়েন নদীর অববাহিকার নিউগ্রাঞ্জ হলো ৩৩০০-২৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়ের তৈরি আরেকটি উল্লেখযোগ্য সমাধি-সুড়ঙ্গ। এর প্রবেশদ্বারের ওপরের একটি ছোটো জানালা দিয়ে শীতের দক্ষিণায়নের (১৮-২৩শে ডিসেম্বর) সূর্যোদয়ের সময় সূর্যালোক সুড়ঙ্গ দিয়ে প্রবেশ করে ভেতরের কক্ষকে ১৭ মিনিটের জন্য আলোকিত করে।

নেব্রা স্কাই ডিস্ক

প্রাচীনতম পর্যবেক্ষণকৃত জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্যতম নিদর্শন হলো উত্তর ইউরোপ (সুইডেন) থেকে পাওয়া ১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের নেব্রা স্কাই ডিস্ক। এই ৩০ সে.মি ব্রোঞ্জ ডিস্কে সূর্য, একটি বাঁকা আংশিক চাঁদ এবং কিছু তারা (প্লাইয়েডস **ইংরেজিতে Pleiades** বা কার্তিকেয় তারকাগুচ্ছ) অঙ্কিত রয়েছে। ডিস্কটি সম্ভবত একটি ধর্মীয় প্রতীক এবং পাশাপাশি একটি অশোধিত জ্যোতির্বিদ্যা যন্ত্র বা একটি ক্যালেন্ডার।

স্টোনহেঞ্জ

জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত ঘটনাগুলি প্রস্তরযুগের সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য গুরুতর প্রভাব ফেলেছিল। উত্তর ইউরোপে প্রায় ৪,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে প্রায় ২৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন মেগালিথিক প্রস্তরকাঠামোর লে-আউটের সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে চন্দ্র-সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান এবং পূর্বাভাস সম্পর্কিত বিষয়ের জটিল প্যাটার্ন লক্ষ করা যায়। ইংল্যান্ডের উইল্টশায়ারের অ্যামাসবারির নিকটে অবস্থিত প্রায় ৩,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়ের তৈরি স্টোনহেঞ্জ (ইংরেজি: **Stonehenge**) নিওলিথিক এবং ব্রোঞ্জ যুগের একটি প্রস্তর কাঠামো যা মানমন্দির হিসেবে ব্যবহৃত হতো বলে ধারণা করা হয়।

চারপাশের পাথরগুলি প্রায় ৩০ টন ওজনের, এবং সম্ভবত ২০ মাইল দূরে একটি স্থান থেকে ষাঁড় দ্বারা টানা হয়, আর কেন্দ্রীয় পাথরগুলি ১৩০ মাইল দূরে ওয়েলসের থেকে আনা হয়। এটি সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে, স্টোনহেঞ্জে প্রতিটি ঋতুর মাঝামাঝি পর্যায়ে সূর্য ও চাঁদের উদয় এবং অস্তের অবস্থান হিসাব করা হতো। এ ছাড়াও, হিল স্টোন নামক প্রাচীন পাথরটি, যা কিনা স্টোনহেঞ্জের প্রবেশপথে এমন অবস্থানে স্থাপিত হয়েছিল যেন কাঠামোর কেন্দ্র থেকে সরাসরি পাথরটির দিকে দৃষ্টিপাত করলে গ্রীষ্মের উত্তরায়ণের সূর্যোদয় দেখা যায়। এটিও ধারণা করা হয়েছে যে, বাইরের পাথরের সিরিজগুলি চন্দ্রগ্রহণের পূর্বাভাসের জন্য একটি গণকযন্ত্র হিসাবে কাজ করতে পারত।

ব্রোঞ্জযুগের আগ পর্যন্ত, বিশেষ করে লিখিত ভাষা প্রচলনের আগ পর্যন্ত এগুলোই জ্যোতির্বিদ্যার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়।
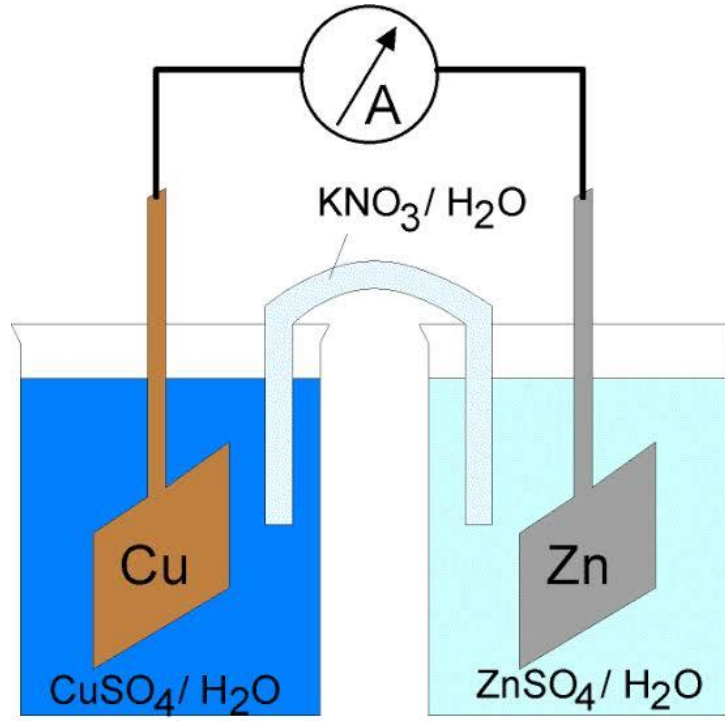
তড়িৎ রসায়ন

সোহম চ্যাটার্জী

লবণ সেতু কীভাবে তড়িৎ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে বিক্রিয়া কে সচল রাখে। সেটা নিয়েই এই লেখা। ব্যাপারটা অনেকটা প্রাচীনকালের বিনিময় প্রথার মতো। তখনকার দিনে তো এরকম টাকা-পয়সার প্রচলন হয়নি। তাই একজন অন্যকে নিজের উৎপাদিত দ্রব্যের ভাগ দিয়ে, তার কাছ থেকে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস নিত। যেমন- একজন কৃষক ধান কাটার কাস্তে, চাষের লাঙল ইত্যাদি তৈরি করাতে কামার এর কাছে যেত, এবং এর পরিবর্তে সে কামার কে ধান দিত। ফলে দু-জনেরই প্রয়োজন মিটত।

আগে আমরা জেনে নিই লবণ সেতু কী দিয়ে তৈরি হয়।

লবণ সেতু: ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের বেগ সমান, এরকম কোনো উপযুক্ত তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থের(যেমন- KCl,KNO_3,NH_4NO_3 ইত্যাদি) গাঢ় দ্রবণ তৈরি করা হয়। এরপর তার মধ্যে সামান্য পরিমাণ 'অ্যাগার-অ্যাগার'

জেল মিশ্রিত করে উত্তপ্ত করা হয়। তারপর দ্রবণটিকে একটি U আকৃতির কাচের নলের মধ্যে ঢেলে শীতল করলে দ্রবণটি জেলির মতো জমে যায়। এভাবে প্রাপ্ত সিস্টেমটিকে "লবণ সেতু" বলে।

ব্যবহৃত তড়িৎবিশ্লেষ্য এমন হবে, যেন সেটা কোষ-বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করে।

এবার আমরা গ্যালভানীয় কোষের উদাহরণ হিসেবে একটা ড্যানিয়েল কোষ নিলাম (নিচে ছবি দেওয়া আছে) । দুটি বিকারের একটিতে 1.0(M) ZnSO4 দ্রবণে জিঙ্ক দণ্ড ও 1.0(M) CuSO4 দ্রবণে কপার দণ্ড আংশিক নিমজ্জিত করে বিকার দুটিকে লবণ সেতুর মাধ্যমে যুক্ত করা হলো। এরপর ধাতব দণ্ড দুটিকে একটি ভোল্টমিটার ও চাবির মাধ্যমে পরিবাহী তার দিয়ে যুক্ত করলে ড্যানিয়েল কোষ গঠন করা হয়। দ্রবণে নিমজ্জিত ধাতব দণ্ড দুটিকে ইলেকট্রোড বলে। প্রত্যেকটি বিকারের দ্রবণ সহ ধাতব দণ্ডকে অর্ধকোষ বলে। পুরোটা নিয়ে একটি সম্পূর্ণ কোষ। তারপর বর্তনী সম্পূর্ণ করা হয়।

বিক্রিয়া: এখন কোষটিতে যে কোষ বিক্রিয়া ঘটে সেটা এরকম-

$Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu\ (s)$
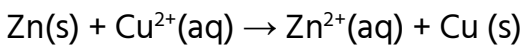
লবণ সেতুর কার্যপদ্ধতি: তাহলে এই বিক্রিয়ায় এবার লবণ সেতুর ভূমিকা দেখা যাক।

Zn ও Cu তড়িদ্দ্বার দুটিকে পরিবাহী তারের মাধ্যমে যুক্ত করলে Zn তড়িদ্দ্বারে জারণ ঘটে $Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e^-$ এবং উৎপন্ন Zn^{2+} আয়নগুলি $ZnSO_4$ দ্রবণে প্রবেশ করে এবং ইলেকট্রনগুলো পরিবাহী তারের মাধ্যমে তড়িদ্দ্বারে যায়। সেখানে $CuSO_4$ দ্রবণ থেকে Cu^{2+} আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয় $Cu^{2-}(aq) + 2e^- \rightarrow$ Cu(s) এবং কপার তড়িদ্দ্বার ধাতব কপাররূপে জমা হয়। এই ঘটনায় $ZnSO_4$ দ্রবণে Zn^{2+} আয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে, দ্রবণটি ধনাত্মক আধানপ্রাপ্ত হয় এবং তার ফলে Zn তড়িদ্দ্বার থেকে আরও Zn^{2+} আয়নের দ্রবণে আসা বাধাপ্রাপ্ত হয় (কারণ, সমধর্মী আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে)।

অন্যদিকে $CuSO_4$ দ্রবণে SO_4^{2-} আয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ফলে দ্রবণটি ঋণাত্মক আধানগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং আরও Cu^{2+} আয়নের দ্রবণে বিজারিত হওয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে, একসময় Zn তড়িদ্দ্বার থেকে Cu তড়িদ্দ্বারে পরিবাহী তারের মাধ্যমে ইলেকট্রন প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং কোষটির ক্রিয়া তথা তড়িৎ শক্তি উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু আসলে সেটা হয় না। কারণ লবণ সেতুর মধ্যে উপস্থিত লবণের অ্যানায়ন $ZnSO_4$ দ্রবণে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় প্রবেশ করে, এবং কিছু সংখ্যক $ZnSO_4$ আয়ন লবণ সেতুতে প্রবেশ করে। এর ফলে $ZnSO_4$ দ্রবণের ধনাত্মক আধানগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ থাকে না এবং দ্রবণটি তড়িৎ প্রশম অবস্থায় থাকে। অন্যদিকে লবণ সেতু থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্যাটায়ন $CuSO_4$ দ্রবণে প্রবেশ করে এবং কিছু সংখ্যক SO_4^{2-} আয়ন লবণ সেতুতে প্রবেশ করে। এর ফলে $CuSO_4$ দ্রবণের ঋণাত্মক আধানগ্রস্ত হওয়ায় সুযোগ থাকে না এবং দ্রবণটির তড়িৎ প্রশমতা বজায় থাকে। সুতরাং, লবণ সেতুর উপস্থিতিতে কোষের তড়িৎবর্তনী সম্পূর্ণ হয় এবং কোষের ক্রিয়া তথা তড়িৎ উৎপাদন চলতেই থাকে যতক্ষণ না কোষ বিক্রিয়াটি সাম্যাবস্থায় পৌঁছায়।
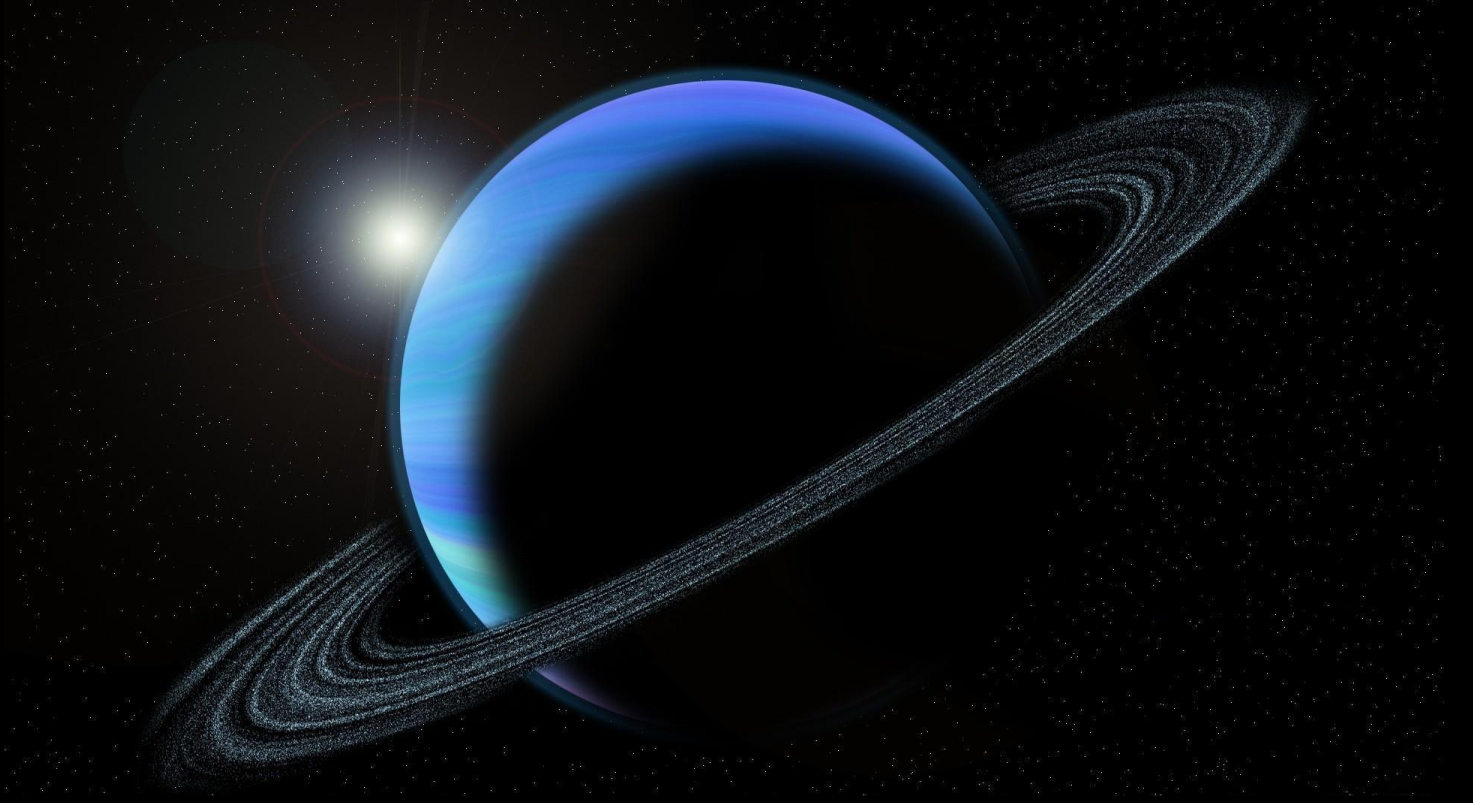
ইউরেনাস (Uranus)

আমির

পৃথিবীর অসহ্য গরম আর ভালো লাগছে না তোমার। একদিন গ্রীষ্মের দুপুরবেলা বাজার থেকে ফিরে এসে ঠিক করলে বাইরে একটু ঠান্ডা হাওয়া খেয়ে আসা যাক। রওনা দিলে সৌরজগতের সবচেয়ে ঠান্ডা গ্রহ, ইউরেনাসের দিকে।
গ্রহের নামটা ধার নেওয়া হয়েছে গ্রিক মিথোলজির আকাশের দেবতা "আরানাস" এর কাছ থেকে। যিনি ছিলেন আমাদের শনি (ক্রোনোস) গ্রহের বাবা এবং বৃহস্পতি (জিউস) গ্রহের দাদু।

৯ বছর ধরে জার্নি করে ২.৯ বিলিয়ন কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে গ্রহটির সীমানায় ঢুকে ২৭ টা উপগ্রহ এবং কয়েক কিলোমিটার প্রশস্ত বলয় পাড়ি দিয়ে অবশেষে এর সার্ফেসে পৌঁছলে। এখন দিন। তবুও বেশ অন্ধকার দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে সূর্য খুবই ছোটো। চাঁদ পৃথিবীতে যতটুকু আলো দেয় সেটুকুও পাচ্ছ না। পৃথিবীর আলোর চারশো ভাগের এক ভাগের মতো পাচ্ছো। স্পেইসস্যুটের ভেতর থেকে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছো। আকার এবং ভর, দুদিক থেকেই পৃথিবীর চেয়ে গ্রহটা বেশ এগিয়ে। এর গ্র্যাভিটি পৃথিবীর প্রায় ৯০% এর মতো। তাই একে ম্যানেজ করতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। মেঘের প্রথম স্তর ভেদ করে বায়ুমণ্ডলে নেমেছ। চারপাশে রয়েছে ঠান্ডায় জমে যাওয়া ঘন গ্যাস। যার ৮৩% হাইড্রোজেন,

৮৫% হিলিয়াম এবং ২% মিথেন, অ্যামোনিয়াসহ অন্যান্য গ্যাস। ওপরে ঘনত্ব কম। নিচের দিকে ক্রমশ বাড়ে। জায়গাটা খুব একটা ঠান্ডা না। তাপমাত্রা মেপে দেখলে মাত্র -৮৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পোষাল না তোমার। আরো ঠান্ডা চাই। রাতে বেশি ঠান্ডা পাওয়া যায়। তো এখন কি রাত হওয়ার জন্য ৮৮৫ দিন অপেক্ষা করবে? সেটা করলেও কোনো লাভ নেই। তুমি এখন ইউরেনাসের মেরুতে দাঁড়িয়ে রয়েছ এবং মাথার ঠিক ওপরে সূর্য। অন্যান্য গ্রহের চেয়ে ইউরেনাস একটু ভিন্ন। এর মেরু সরাসরি সূর্যের দিকে। মানে খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে না ঘুরে এটি সূর্যের সাথে প্রায় সমান্তরালে শুয়ে থেকে ঘুরছে। তাহলে এখন রাত পাবে কীভাবে? ৪২ বছর অপেক্ষা করবে রাতের জন্য? তারচেয়ে বরং জায়গা চেঞ্জ করে ফেল।

বিপরীত মেরুর দিকে যাচ্ছ। তাপমাত্রা আস্তে আস্তে আরো কমতে লাগল। -২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার ঠান্ডা। এবার আরাম লাগছে। একটু পর তাপমাত্রা -২২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে আসল। হাড়সুদ্ধ কেঁপে উঠল। নাহ, এবারে ফিরে না আসলে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। কৌতুহলবশত ঘন গ্যাস এবং অন্ধকারের ভেতর দিয়ে গ্রহের ভেতরের দিকে রওনা দিলে। আস্তে আস্তে তাপমাত্রা বাড়ছে। ঠান্ডা কম। কিছুটা আরাম লাগছে। ৫০০০ কিলোমিটার পথ যাওয়ার পর হঠাৎই ধড়াম করে কীসের সাথে যেন একটা বাড়ি খেয়ে তোমার মাথাটা ঘুরে গেল। ওমা, এ যে বরফ! পানি, মিথেন আর অ্যামোনিয়া জমে সৃষ্টি হয়েছে। এই বরফের স্তর ভেদ করে যাওয়া তোমার পক্ষে আপাতত সম্ভব না। ৮০,০০০ কিলোমিটারের পুরু স্তর। এর পরেই রয়েছে ২২,০০০ কিলোমিটার পুরু লোহা, নিকেল আর সিলিকেটের কোর। সেখানে তাপমাত্রা ৫০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কী করবে ভাবতে না ভাবতেই খেয়াল করলে চাপে তোমার স্যুট বেঁকে গায়ে বসে যেতে শুরু করেছে। দ্রুত সেখান থেকে সরে না এলে তোমার ৮২ টা বেজে যাবে। চলে এলে গ্রহের একেবারে ওপরের দিকটায়। একটু আরাম লাগছে। হাফ ছেড়ে একটু শ্বাস নিতে নিতেই দেখলে সামনে থেকে প্রতি ঘণ্টায় ৯০০ কিলোমিটার বেগে ধেয়ে আসছে ঝড়ো বাতাস। নাহ, এটা পিকনিকের জায়গা না। দ্রুত পালাও।

এক নজরে ইউরেনাস

ব্যাস: 52,400 কি.মিঃ।

সূর্যের থেকে আনুমানিক দূরত্ব: 286 কোটি 96 লক্ষ কি.মি

সূর্য-পরিক্রমার সময়: 84 বছর

নিজ অক্ষে ঘোরার সময়: 16 ঘণ্টা

উপগ্রহ: 27 টি

গড় তাপমাত্রা: মাইনাস 213 ডিগ্রি সেলসিয়াস

ঘনত্ব: 1.318 গ্রাম/সে.মি

গ্র্যাভিটেশনাল ত্বরণ: 8.69 মি/সে

ভর: 8.6832×10^{25} কেজি

অ্যাডা লাভলেস: ইতিহাসের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার

কাজী আকাশ

আধুনিক কম্পিউটার বা প্রোগ্রামযোগ্য প্রথম কম্পিউটার 'জেড-১' বাজারে আসে ১৯৩৬-৩৮ সালে। কম্পিউটারে প্রোগ্রাম করার পরিকল্পনা করা হয় ১৯৭০-এর দশকে। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার, কম্পিউটারের জন্য প্রথম প্রোগ্রাম লেখা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। অর্থাৎ, প্রথম কম্পিউটার বাজারে আসার প্রায় ১০০ বছর আগেই কেউ প্রোগ্রাম লিখেছিলেন। আর এই কাজটি করেছিলেন একজন মহীয়সী নারী। তিনি অ্যাডা অগাস্টা কিং। অ্যাডা লাভলেস নামেই তিনি অধিক পরিচিত।

১৮১৫ সালের ১০ ডিসেম্বর। লন্ডনের এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন অ্যাডা লাভলেস। অ্যাডা লাভলেস বেশ কয়েকটি নামে পরিচিত। অ্যাডার বাবার সৎ বোনের নাম ছিল অগাস্টা লেই। তাঁর নামানুসারে লাভলেসের নাম রাখা হয় অগাস্টা। বাবার দেওয়া নাম অ্যাডা। এভাবে পরিবার থেকে পাওয়া নাম অ্যাডা অগাস্টা। বিয়ের পর নামের কিছুটা পরিবর্তন হয়। আগের নামের সাথে স্বামীর নাম কিং যুক্ত হয়ে হয় অ্যাডা অগাস্টা কিং। তাঁর স্বামীর পদবি ছিল লাভলেস। সে হিসেবে সংক্ষেপে তাকে অ্যাডা লাভলেস বলে ডাকা হত। তিনি কাউন্ট অব লাভলেস নামেও পরিচিত ছিলেন। লাভলেসের ব্যাপারে বিস্তারিত জানার আগে তাঁর বাবা-মায়ের ব্যাপারে একটু আলোকপাত করতে হবে।

অ্যাডার মায়ের নাম অ্যানা ইসাবেল। যে সময় গণিত ও বিজ্ঞানকে পুরুষের বিষয় (subject) বলে মনে করা হত সে সময় অ্যানা ইসাবেল গণিত ও বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর ইচ্ছা গণিতের অধ্যাপক হবেন। কিন্তু জগতের সবার সব ইচ্ছে তো আর পূরণ হয় না। অ্যানা ইসাবেলের এই ইচ্ছাটাও পূরণ হলোনা। ১৮১৫ সালের ২রা জানুয়ারি বিয়ের পিঁড়িতে বসেন তিনি। তখন অ্যানার বয়স ২৩। বিয়েও হলো সে সময়কার এক বিখ্যাত কবির সাথে। কবির বয়স তখন ২৭। দেখতে রূপকথার নায়কের মতো। খ্যাতিও বিশ্বজোড়া। তিনি রোমান্টিক যুগের কবি লর্ড বায়রন। স্বামীর সংসারে গিয়ে অ্যানা ইসাবেলের গণিত ও বিজ্ঞানের ঝোঁক কমতে শুরু করে। ভুলতে শুরু করেন তাঁর পুরানো স্বপ্নের কথা। অ্যানার স্বপ্ন আর বাস্তবে রূপ নিতে পারেনি। ওদিকে সাংসারিক জীবনেও চরম অসুখী ছিলেন ইসাবেল। কারণ তাঁর স্বামী প্রায়ই ঘরে-বাইরে নেশা করতেন। ফুর্তি করতেন বিভিন্ন মেয়ের সাথে। কোনো রাতে বাসায় ফিরতেন তো কোনো রাতে তাঁর দেখাও পাওয়া যেত না। এর মধ্যে জন্ম নিলেন অ্যাডা লাভলেস। বায়রন সাহেব মা-মেয়ের খোঁজ খবর রাখার সময়ই পেতেন না। এভাবে কি আর সংসার হয়? হলো না তাঁদের সংসারও। বিয়ের এক বছর চৌদ্দ দিনের মাথায় ১৮১৬ সালের ১৬ জানুয়ারি তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। লাভলেসের বয়স তখন মাত্র এক মাস। অ্যানা ইসাবেল মেয়েকে নিয়ে বাসা ছেড়ে চলে গেলেন। তারপর আর কখনো অ্যানা ইসাবেল ও

বায়রনের দেখা হয়নি। দেখা হয়নি মেয়ে অ্যাডা লাভলেসের সাথেও।

অ্যানা ইসাবেল মেয়েকে নিয়ে উঠলেন তাঁর মায়ের বাসায়। সেখানেই বড়ো হতে থাকেন লাভলেস। অ্যানার ইচ্ছে নিজের স্বপ্ন মেয়েকে দিয়ে পূরণ করাবেন। লাভলেসের বয়স তখন ৭ বছর। মায়ের ইচ্ছেতে লাভলেস গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, ও মিউজিক শিখতে শুরু করেন। শৈশবে লাভলেসের পড়ার সুযোগ হয়েছে সে সময়কার সেরা গণিত শিক্ষকদের কাছে। তাঁদের মধ্যে ড. উইলিয়াম কিং, আরাবেলা লরেন্স ও মিস ল্যামন্ট অন্যতম।
প্রথম দিকে অ্যাডার গণিতের প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল না। তাঁর সমস্ত আগ্রহ ছিল ভূগোলজুড়ে। ১০ বছর বয়সে লাভলেস কিছুটা সাহিত্যের প্রতিও আকৃষ্ট হন। এই বিষয়টা নজরে পড়ে অ্যানা ইসাবেলের। তিনি কিছুতেই চাইছিলেন না মেয়ে বড়ো হয়ে বাবার মতো কবি বা সাহিত্যিক হোক। তাঁর ভয় সাহিত্য মেয়েকে বাবার মতো ছন্নছাড়া করে তুলবে। অ্যানা যেহেতু গণিতের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন তাই মেয়েকেও সেই পথে নেওয়ার চেষ্টা করেন। লাভলেসের জন্য একজন গৃহশিক্ষক রাখা হলো। শিক্ষকের কাজ লাভলেসকে গণিতের প্রতি আকৃষ্ট করা।

১১ বছর বয়সে অ্যানা মেয়েকে নিয়ে ইউরোপ ভ্রমণে গেলেন। উদ্দেশ্য গুণী মানুষের সাথে পরিচিত হলে লাভলেসের চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন হবে। ইসাবেলের উদ্দেশ্য সফল হলো। ইউরোপ থেকে ফিরে লাভলেসের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন হয়। পাখি কীভাবে উড়তে পারে- এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেন তিনি। মাত্র ১৩ বছর বয়সেই পাখির ওড়ার ব্যাপারে বেশ কয়েকটি বই পড়ে শেষ করেন। পাখির ওজন, ডানার অনুপাত সম্পর্কে জানতে পাখির অ্যানাটমি পড়তে শুরু করেন। মাঝেমধ্যে দেখা যেত, লাভলেস মুক্ত আকাশে পাখির দিকে তাকিয়ে আছেন। বোঝাই যাচ্ছে পাখি লাভলেসের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। ওই বয়সেই তিনি একটি বই লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন।

লাভলেসের জীবনযাপন আর পাঁচটা সাধারণ ছেলেমেয়ের মতো ছিল না। তাঁর আপন বলতে শুধু ওই মা এবং নানী। মা আদরের চেয়ে শাসন করেন বেশি। নিয়মিত পড়া দিতে হতো মায়ের কাছে। কোনোদিন পড়া না হলে শাস্তি পেতে হতো। যে বয়সে তাঁর স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর কথা, সে বয়সে লাভলেস ঘরবন্দি হয়ে পড়ালেখা করতেন। প্রথমদিকে অ্যানা মেয়ের খুব যত্ন নিলেও ধীরে ধীরে কোনো এক অজানা কারণে তিনি দায়িত্বহীন হয়ে পড়েন। মেয়ের সাথে খুব একটা কথাবার্তাও বলতেন না। তখন লাভলেসের জগতে ছিলেন শুধু তাঁর নানি লেডি নোয়েন। অ্যানা ইসাবেলের এই পরিবর্তনের কারণ হয়তো অল্পবয়সে স্বামীর থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া। ১৮২২ সালে মারা যান লাভলেসের নানি নোয়েন। একা হয়ে পড়েন লাভলেস। ইতোমধ্যে তাঁর বাবাও মারা গেছেন। অ্যানা ইসাবেলের সাথে ছাড়াছাড়ি হওয়ার মাস তিনেক পরে ২৪ এপ্রিল বায়রন লন্ডন ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। আর কখনো ফেরেননি লন্ডনে। তিনি গ্রীসে জাহাজ ডুবিতে মারা যান। লাভলেসের বয়স তখন ৮ বছর। বায়রনের মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারে অ্যানা। মেয়েকে বায়রনের ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন, উনি তোমার বাবা। বাবার মৃত্যুর খবর শুনে খুব কেঁদেছিলেন লাভলেস। যদিও বাবার আদর পাননি তাতে কী? বাবার প্রতি ভালোবাসা তো ছিল। ছোটোবেলায় লাভলেস বাবার কথা জিজ্ঞেস করলে অ্যানা বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলে দিতেন। অ্যানার ভয় ছিল, মেয়ে যদি বাবার কাছে চলে যেতে চায়? লাভলেস একে একে বাবা ও নানীকে হারালেন। মা যেন থেকেও নেই। সারাদিন একা একা ঘরবন্দী হয়ে থাকতেন।

১৮৫৪ সালে লাভলেসের সাথে পরিচয় হয় চার্লস ব্যাবেজের। ব্যাবেজ তখন ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক। অনেকে বলেন, মেরি সামারভিলের সাহায্যে লাভলেস ব্যাবেজের সাথে পরিচিত হন। কেউ কেউ বলেছেন, ব্যাবেজ লাভলেসের গণিতের দক্ষতা দেখে তাকে ডেকেছিলেন। তবে যাই হোক ব্যাবেজের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় লাভলেস ও অ্যানাবেলার মধ্যে আবার আগের মতো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁরা একসাথে ব্যাবেজের যন্ত্রটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। চার্লস ব্যাবেজ সে সময় ডিফারেন্স ইঞ্জিন নিয়ে

কাজ করছিলেন। মূলত ব্যাবেজের কাজ ছিল, প্রোগ্রাম করা যায় এমন একটি যন্ত্র ডিজাইন করা। কিন্তু এই ডিফারেন্স ইঞ্জিনে প্রোগ্রাম করা যেত না। লাভলেসের যুগে গণনা করার জন্য গাণিতিক টেবিল ব্যবহার করা হতো। প্রথমে খাতা কলমে হিসাব করা হতো। পরে গাণিতিক টেবিলের সাথে মিলিয়ে দেখা হতো। এভাবে গণনা করা বেশ সময়সাপেক্ষ ছিল। আবার মাঝে মধ্যে টেবিলের সাথে হিসাব মেলানোর সময় ভুল হতো। তাই এমন একটি যন্ত্রের প্রয়োজন ছিল, যে যন্ত্র নিজ থেকেই এ ধরণের গাণিতিক হিসেব করতে পারবে। ১৮১৯ সালে ব্যাবেজ ডিফারেন্স ইঞ্জিন নামে এ ধরণের একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন।

উনিই যে এই ধরনের যন্ত্র প্রথম উদ্ভব করেছেন তা নয়। ব্যাবেজের সময়ের প্রায় ২০০ বছর আগে ব্লেইজ পাস্কাল অ্যারিথমেটিকা নামে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর সেই যন্ত্রের মাধ্যমে যোগ ও বিয়োগ করা যেত। এছাড়া গডফ্রিড লিবনিজ একটি যন্ত্রের উদ্ভব করেন। সেই যন্ত্রের সাহায্যে বড়ো বড়ো গুন ভাগ করা যেত। বলা বাহুল্য যে, সেগুলো ব্যাবেজের ডিফারেন্স ইঞ্জিনের ধারেকাছেও ছিল না।

ডিফারেন্স ইঞ্জিন উদ্ভাবনের পরে ব্যাবেজ ব্রিটিশ সরকার থেকে অনুদান পান। এই অনুদানের টাকা দিয়ে ব্যাবেজ আবার গবেষণা শুরু করেন। প্রায় ১৫ বছর পর উদ্ভাবন করেন অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন। এই যন্ত্রটি প্রোগ্রামযোগ্য ছিল। এটি শুধু যোগ, বিয়োগ বা গুন, ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। আধুনিক কম্পিউটারের অনেক গুণাগুণ ছিল ব্যাবেজের অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনে। এই কারণেই অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনকে প্রথম কম্পিউটারের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আর ব্যাবেজকে বলা হয় কম্পিউটারের জনক।

যাই হোক, ব্যাবেজ লাভলেস ও তাঁর মাকে অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন দেখান এবং যন্ত্রটি কীভাবে কাজ করে তার বর্ণনা দেন। লাভলেস এই ইঞ্জিনের প্রতি আকর্ষণবোধ করলেন। তিনি প্রায়ই ব্যাবেজের সাথে দেখা করতেন এবং অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন সম্পর্কে আলোচনা করতেন। দুজনে মিলে কাজ করতে শুরু করলেন। ব্যাবেজের সাথে লাভলেসের রোমান্টিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। লাভলেসের বয়স সবে মাত্র ১৭। ব্যাবেজের বয়স তখন ৪১ বছর।

১৮ বছর বয়সে লাবলেসের সাথে পরিচয় হয় মেরি সামারভেলের। সামারভেল তাকে গণিত শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি গণিতের প্রতি আরো উৎসাহী করে তোলেন। এক সময় ছাত্রী-শিক্ষকের সম্পর্ক বন্ধুতে পরিণত হয়। অ্যাডা লাভলেস অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনের ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন প্রচণ্ড উৎসাহী তখন পরিবারিকভাবে চলে বিয়ের আলোচনা। বিয়ের আগে মেরি সামারভেলের বাড়িতে যাওয়া আসা করতেন লাভলেস। ১৮৩৫ সালের জুনে হবু স্বামী উইলিয়াম কিংকে লিখেছিলেন, আমি আজ সন্ধ্যায় আমার বন্ধু মিসেস সামারভিলের কাছে রাতে থাকার জন্য যাচ্ছি। তিনি দয়া করে আমাকে একটি কনসার্টে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। সংগীতের প্রতি প্রবল ভালোবাসার কারণে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতে পারিনি।

১৮৩৫ সালের ৮ জুলাই উইলিয়াম কিংকে বিয়ে করেন লাভলেস। ব্যাবেজের সাথে সম্পর্কে কিছুটা ভাটা পরে। তাই বলে কেউ কাউকে ভুলে যাননি। মাথা থেকে অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনের ভূত সরে যায়নি তখনো। মাঝেমধ্যে চিঠি লেখেন দুজন দুজনকে। সেই চিঠিতে নিজেদের কথার চেয়ে অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন নিয়ে ছিল বেশি আলোচনা। বিয়ের এক বছর পর একটি ছেলে সন্তান হয়। নাম রাখেন বায়রন। পরের বছর কোল জুড়ে আসে একটি মেয়ে। নাম অ্যানাবেলা। দুই বছর পর আরেকটি ছেলে হয়। নাম রালফ গর্ডন। এভাবে স্বামী ও ছেলে মেয়ে নিয়ে কেটে যায় কয়েক বছর। এর মধ্যেও চলতে থাকে ব্যাবেজের সাথে চিঠির আদান প্রদান। অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন আবার মাথা চারা দিয়ে ওঠে। অ্যাডা লাভলেস স্বামীর সাহায্য নিয়ে আবার গণিতের প্রতি মনোযোগী হন। এ সময়ে তিনি বিখ্যাত গণিতবিদ ডি মরগ্যানের কাছে গণিতের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন।

লাভলেস অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন নিয়ে কাজ করার জন্য আবার গবেষণা শুরু করলেন। ১৭ বছরের তরুণী এখন ২৭ বছরের যুবতী ও তিন সন্তানের জননী। অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনকে কীভাবে শুধু গণনা যন্ত্র থেকে আরো উন্নত করা যায় তা নিয়ে শুরু হলো তাঁর গবেষণা। তিনি বুঝতে পারলেন, ব্যাবেজের এই যন্ত্র দিয়ে শুধু সংখ্যা নয় বরং সংকেত ও ফরমুলাকেও বিশ্লেষণের উপযোগী করে তোলা সম্ভব। আগেই বলেছি লাভলেস শৈশবে সংগীত নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। সুর ও সঙ্গীতের ব্যাপারে তাঁর পূর্ব ধারণা এবার কাজে লাগল। তিনি সঙ্গীতকে অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনের মাধ্যমে রুপ দিতে চাইলেন। আজ আমরা দেখতে পারছি, অ্যাডা লাভলেসের সেই পরিকল্পনা কতখানি বাস্তব। আফসোস, লাভলসেস তা দেখে যেতে পারেননি।

ব্যাবেজ এক বক্তৃতায় অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনের বর্ণনা দেন। এই বক্তৃতাটি বই আকারে ইতালিয়ান ভাষায় প্রকাশ করা হয়। লাভলেস সেই বইটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করলেন। সেই সাথে নিজের অনেক মতামত জুড়ে দিলেন। কীভাবে অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণ ও জটিল গণনা করে ফলাফল নির্ণয় করে তার গাণিতিক ব্যাখ্যা দিলেন। ফলে দেখা গেল মূল বইয়ের তুলনায় লাভলেসের বইটি হলো প্রায় তিন গুণ। তাঁর এই গাণিতিক ব্যাখ্যাই ছিল ইতিহাসের প্রথম প্রোগ্রাম। তাই এক্ষেত্রে লাভলেসকে শুধু অনুবাদক বললে ভুল হবে। লাভলেস বইয়ে ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। তিনি নিজের নামের পরিবর্তে এএএল(AAL) ব্যবহার করেন। এই বই প্রকাশের পরে বন্ধু মহলে বেশ প্রশংসিত হন।

অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনের বাস্তব রূপ দিতে পারেননি ব্যাবেজ। তাই লাভলেসের কাজের গুরুত্ব কতখানি তাও সে সময় মানুষ বুঝতে পারেনি। লাভলেস ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নেন। সংসার ও ছেলে-মেয়ে নিয়েই সময় কেটে যেত তাঁর। কিন্তু শেষ জীবনে অনেকটা বাবার মতো জীবনযাপন শুরু করেন। প্রথমে আফিমের নেশা করতে শুরু করেন। খাবারের সাথে প্রচুর পরিমাণে অ্যালকোহল গ্রহণ করতেন। ঘোড়ার রেসে বাজি ধরে হারিয়েছেন কাড়িকাড়ি টাকা। ধীরে ধীরে জুটেছে অনেক ছেলে বন্ধুও। তাঁর স্বামী পরপুরুষের থেকে পাওয়া প্রায় ১০০ টি চিঠি নষ্ট করেছেন।

তাঁর এই অবনতির কারণ হয়তো তাঁর একাকীত্ব। তাঁর স্বামীও তাকে কঠোরভাবে বাধা দেননি। লাভলেস শৈশব থেকে পারিবারিক পরিবেশে বড়ো হয়েছেন। সুতরাং তাঁর স্বামী কঠোর হলে হয়তো লাভলেসের শেষ জীবনটুকু অন্যরকম হতো। মৃত্যুর আগে লাভলেস জানতে পারেন তাঁর বাবা মায়ের আলাদা হয়ে যাওয়ার আসল কারণ। যা এতদিন তাঁর মা লুকিয়ে রেখেছিলেন। মৃত্যুর আগে বাবার কথা স্মরণ করেছিলেন বারবার। তিনি বলেছিলেন, মৃত্যুর পরে আমাকে যেন বাবার কবরের পাশে রাখা হয়। ১৮৫২ সালে লন্ডনের মেলবোর্নে ৩৬ বছর বয়সে অ্যাডা লাভলেস জরায়ুর ক্যান্সার ও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে মারা যান। তাঁর বাবা লর্ড বায়রনও ৩৬ বছর বেঁচে ছিলেন। মৃত্যুর পর লাভলেসকে তাঁর বাবার কবরের পাশে চিরতরে শায়িত করা হয়।

অ্যাডা লাভলেসের মৃত্যুর ১০০ বছর পরে তাঁর কাজ নতুন করে প্রকাশ করা হয়। মানুষ বুঝতে পারে তাঁর কাজের গুরুত্ব। মৃত্যুর দেড়শ পর তাঁর অবদান স্বীকৃতি পেয়েছে। অ্যানাবেলার ইউরোপ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল মেয়েকে গুণী মানুষের ছায়াতলে বড়ো করা। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লাভলেস গুণী মানুষের সংস্পর্শে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে ও লেখক চার্লস ডিকেন্স অন্যতম। ১৯৮০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম সৃষ্টি করে। লাভলেসের সম্মানে ঐ প্রোগ্রামের নামকরণ করা হয় অ্যাডা (ADA)। ২০০৭ সাল থেকে প্রতি বছর অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবার দিনটিকে লাভলেস দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে।

সূত্র: ম্যাথ হিস্ট্রি ডট এসটি

উল্কা ও উল্কাবৃষ্টি

হৃদয় হক

অন্ধকারাচ্ছন্ন চাঁদ বিহীন কোনো এক রাতে আপনি কখনো বাহিরে বেরিয়ে খোলা আকাশের দিকে তাকালে কয়েক মিনিটের ভেতরেই দেখবেন এই বুঝি কোনো এক আলোকরেখা সাই করে ছুটে গেল। এই ঘটনাকে অনেকে বলে থাকেন নক্ষত্র-পতন বা তারা-খসা। তবে সত্যি বলতে কী এরা নক্ষত্র নয়, এদের নাম উল্কা। উল্কা আসলে খুবই ক্ষুদ্র মহাজাগতিক ধূলিকণা। অতি ক্ষুদ্র মহাজাগতিক পাথর বা বরফ কিংবা ধাতু। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে থাকা বাতাসের অণুগুলোর সাথে যখন এই ধূলিকণাগুলোর ঘর্ষণ ঘটে তখন এরা বাতাসের অণুগুলোকে উত্তপ্ত ও আন্দোলিত করে, আর সেই সাথে এরা মাটির উদ্দেশ্যে নেমে আসার সময় জ্বলে ওঠে। আসলে উল্কা বিষয়টি মূলত তিন অবস্থার একটি। কোনো মহাজাগতিক ধূলিকণা যা উল্কায় পরিণত হবে তাকে বলা হয় "মিটিয়রয়েড" যাকে বাংলায় "উল্কাধারী" বলা যেতে পারে।

এরা যখন পৃথিবী বা কোনো গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ বলের টানে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে জ্বলে ওঠে তখন এদের নাম হয় উল্কা বা মিটিয়র। বেশিরভাগ উল্কাই আকাশে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যদি নেমে এসে মাটিতে ধরা দেয় তাদের নাম হয়ে যায় উল্কাপিণ্ড বা "মিটিয়রাইট"। বছরের কিছু কিছু সময় পৃথিবী তার চলার পথে ঢুকে পড়ে নানান ধূমকেতুর কক্ষপথে। আর ধূমকেতু চলার সময় বস্তুত সূর্যকে পরিভ্রমণ করার সময় তার কক্ষপথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয় তার গা হতে নানান ক্ষুদেকণা। ধূমকেতুর কক্ষপথের বাহিরে এসব ক্ষুদেকণাদের সংখ্যা অনেক কম। তাই পৃথিবী যখন ধূমকেতুর কক্ষপথে ঢোকে এসব ক্ষুদেকণার সংখ্যাও অনেক বেশি হওয়ায় উল্কার সংখ্যাও বেড়ে যায়। উল্কারা যেন তখন বর্ষাকালের বৃষ্টির মতন চারদিকে ঝরে পড়ে। তাই এ বিশেষ ঘটনাকে বলা হয় উল্কাবৃষ্টি। পৃথিবী প্রতিবছরই এদের কক্ষপথ দিয়ে যায়। তাই যেসব ধূমকেতুর কক্ষপথ বেশি স্থিতিশীল তাদের সাথে প্রতিবছরই পৃথিবীর দেখা হয়। সেই সাথে আমাদের দেখা মেলে উল্কাবৃষ্টির। আর প্রতিবছর ঘটিত এসব উল্কাবৃষ্টিদের বলা হয় বার্ষিক উল্কাবৃষ্টি।

উল্কাবৃষ্টির নামকরণ:

যদিও মহাজাগতিক ধূলিকণার ফলে উল্কাবৃষ্টি ঘটে থাকে, তবে এদের নাম রাখা হয় অন্য উপায়ে। যে নক্ষত্রমণ্ডল থেকে বৃষ্টি পড়ছে বলে মনে হয় সেই নক্ষত্রমণ্ডলের ভিত্তিতে এদের নাম দেওয়া হয়। যেমন :জেমিনিডস (Geminids)। জেমিনিডস ঘটে মিথুন (Gemini) নক্ষত্রমণ্ডলে। এখানে উল্কাবৃষ্টির নামের শেষে "id" মানে হল "বোন" বা "এর সন্তান"। তাহলে জেমিনিডস অর্থ দাঁড়ায় - মিথুনের বোন বা মিথুনের সন্তান। তবে মাঝে মাঝে এ নিয়ম মানা হয় না। সেদিকে আজ আর না এগোই।

Shower Radiant (বর্ষণ বিচ্ছুরক) ও ZHR (জেড.এইচ.আর.)

শাওয়ার রেডিয়েন্ট বা বর্ষণ বিচ্ছুরক হলো ঠিক ওই বিন্দুটি যেখান থেকে উল্কাবৃষ্টির উল্কাগুলোর জন্ম হচ্ছে বা বিচ্ছুরিত হয়ে ঝরে পড়ছে বলে মনে হয়। এটি শুধুই তারামণ্ডল দিয়ে নির্ধারণ করা হয় না, সেই সাথে উক্ত মণ্ডলের একটি নির্দিষ্ট তারাকে দিয়ে নির্ধারণ করা হয়।

যখন কোনো উল্কাবৃষ্টির কথা বলা হয় তখন আপনি শুনে বা পড়ে থাকবেন যে, ঘণ্টায় ১২০টি জেমিনিডস উল্কা দেখা যাবে। আর এই

হিসেবটাই হলো ZHR বা (Zenithal Hourly Rate)। "ZHR" প্রথমত "Zenith"- এর সাথে সম্পর্কযুক্ত, নাম দেখেই বুঝা যায়। "Zenith" মানে আকাশের সর্বোচ্চ স্থান অর্থাৎ আপনি মাটিতে সোজা হয়ে লম্বভাবে বা ৯০° হয়ে দাড়ালে ঠিক মাথার ওপর আকাশের যে বিন্দুটির অবস্থান তাই হলো "Zenith"। এখন, যে মণ্ডলে উল্কাবৃষ্টি হবে সেই মণ্ডলের Shower Radiant বা বর্ষণ বিচ্ছুরক যখন "Zenith" - এ অবস্থান করে সে সময়ে আকাশের আদর্শ অবস্থার ভিত্তিতে আপনি বা একজন মানুষ প্রতি ঘণ্টায় কতটি উল্কা দেখবেন তার হারকে বলা হয় ZHR বা (Zenithal Hourly Rate)। তবে আপনি সবসময়ই ZHR এর দেওয়া মানের চেয়ে কম উল্কা দেখবেন। এর কারণ - আপনার অবস্থান ও পরিবেশ।

উল্কাদের দেখতে হলে......

প্রায় যতগুলো মহাজাগতিক ঘটনা রয়েছে তাদের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে রোমান্টিক হলো উল্কাবৃষ্টি। এর অনেক কারণও আছে বটে। এর জন্য অত উপকরণের প্রয়োজন হয় না। আবার রাতের আকাশ নিয়ে ন্যূনতম জ্ঞান থাকলেই উল্কাবৃষ্টি উপভোগ করা যায়। নব জ্যোতির্বিদ্যাপ্রেমিদের রাতের আকাশে তারকা মণ্ডলের সেই সাথে নানান তারার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্যেও উল্কাবৃষ্টি একটি খুব ভালো মাধ্যম। অনেকেরই উল্কাবৃষ্টির মাধ্যমে জ্যোতির্বিদ্যার সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। যদিও আমার সাথে এর সাক্ষাৎ অন্যভাবে ঘটেছিল তবে আমি পুরোপুরি জ্যোতির্বিদ্যাপ্রেমি হয়েছি উল্কাবৃষ্টির ছোয়ায়। ছোটোবেলায় গ্রামবাংলার অনেকেই হয়তো রাতের বেলা উঠানে বসে তাদের মা-বাবা কিংবা আত্নীয়দের সাথে আড্ডা দেবার সময় মাথার ওপর আকাশটার দিকে তাকিয়ে দেখতো। তখনই অনেকের পরিচয়

হত গ্রামবাংলার বিখ্যাত তিন তারা বা কালপুরুষের নয়তো বা সপ্তর্ষির সাথে। আবার অনেকেরই পরিচয় ঘটত তারা-খসা কিংবা উল্কার সাথে। এটি যেন প্রকৃতির আতশবাজি। কৃত্রিম আতশবাজির মত এরাও নানান রঙের হয়। এক একটি উল্কাবৃষ্টি দেখা যেন এক একটি অভিযানের মতন। একটি উল্কা দেখার পর অপরটি দেখার জন্য যে অধীর আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা, আর দেখা মেলার পর যে আনন্দ তা আপনি কখনো কৃত্রিম আতশবাজিতে পাবেন না। জ্যোতির্বিদরা প্রতিনিয়তই চেষ্টা করেন কোনো উল্কাবৃষ্টির সুনিশ্চিত সময়, অবস্থান ও মানের পূর্বাভাস দেওয়ার। তারা প্রতিনিয়তই এ নিয়ে ভালো করার চেষ্টা করছেন। তবে তারা কতটুকু সঠিক তা আপনি কখনোই বুঝবেন না যতক্ষণ না আপনি এটি নিজ চোখে উপভোগ করছেন। উল্কাবৃষ্টি আপনি মনের আনন্দের জন্য দেখতে পারেন, বিজ্ঞানের জন্যও দেখতে পারেন। আবার উভয়ের জন্যই দেখতে পারেন। তবে এখানে শুধু মনের আনন্দে এটি উপভোগের জন্য লিখছি। একাকী কিংবা সংঘবদ্ধ হয়েও উল্কাবৃষ্টি উপভোগ করা যায়। বিজ্ঞানের জন্য না হলে একাকী কিংবা সংঘবদ্ধ অবস্থায় উপভোগ করায় কোনো তফাত নেই। নানা ধরনের উল্কাবৃষ্টি রয়েছে, আবার নানান ভাবে এটি উপভোগ করা যায়। যেমন - খালি চোখে, টেলিস্কোপে, ছবি তুলে, ভিডিয়ো করে, আবার রেডিয়ো ভিত্তিকও রয়েছে। সকলের সুবিধার্থে এখানে শুধু খালি চোখে উল্কাবৃষ্টি দেখা নিয়ে আলোচনা করব।

খালি চোখ যেন ভরে উল্কাবৃষ্টির দানে

আসলে উল্কাবৃষ্টি দেখার জন্য সহজে এক লাইনের উপদেশ হল : বাহিরে যান, আরামে বসুন আর উল্কাবৃষ্টি উপভোগ করুন। আর বাকিসব হল এদের বিশদ আলোচনা। একাকী উল্কাবৃষ্টি দেখা যেন প্রকৃতির সাথে মিশে যাওয়া। একাকী দেখার একটি সুবিধা হলো, অত প্ল্যান করা লাগে না। মনে রাখা দরকার যে, সম্পূর্ণ আকাশকে একসাথে দেখার চেষ্টা বাদ দিতে হবে। আর, রেডিনেন্ট এর দিকে সরাসরি তাকানো উচিত নয়। এর কারণ, বিশাল আকাশে রেডিনেন্ট ক্ষুদ্র হলেও আপনার সাপেক্ষে তা একটু বড়ো। তাই সরাসরি তাকালে অনেক উল্কা আপনার দৃষ্টিগোচর হবে। ভালো হয় রেডিনেন্ট হতে ৬০° -৯০° 'র আশেপাশে তাকানো। খালি চোখে দেখার জন্য একটি বিষয় অবশ্যই মানা জরুরি তা হলো, উল্কাবৃষ্টি দেখার ৩০ থেকে ৪ঘণ্টা আগে মোবাইল, টিভি, ল্যাপটপ ইত্যাদি প্রকারের জিনিস ব্যবহার থেকে দূরে থাকুন, আরো ভালো হয় রুমে শুধু ডিম লাইট ব্যবহার করলে। এতে চোখ কিছু স্বস্তি পায় এবং অন্ধকারের সাথে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়। খালি চোখে দেখবেন ভালো কথা, তবে সেই সাথে নিচের উপকরণগুলো থাকা জরুরি :

১. হেলানো চেয়ার : আপনার পিঠের সাথে মানানসই একটি হেলানো চেয়ার উল্কাবৃষ্টি উপভোগের জন্য একটি ভালো উপকরণ। কারণ, বিভিন্ন দিকে কোণ করে তাকানো যায়। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত চেয়ার ব্যবহার করা মোটেই উচিত নয়। এতে করে আপনার ঘাড়ে অনেক চাপ পড়বে তাই বেশিক্ষণ আকাশে তাকিয়ে থাকতে পারবেন না। দাঁড়িয়ে দেখার তো কোনো মানেই হয় না। তবে শুয়ে দেখাও উচিত নয়। হেলানো চেয়ারের সাথে বালিশও রাখা যায়। এতে মাথা আরামে রাখা যাবে। তবে ঘুমিয়ে গেলে চলবে না।

২. কম্বল বা চাদর : রাতের বেলা এমনেই গরম কম থাকে, সাথে শীতকাল হলে তো কথাই নেই। তাই শরীর গরম রাখতে চাদর থাকা জরুরি। সেই সাথে এটি মশার কামড় থেকে কিছুটা ছাড় দেবে।

৩. পোকামাকড়ের জ্বালা : একটি মশাই আপনার পুরো উল্কাবৃষ্টি উপভোগের বারোটা বাজাতে পারে। তাই আপনার প্রিয় পোকা দমনের ওষুধ ব্যবহার করুন। কয়েল ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে তা এত স্বাস্থ্যসম্মতনয়। কিছু পেস্ট টাইপের বা ক্রিমের মত পোকানাশক আছে যা শরীরে লাগানো যায়। তবে ভেজলিন বা শীতকালীন লোশন ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪. খাবার ও পানীয়: ইচ্ছামত এক ফ্লাক্স চা কিংবা কফি আর সেই সাথে কিছু হালকা নাস্তা (শুকনো হলে ভালো) রাখা যেতে পারে। এতে উপভোগের মাত্রা বেড়ে যায়। বিশেষ করে মধ্যরাতের পর এর আনন্দ অন্যরকম।

৫. জামাকাপড় : রাত হিসেবে একটু ভারী জামা পড়া উত্তম। শীতকাল হলে উষ্ণ কাপড় পরিধান করে যেতে হবে। না হয়

প্রচুর ঠান্ডায় জমে যাবেন। এতে পরেরদিন ঠাণ্ডা-জ্বর লেগে দৈনন্দিন জীবনের কাজে ব্যাঘাত ঘটবে।

৬. লাইট : লাইট এর জন্য একটি লাল লাইট ব্যবহার করতে হবে। লাল আলোতে অন্ধকারে চোখে তেমন প্রভাব পড়ে না। লাল লাইটের অনুপস্থিতিতে সাদা লাইটে কোনো লাল বাক্সে কিংবা সাদা লাইটের ওপর লাল টেপ বা তারপাল দিয়ে মুড়িয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭. রেডিয়ো বা অডিয়ো: দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষমান থাকার মাঝে প্রিয় গান-বাজনা শোনার আনন্দ পুরাই আলাদা। বাসায় অডিয়ো প্লেয়ার থাকলে সেটি নিয়ে যেতে পারেন নাহলে রেডিয়ো, মোবাইলের আলো ঝামেলা করবে তাই দেখে নিতে নিরুৎসাহিত করব।

কোথা থেকে ও কিভাবে দেখবেন?

রাতের সবচেয়ে অন্ধকার জায়গাটি উল্কাবৃষ্টি দেখার জন্য উত্তম। গ্রামবাংলায় উঠান থেকে দেখা যেতে পারে। তবে আশেপাশে গাছপালা না থাকলে ভালো হয়। না হলে তা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। শহর হলে সবচেয়ে অন্ধকার জায়গাটি বেছে নিতে হবে। আর বিল্ডিং খুব কম বা নেই এমন জায়গা হতে দেখতে হবে। বিল্ডিং থেকে ভালোই দেখা যায় তবে, আশেপাশের অন্যান্য বিল্ডিংগুলো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। বিল্ডিং থেকে দেখলে সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং হতে দেখা উত্তম। আরো ভালো হয় যদি সমুদ্র সৈকত (যেমন : কক্সবাজার, পতেঙ্গা, সেইন্টমার্টিন) কিংবা পাহাড়ি অঞ্চল (যেমন: সাজেক) থেকে দেখা যায়। তবে শহর বা গ্রামে বাসা থেকে অনেক দূরে গেলে কাউকে সাথে নিয়ে যাওয়া উত্তম। অন্তত পক্ষে, আপনি ভুলে অসতর্ক হয়ে গেলেও উনি সতর্ক থাকতে পারেন। রাস্তা কিংবা রাস্তার আশেপাশে উপভোগের জন্য অবস্থান করা মোটেই উচিত নয়। আশেপাশে খোঁজ নিয়ে দেখুন কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞান ক্লাব বা শুধু বিজ্ঞান ক্লাব আছে কি না। এরা মাঝে মাঝে উল্কাবৃষ্টি উপভোগের জন্য ক্যাম্প করে। আর ক্যাম্প না করলেও অন্তত ভালো আঁধারের নিরাপদ স্থানের সন্ধান দিতে সক্ষম হবে। বড়ো বড়ো উল্কাবৃষ্টি দেখার জন্য অনেকেই বের হন। তাই আশেপাশে খোঁজ নিয়ে দেখলে অনেককেই পাবেন। এদের সাথে আপনার উল্কা দেখার আবেগ শেয়ার করতে পারেন। এতে করে আপনার সাথে একজন সাথীও জুটতে পারে। অন্ধাকারাচ্ছন্ন জায়গা নির্ধারনের জন্য ভালো সীমা হল +৫.০ ম্যাগনিটিউড[1] বা আপাত উজ্জ্বলতার তারা। যদি কোনো জায়গা থেকে +৫.০ ম্যাগনিটিউড - এর তারা দেখা যায় তাহলে সেই স্থান উল্কাবৃষ্টি দেখার জন্য উত্তম ধরা হয়। এক্ষেত্রে চোখে জোর দিয়ে তারাটিকে খোঁজার দরকার নেই। না হয় কিছু কম অনুজ্জ্বল উল্কার দেখা না মিলতে পারে। তবে আকাশের অবস্থা বা আপনার অবস্থান বেশি খারাপ হলে উল্কাবৃষ্টির কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলা ভালো, নাহলে শুধুই সময়ের অপচয় হবে। উল্কাবৃষ্টির সময় আপনাকে নির্দিষ্ট মণ্ডল বা রেডিয়েন্ট খুঁজে পেতে হবে। তাই একটি তারার মানচিত্র সাথে রাখা জরুরি। লাল লাইট দিয়ে আকাশের সাথে মানচিত্র মিলিয়ে রেডিয়েন্ট খুঁজে পাওয়া যায়। স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে বের করতে চাইলে অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে লাল বা রেড ফিল্টার ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সে সময়ে মোবাইল থেকে দূরে থাকাই ভালো।

কখন দেখবেন?

যে মণ্ডলে উল্কাবৃষ্টি হবে সে মণ্ডল উঠলেই উল্কা দেখা যায়। তবে রাত ১২টার পর উল্কাবৃষ্টি বেশি অ্যাক্টিভ হতে থাকে। এর কারণ, তখন মিটিয়রয়েডগুলো যেদিকে পৃথিবীর সাথে সংঘর্ষ করছে আমরা তখন সেদিকে অবস্থান করি। তবে রাত ৩টা বা এর পর হলে বেশি ভালো হয়। যেকোনো উল্কাবৃষ্টির ক্ষেত্রে রেডিয়ান্ট যত ওপরে উঠতে থাকে উল্কা দেখার সম্ভাবনাও তত বাড়তে থাকে। তবে সাধারণত ভোরের আলো হানা দেবার বা গোধূলির আগের কিছু ঘণ্টা উল্কাবৃষ্টি তুলনামূলক বেশি অ্যাক্টিভ হতে দেখা যায়। তাই আপনার হাতে যদি কম সময় থাকে তাহলে ভোরের আগের ১ঘণ্টা উল্কা দেখতে যেতে পারেন। তবে যদি কোনো উল্কাবৃষ্টির রেডিয়ান্ট ভোরের আগে বেশি নিচে অর্থাৎ দিগন্তের বেশি নিকটে নেমে আসে তাহলে মধ্যরাতের বেশ কিছুক্ষণ পর দেখতে যাওয়া উত্তম।

ফায়ার বল (অগ্নি গোলক), বোলাইড ও অন্যান্য.....

ফায়ার বল হলো একপ্রকার উল্কা যাদের ম্যাগনিটিউড বা প্রভা -৫.০০ হয়। অর্থাৎ এরা অনেক উজ্জ্বল হয়, প্রায় শুক্র গ্রহের মত। অনেক সময় এরা শুক্রের উজ্জ্বলতাকেও হার মানায়। এরা আবার অনেক রেয়ার কেইসে চাঁদের আলোর উজ্জ্বলতাকেও হার মানায়, এমনকি সকালে সূর্যের আলোতেও এদের দেখা যায়। এত উজ্জ্বলতার ফায়ার বল অনেক রেয়ার। ফায়ার বলের ক্ষেত্রে প্রাক-উল্কা বা মিটিয়রয়েডটি অন্যান্য মিটিয়রয়েড থেকে আকারে একটু বড়ো হয়। অনেকে মনে করেন এরা বুঝি অনেক বড়ো আকারের হয়। আসলে এরা ক্রিকেট বল আকারের উল্কা। অনেক দূর থেকেও এদের দেখা যায়। ফায়ার বল সচরাচর দেখা যায় না বা কমন না, তবে এরা রেয়ারও না। অনেক বড়ো বড়ো উল্কাবৃষ্টির সময় এদের দেখা যায়। জেমিনিডস, পারসিডিস, লিওনিডস, কোয়াড্রান্টিডিস ও লাইরিডস উল্কাবৃষ্টির সময় এদের দেখার সম্ভাবনা বেশি থাকে। গবেষণা করে দেখা যায়, ১,২০০টি উল্কার মধ্যে ১টি ফায়ার বল দেখা যায় যার উজ্জ্বলতা হয় -৫.০০ প্রভা এবং ১২,০০০টি উল্কার মধ্যে ১টি হয় -৮.০০ প্রভার। উল্কাবৃষ্টি বাদে বেশিরভাগ ফায়ার বল হানা দেয় সন্ধ্যার সময় বা তার একটু আগে, যখন অনেকেই বাহিরে কাজে ব্যস্ত থাকে। তবে দক্ষিণ-গোলার্ধে এর সংখ্যা একটু কম।

বিভিন্ন সময় নানান স্পেইস-ক্রাফট বা মানব প্রেরিত নানান স্যাটেলাইট বা এর টুকরো পৃথিবীতে উল্কার ন্যায় নেমে আসে। এরাও ফায়ার বলের মত উজ্জ্বল হয়। ফায়ার বল উল্কা থেকে একটু আস্তে ছুটে, মানে কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়। মাঝেমধ্যে ফায়ার বল উজ্জ্বল অবস্থায় ভেঙে যায়। এরা ভেঙে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে, এই ভাঙা অংশগুলিকে তখন বলা হয় বোলাইড। কিছু কিছু বোলাইড মাঝে মাঝে উল্কায় পরিণত হয়। বোলাইড ভেঙে একটি থেকে কয়েকটি উল্কার জন্ম দিতে পারে। ফায়ার বল ও বোলাইড দেখার ২-৩ সেকেণ্ড পর এদের শব্দ শোনা যায়।

কিছু শর্তমালা বা প্রভাবক.....

উল্কাবৃষ্টি বা উল্কা দেখা নানান বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন: রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলো কিংবা উঁচু বিল্ডিং-এ রাতে থাকা বাতিগুলো ইত্যাদি। এক কথায় লাইট পল্যুশনের মাত্রা। এটি বেশি হলে উল্কা দেখার মাত্রা কমে যায়। বন থেকে উল্কা দেখলে কিছু তুলনামূলক নিচের দিকের উল্কা দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই পাহাড়ি জায়গা ভালো। তবে তাই বলে পাহাড়ে যাওয়া আবশ্যক নয়। তবে সম্ভব হলে যাওয়া ভালো। চাঁদ থাকা অবস্থায় দেখতে বের না হওয়া ভালো। বিশেষ করে যখন চাঁদের অর্ধেক বা তার বেশি আলোকিত থাকে তখন দেখা উচিত নয়। এতে মোট যতটি উল্কা দেখা যেত তার ৯০% উল্কা দেখা যায় না। এক্ষেত্রে যদি উল্কাবৃষ্টি দেখেন তাহলে ২য় কম অ্যাক্টিভ দিন বা একেবারে শেষের দিনে সেই উল্কাবৃষ্টি দেখা ভালো। এতে চাঁদের আলো অনেকটাই কমে আসে।

অনেকসময় ধোঁয়া কিংবা কুয়াশাও আপনার ভাগ্যের অনেক উল্কা কেড়ে নেয়। আর আকাশ মেঘলা হলে তো কথাই নেই। সেদিনের উল্কা দেখা পুরোপুরি মাটি।

পাদটিকা:

১. ম্যাগনিটিউড বা আপাত উজ্জ্বলতা বা প্রভা : নক্ষত্রের আকার ছোটো বড়ো হবার কারণ হলো তার আপাত উজ্জ্বলতা বা প্রভা, তাই প্রভার মানদণ্ডের পরিসর আরো বাড়ানো হয়, মানে স্কেল ঋণাত্মক মানের দিকে যেতে শুরু করে। কোনো বস্তুর আপাত প্রভার মান যত কম তার উজ্জ্বলতা তত
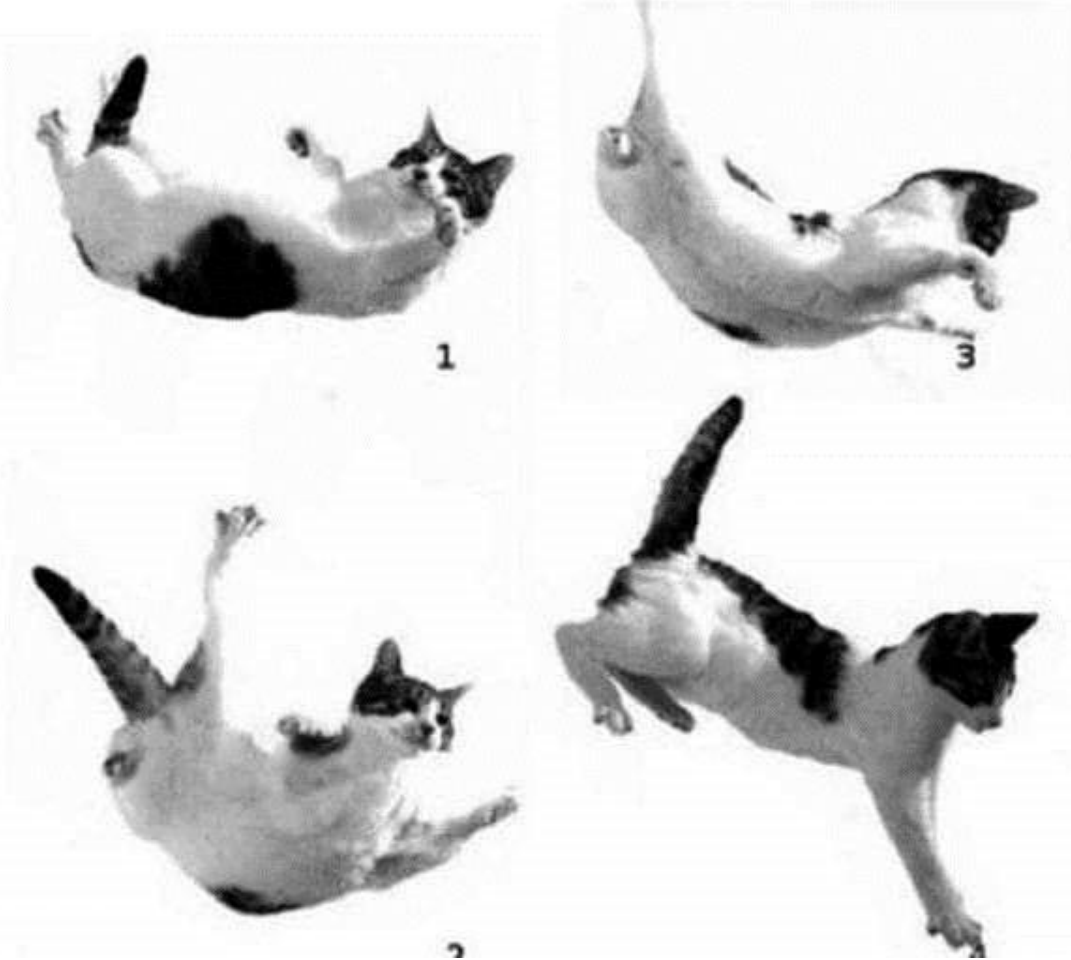
কেন বিড়ালের বেশি উঁচু থেকে পড়লেও কিছু হয় না?

স্বপ্নীল জয়ধর

কাল হঠাৎ আমি ছাদে ছোটোভাইয়ের সাথে লাফালাফি করার সময় দেখি একটা বিড়াল প্রায় দুইতলা বিল্ডিংয়ের ওপর থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নামার সাথে সাথে গা ঝাড়া দিয়ে দিব্যি হাঁটা শুরু করে। যেন তার কিছুই হয়নি। তখন তা দেখে আমার ছোটোভাই আমার কাছে এর কারণ জানতে চাইল। তখন আমি আমতা আমতা করছিলাম দেখে সে আমায় 'অকর্মার ঢেঁকি' বলে বাসায় চলে যায়। শুনে তো আমার মাথা গরম। তো আমি এরপর অনেকক্ষণ মোবাইল ঘাঁটাঘাঁটি করে এসম্পর্কে কতগুলো কথা নোট করলাম। তারপর ওকে বললাম:

"দেখ, তুই তখন কি দেখেছিলি বিড়ালটা কীভাবে নামল?"

"হ্যাঁ, অবাক করার মতো ব্যাপার; চার পায়ে নেমেছিল। এর আগেও এমন দৃশ্য অনেক দেখেছি। কিন্তু তখন অত গুরুত্ব দেইনি। মাথা নিচে থাকলে তো মাথা ভেঙে যাওয়ার কথা। কিন্তু মাথা নিচে থাকলেও কেমন যেন চার পায়েই মাটিতে ল্যান্ড করে! এর কারণটা কী?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি। তার আগে তোকে বিড়ালের কিছু সুবিধার কথা বলি। তোর মনে আছে আমার বন্ধু আবিরের বিড়াল 'টিনটিন' এর কথা?"

"হ্যাঁ। খুব মনে আছে। খুবই কিউট।"

"মাঝে মাঝেই আমার সন্দেহ হয় তুই ছেলে না মেয়ে না অন্যকিছু। [যাই হোক], তুই হয়তো খেয়াল করবি এর পা দুটো কেমন, একেবারে নরম। কার্পেটের মতো। এই পা গুলোর কারণে বিড়ালটা মাটিতে পড়ার সময় পড়ার ধাক্কাটা সহ্য করে। ফলে সে ব্যথা কম পায়।"

"ওহহ... এই ব্যাপার। আমার বোঝা উচিত ছিল। আর হ্যাঁ আমি যাই হই তাতে তোর কী?

একটু থেমে আবার বলল, "আচ্ছা যদি আমারও নরম পেশিযুক্ত পা থাকত তাহলে আমিও এইরকম উঁচু থেকে লাফালাফি করতে পারতাম?"

"আহারে! রাগ করছে ভাই আমার! আচ্ছা, শোন। তোর প্রশ্নের উত্তর একই সাথে হ্যাঁ আবার [নাও]। তুই পারবি তবে তারও একটা সীমা আছে। তুই বেশি ওপর থেকে লাফ দিলে তো নির্ঘাত গন্তব্য হবে হাসপাতাল। আবার শুনে রাখ এই করোনার সময় বেশিরভাগ হাসপাতালে তুই জায়গা পাবি না।"

এই পর্যন্ত বলে আমি তো হাসছি।

"তুই হাসি বন্ধ করবি! তার মানে বিড়ালের... আচ্ছা তুই তো বললি শুধু পায়ের নরম পেশি থাকায় বিড়ালের সুবিধার কথা। আমি একটা জিনিস খেয়াল করেছি, অনেকসময় বিড়াল যখন লাফ দেয় তখন মনে হয় যেন সে তার গা ফুলিয়ে ফেলে। নামার সময় পা ছড়িয়ে দেয়।"

"হ্যাঁ তোর অবজারভেশনটা সঠিক। আসলে এটাও বিড়ালের একটা সুবিধা। সে তার গা ফুলিয়ে নিজের আয়তন বাড়িয়ে নেয়। ফলে বাতাসের বাধা বেড়ে যায়। আবার ওই যে তুই বললি না নামার সময় পা ছড়িয়ে দেয়। এর ফলে বাতাসের বাধা আরও বেড়ে যায়। ফলে ল্যান্ডিং এ কোনো অসুবিধা হয় না। বুঝলি?"

"তা তো বুঝলাম কিন্তু চার পায়ে কীভাবে ল্যান্ড করে তাই তো বললি না!"

"আসলে প্রাচীনকালে তাদের পূর্বপুরুষরা নিজেদের শিকার হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য বা শিকার করার জন্য গাছের ডালে আশ্রয় নিত। কিন্তু কখনো কখনো বাতাসের তোড়ে বা কমজোর ডালে বসার কারণে তারা নিচে পড়ে যেত। এর ফলে আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে একটা ধারণা জন্মে কোনদিকটা ওপরে কোনদিকটা নিচে। এই ধারণাটাই তাদের অনেকটা নিচে পড়ার থেকে বাঁচায়। আর এই ধারণাটা বর্তমানে বিড়ালেরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। ওরা যখন নিচে পড়ে তখন ওদের ইন্দ্রিয় সক্রিয় হয়। ফলে ওরা নিচে পড়ার সময় দেহের নিচে পা গুলোকে রাখে এবং মাটির ওপরে অবতরণ করার জন্য তাদের দেহকে এবং লেজকে মোচড়ায়। এরপর তারা তাদের পা ছড়িয়ে দেয়, ফলে তাদের দেহের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল প্রসারিত হয়। যা অনেকটা প্যারাসুটের মতো কাজ করে বাতাসের বাধা বাড়ায়। এরপর ওরা ওদের পা নিচে রাখে যাতে মাটিতে পড়ার পর পা পড়ার ধাক্কা সহ্য করে নিতে পারে। ওই যে তোকে তখনই তো বললাম। মূলত এর কারণেই বুঝলি। এসব ক্ষমতা কি তোর আছে যে তুই হাল্কের মতো লাফ দিবি?"

"না....। যা বুঝছি। এবার ঘর থেকে যা। আমাকে পড়তে দে।"

এরপর কী করব বের হয় গেলাম। না হলে পড়তে বসার সময় ওকে ডিস্টার্ব করছি দেখে মা আমার কান মলে দেবে।

কেপলার এবং তার সূত্র

মুনতাসির রহমান নাবিল

জোহানেস কেপলার (১৫৭১-১৬৩০)। এই ব্যক্তির নাম শুনেনি এমন মানুষ হয়তো পাওয়া যাবে না। Kepler's law of Planetary motion এর জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞান জুড়ে বিখ্যাত হয়ে আছেন। যে তত্ত্ব জ্যোতির্বিজ্ঞানে নতুন দ্বার খুলে দিয়েছিল, সেই তত্ত্বের পেছনে ছিল এক ইতিহাস।

টাইকো ব্রাহের দ্বারা সংগৃহীত উপাত্ত ব্যবহার করে কেপলার গ্রহীয় গতির ধারণা পান। টাইকো ব্রাহের অধীনে কেপলার মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথ নিয়ে গবেষণা করার সময় law of Planetary motion সম্পর্কে ধারণা পান। যার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশিত হয় অ্যাস্ট্রোনোমিয়া নোভা নামক বইটিতে। যেখানে law of Planetary motion এর দুটি সূত্র বর্ণনা করেন। মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথের রূপ বারবার হিসেব করেন equant এর মাধ্যমে যদিও কোপার্নিকাস তার সৌরকেন্দ্রীক মডেলের মাধ্যমে equant কে বাতিল করে দিয়েছেন। পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের অপসূর ও অনুসূর পরিমাপের মাধ্যমে তিনি আবিষ্কার করেন যে, কোনো গ্রহের গতির হার সূর্য থেকে তার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। অনেক পরিমাপ করে পুরো কক্ষপথের জন্য এটি পরিমাপ করে এর সত্যতা যাচাই করেন। ১৬০২ সালে সূত্রটিকে জ্যামিতিক রূপ দেন, "গ্রহ ও সূর্যের সংযোজক সরলরেখা সমান সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে" যা কেপলারের ২য় সূত্র নামে পরিচিত।

প্রায় ৪০ বার ব্যর্থ হয়ে, অবশেষে ১৬০৫ সালে কেপলার এই সিদ্ধান্তে আসেন যে কক্ষপথের আকৃতি উপবৃত্তাকার। মঙ্গলের কক্ষপথ পরিমাপ করে কেপলার এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, সকল গ্রহ উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘোরে যেখানে সূর্য থাকে একটি ফোকাসে। ১৬১৯ সালে Harmonics Mundi রচনায় তার ৩য় সূত্র বর্ণনা করেন। যা কেপলার এর ৩য় গ্রহীয় গতির সূত্র নামে পরিচিত। গ্রহীয় গতির এই তত্ত্বের মাহাত্ম্য ১৬৬০ দশকের পূর্বে বোঝা যায়নি। কারণ এই দশকেই ক্রিস্টিয়ান হাওখেঁঞের নতুন centrifugal force সম্পর্কিত সূত্রের সাথে কেপলারের সূত্রকে মিলিয়ে আইজ্যাক নিউটন ও অ্যাডমন্ড হ্যালি প্রায় একই সময়ে দেখাতে সক্ষম হন যে, মহাকর্ষীয় আকর্ষণ সূর্য থেকে গ্রহের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। কেপলারের সূত্র তাৎক্ষণিক গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। গ্যালিলিও ও রেনে দেকার্তের মতো বিজ্ঞানীরা অ্যাস্ট্রোনোমিয়া নোভা এড়িয়ে যান। অনেক জ্যোতির্বিদ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কেপলারের তত্ত্ব পরীক্ষা করেন। সূর্যের সামনে বুধ ও শুক্র গ্রহের পরিক্রমণ তাঁর তত্ত্বের জন্য খুব ভালো পরীক্ষা হতে পারত। পিয়ের গাঁসেদি বুধ গ্রহের অতিক্রমণ পর্যবেক্ষণ করেন। টলেমি, কোপার্নিকাস, টাইকো ব্রাহে এদের প্ল্যানেট সিস্টেম ব্যর্থ হয়েছিল। আর তা থেকে কেপলারের নতুন অ্যাস্ট্রোনোমি শুরু।

কেপলারের সূত্রগুলি কোপার্নিকাসের মডেলটিকে উন্নত করেছিল। তবে গ্রহের কক্ষপথের eccentricity শূন্য হিসেবে নেয়া হলে (মনে করি), তাহলে কেপলার মূলত কোপার্নিকাস সঙ্গে একমত:

গ্রহের কক্ষপথ বৃত্তাকার।

কক্ষপথের কেন্দ্রস্থলে সূর্য।

কক্ষপথে গ্রহের গতি ধ্রুব

কেপলারের সংশোধনঃ

গ্রহের কক্ষপথ বৃত্তাকার নয় , এটি উপবৃত্তাকার।

সূর্য কেন্দ্রে অবস্থান করে না। এর অবস্থান একটি ফোকাল পয়েন্ট উপবৃত্তাকার কক্ষপথের।

কক্ষপথে গ্রহটির রৈখিক গতি বা কৌণিক গতি উভয়ই ধ্রুব নয়,

কেপলারের গ্রহীয় সূত্র তিনটি হলো-

১. গ্রহ ও সূর্যের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার। যেখানে সূর্য থাকে একটি ফোকাসে।

২. গ্রহ ও সূর্যের সংযোজক সরলরেখা সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে

৩. সূর্যের চারদিকে প্রতিটি গ্রহের অরবিটাল পিরিয়ড এর বর্গ এর কক্ষপথের সেমি মেজর এক্সিস এর ঘনফলের সমানুপাতিক।

এবার দেখি এই সূত্রগুলো দ্বারা কী বোঝায় -

Kepler's 1st law: এই থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, সূর্যের চারদিকের গ্রহগুলোর কক্ষপথগুলো বৃত্তাকার নয় বরং উপবৃত্তাকার। নিচের চিত্রে যেমন দেওয়া আছে, f ও S হলো উপবৃত্তের দুটি ফোকাল পয়েন্ট। যেখানে সূর্য হলো S ফোকাসে। এর কেন্দ্র C যেখানে major axis AA' ও minor axis BB' পরস্পরকে ছেদ করে।
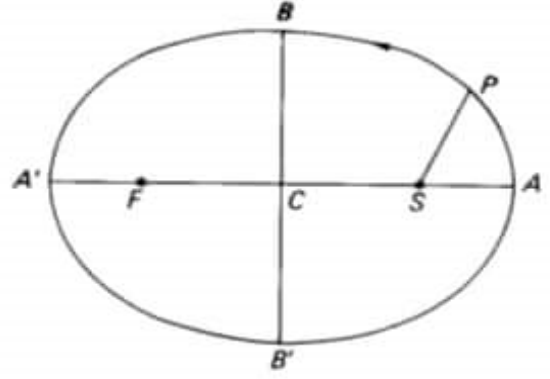
এখন AA' = 2a এবং BB'=2b হয় তাহলে, উপবৃত্তাকার কক্ষপথের eccentricity, $e = \sqrt{(1-b^2/a^2)}$.

প্রতিটি কক্ষপথের একটি নিজস্ব eccentricity থাকে। Eccentricity দ্বারা এটা বোঝায় কক্ষপথ কতটুকু প্রসারিত। a ও b এর মান সমান হলে e এর মান হবে 0 অর্থাৎ, এটি তখন বৃত্ত হবে। a এর মানকে ধ্রুব রেখে b এর মান কমাতে থাকা মানে উপবৃত্তকে তত চ্যাপটা করা।

হিসেব করলে দেখা যায়, e এর মান তত 1 এর কাছাকাছি যাবে। আবার b এর মান 0 হলে e এর মান 1। এখান থেকে এটাও বোঝা যায়, eccentricity যত 1 এর কাছে যাবে দুই ফোকাস পয়েন্ট তত দূরে যাবে, আর যত 0 এর কাছে যাবে দুই ফোকাস পয়েন্ট তত কাছে আসবে। আমাদের পৃথিবীর eccentricity হলো 0.0167086 (eccentricity এর কোনো একক নেই)। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে পৃথিবীর কক্ষপথ কতটুকু প্রসারিত। তাই মনে হয় সূর্য এই কক্ষপথের কেন্দ্রে অবস্থিত।

সূর্য থেকে গ্রহের সর্বোচ্চ দূরত্ব হলো এপিহেলিয়ন dis(ap) এবং সূর্য থেকে গ্রহের সর্বনিম্ন দূরত্ব হলো পেরিহেলিয়ন dis(peri)। আর এই দুই দূরত্বের যোগফল হলো major axis (2a)।

dis(ap)+dis(peri) = 2a

Kepler's 2nd Law: এই সূত্র থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব পাওয়া যায়, গ্রহ যখন সূর্যের কাছ দিয়ে যায় তখন বেগ বেশি থাকে আর যখন দূরে দিয়ে যায় তখন বেগ কম থাকে। যেহেতু কাছে থাকলে দূরত্ব বেশি অতিক্রম করলেও সময় একই থাকে।
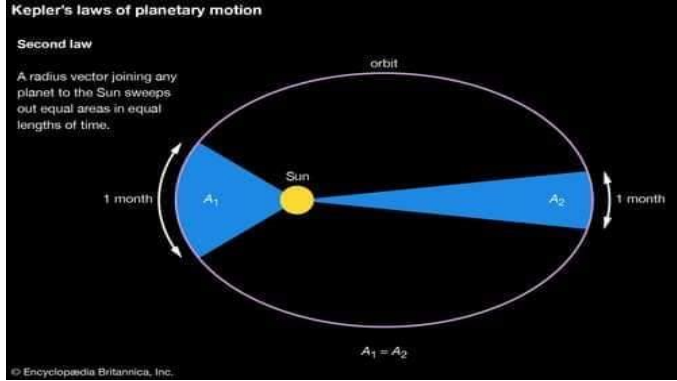
কেপলারের এই সূত্র থেকে আরেকটা সিদ্ধান্তে যাওয়া যায়,
উপরের চিত্রে, A_1 ক্ষেত্রফল অতিক্রমে যদি t_1 ও A_2 ক্ষেত্রফল অতিক্রমে যদি t_2 সময় লাগে তাহলে,

$A_1/t_1 = A_2/t_2 = \text{constant}$

Kepler's third law: এই সূত্রে কেপলার গ্রহের কক্ষপথের সেমিমেজর এক্সিস ও মোট কক্ষপথ অতিক্রান্তের সময়ের সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছেন। এই অতিক্রান্ত সময়কে বলে orbital period।

orbital period যদি T হয় আর semi-major axis যদি a হয়, কেপলারের সূত্র অনুসারে,

$T^2 = k \times a^3$

যেখানে k হলো ধ্রুবক।

এই ইকুয়েশনটা কাজ করবে যদি T এর একক হয় পৃথিবীর বছর, আর a এর একক হয় AU (Astronomical Unit)।

Astronomical Unit হলো সূর্য ও পৃথিবীর গড় দূরত্ব। অর্থাৎ,

$1\ \text{AU} = 1.496 \times 10^{11}\ \text{km}$

এখন k এর মান কত? পৃথিবীর ক্ষেত্রে চিন্তা করি। পৃথিবীর T হলো 1 year (365 days)। আর পৃথিবীর a হল 1 AU। কেন?

যেহেতু a = {dis(ap)+dis(peri)}/2

তাহলে k এর মান দাড়ায় 1।

এখন কেপলারের সূত্রের নিউটনীয় ভার্সন দেখব।

সূর্যের ভর যদি M, আর অন্য কোনো গ্রহের ভর যদি m হয় তাহলে,

মহাকর্ষ, $F_G = (GMm)/r^2$

আর গ্রহটি যে centripetal force পায় তা হলো, $F_C = (mv^2)/r$।

যেহেতু এই centripetal force হল gravitational force তাহলে আমরা বলতে পারি,

$F_G = F_C$

$GM/r = v^2$.....(1)

আবার, r ব্যাসার্ধের কক্ষপথটি অতিক্রম করতে T সময় লাগে তাহলে,

$v^2 = (4\pi^2 r^2)/T^2$.....(2)

(1) ও (2) হতে পাই,

$GM = (4\pi^2 r^3)/T^2$

$T^2 = (4\pi^2 r^3)/GM$ (এক্ষেত্রে T এর একক সেকেন্ডে, r বা a এর একক মিটারে)।

কক্ষপথ যখন উপবৃত্ত হয় r এর পরিবর্তে a লিখতে হয়। মূলত এটাই কিন্তু কেপলারের সূত্র,

T^2 সমানুপাতিক a^3।

কেপলারকে নিয়ে কিছু কথা-

গ্রহের গতির সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেন তিনিই প্রথমে, এরপরে, celestial mechanics এর প্রতিষ্ঠাতা।

টেলিস্কোপ কীভাবে কাজ করে তাঁর নীতিগুলি ব্যাখ্যা করেন।

তাঁর বই স্টেরিওমেট্রিকা ডেলিওরিয়াম অখণ্ড ক্যালকুলাসের ভিত্তি তৈরি করেছিল।

প্রথমে ব্যাখ্যা করেন যে জোয়ার-ভাটা চাঁদের কারণে ঘটে (গ্যালিলিও এটির জন্য তাকে তিরস্কার করেছিলেন)।

তারার দূরত্ব পরিমাপ করতে পৃথিবীর কক্ষপথ দ্বারা সৃষ্ট স্টেলার প্যারাল্যাক্স ব্যবহার করার চেষ্টা করা; গভীরতা উপলব্ধি হিসেবে একই নীতি। আজ গবেষণার এই শাখাটিকে জ্যোতির্বিদ্যা বলা হয়।

বাংলা ক্যালেন্ডারের ইতিকথা

জাভেদ ইকবাল

বাংলা ক্যালেন্ডারের জন্মের ইতিহাসটা অবশ্য বেশ বৈজ্ঞানিক; একটা নতুন ক্যালেন্ডার বানানো সহজ ব্যাপার না। এখানে সেই ইতিহাসটাই লেখার চেষ্টা করেছি।

আমরা জানি যে প্রতি বছর রোজার শুরু বা দুই ঈদ ইংরেজি ক্যালেন্ডারের একই দিনে হয় না- আগের বছরের চাইতে ১০ বা ১১ দিন এগিয়ে আসে। আপনি কি জানেন, পহেলা বৈশাখ আর বাংলা ক্যালেন্ডারের জন্ম সেই কারণেই?

মোগল সাম্রাজ্যে বছর শুরু হতো হিজরি সন বা ইসলামিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। কিন্তু দেখা গেল, সেটা একটা বিশাল ঝামেলা করছে রাষ্ট্র পরিচালনায়। মানুষের কাছ থেকে সরকার এখনকার মতো তখনও খাজনা বা ট্যাক্স আদায় করত। ফসল ওঠার ঠিক পর পর সেই খাজনা পাওয়া সহজ, কারণ কৃষকের হাতে টাকা থাকে। ছয় মাস পরে গেলে তার কাছে আর টাকা থাকে না। মাঠে কখন ধান আসে, সেটা নির্ভর করে ঋতুর ওপর, যা নির্ভর করে সূর্যের ওপর। এদিকে হিজরি সন চাঁদ-ভিত্তিক; এই বছর হিজরির যেই তারিখে ট্যাক্স দেওয়ার দিন, পরের বছর সূর্যের হিসেবে সেটা ১০ দিন এগিয়ে যাবে।

কেন পিছিয়ে যায়? চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে প্রায় ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ২.৮ সেকেন্ড বা ২৯.৫৩০৫৯ দিন। ১২ মাসে মোট ১২×২৯.৫৩০৫৯ = ৩৫৪.৩৬৭ দিন। আর সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর একবার ঘুরে আসতে লাগে প্রায় ৩৬৫ দিন। তার মানে এক চান্দ্র বছর (হিজরি ক্যালেন্ডার) আর এক সৌর বছরের (ইংরেজি বা বাংলা ক্যালেন্ডার) মধ্যে প্রায় সাড়ে দশ দিন (১০.৬) তফাৎ হয়ে যায়। তাই ঈদ আগাতে থাকে, খাজনা তোলার দিনও আগাতে থাকে।

অর্থাৎ আজকে যদি ফসল তোলার দিন হয়, ৯ বছর পরে দেখা যাবে, হিজরি ক্যালেন্ডারে তারিখ একই আছে, কিন্তু ফসল পাকতে এখনো ৯০ দিন বা তিন

মাস বাকি। কৃষকের হাতে টাকা নেই, খাজনা তুলতে গিয়ে তখন তাকে শূলে চড়িয়েও লাভ হচ্ছে না, টাকাও পাওয়া যাচ্ছে না। (আপনি হয়তো ভাবতে পারেন, কেন টাকা জমিয়ে রাখতো না? হাড়-জিরজিরে, দিন আনি দিন খাই কৃষকের হাতে জমিয়ে রাখার মতো টাকা তখনও ছিল না, এখনও নেই)।

এই সব ঝামেলার সমাধান করার জন্য আকবর ১৫৮৪ ইংরেজি সালে তাঁর রাজসভার জ্যোতির্বিদ ফতেউল্লাহ সিরাজীকে নির্দেশ দিলেন, একটা নতুন সন-তারিখের পদ্ধতি তৈরি করতে।

ফতেউল্লাহ সিরাজী চমৎকার একটা সমাধান দিলেন। হিজরি সন, তৎকালীন ভারতীয় ক্যালেন্ডার (সৌর সিদ্ধান্ত নামের একটা সংস্কৃত জ্যোতির্বিদ্যার বই অনুসারে) আর আকবরের সিংহাসনে আরোহনের বছর, এই তিনটাকে মিলিয়ে তিনি একটি নতুন সন তৈরি করলেন। আকবরের প্রবর্তিত ধর্ম দ্বীন-এ-এলাহি-র সাথে মিলিয়ে এই ক্যালেন্ডারের নাম দেওয়া হলো তারিখ-এ-এলাহি। (Historical Dictionary of the Bengalis, Kunal Chakrabarti and Shubhra Chakrabarti)। কিন্তু Land of Two Rivers: A History of Bengal from the Mahabharata to Mujib এ লেখক Nitish K. Sengupta বলেছেন, এই ক্যালেন্ডারের উৎপত্তি আকবরের অন্তত ৫০ বছর আগে, আলাউদ্দিন হুসেইন শাহ-এর আমলে, সিরাজী শুধু সেটাকে আরো প্রাঞ্জল করেছেন।

পদ্ধতিটা বেশ সহজ। নতুন সন গণনা শুরু হলো হিজরি সনের সাথেই; অর্থাৎ প্রথম হিজরি সন = প্রথম তারিখ-এ-এলাহি সন; ২য় হিজরি সন = ২য় তারিখ-এ- এলাহি সন, ইত্যাদি করে ৯৬৩ হিজরি সন = ৯৬৩ তারিখ-এ-এলাহি সন। এই ৯৬৩ হিজরি বা তারিখ-এ- এলাহি হচ্ছে ১৫৫৬ ইংরেজি সন, আকবরের সিংহাসনে আরোহনের বছর, এবং হিজরি বছরের মতোই এই ৯৬৩ তারিখ-এ-এলাহি চন্দ্র মাসের সাথে হিসেব করা হলো। কিন্তু ১৫৫৬ ইংরেজি সন, বা ৯৬৩ হিজরি বা ৯৬৩ তারিখ-এ-এলাহি থেকে তারিখ-এ-এলাহি আর চাঁদের সাথে নয়, সূর্যের সাথে গণনা করা শুরু হলো। অর্থাৎ যদিও ৯৬৪ হিজরি আগের মতোই ৩৫৪ দিনে হলো, ৯৬৪ তারিখ-এ-এলাহি হলো ইংরেজি বছরের মতোই ৩৬৫ দিনে।

ফসল ওঠার সাথে সাথেই তারিখ-এ-এলাহির নতুন বছরে মুগল সুবেদাররা খাজনা আদায় করলেন। কৃষকের ওপরে আর চাবুক পড়ল না, এবং বাংলার কৃষকদের কাছে সেই জন্য তারিখ-এ-এলাহির বদলে এই নতুন বছর “ফসলি সন” হিসেবে পরিচিতি পায়, এবং এটা বাংলায় সরকারি ক্যালেন্ডার হয়ে যায় এভাবেই।

সিরাজী মাসের নাম হিসেবে ফার্সি ক্যালেন্ডার থেকে নাম ব্যবহার করেছিলেন তারিখ-এ-এলাহিতেঃ ফারোয়াদিন, আর্দি, ভিহিসু, খোরদাদ, তির, আমারদাদ, শাহরিয়ার, আবান, আযুর, দাই, বহম এবং ইস্কন্দার মিজ। বাঙালির জিভে সেগুলো পোষালো না, তাই অচিরেই নক্ষত্রগুলোর সংস্কৃত নাম অনুসারে বাংলা মাসের নামকরণ হয়ে গেলঃ

বিশাখা (Librae) থেকে বৈশাখ

জ্যৈষ্ঠা (Scorpii) থেকে জ্যৈষ্ঠ

আষাঢ়া (Sagittarii) থেকে আষাঢ়
শ্রাবণা (Aquilae) থেকে শ্রাবণ
ভাদ্রপাদা (Pegasi) থেকে ভাদ্র
আশ্বিনী (Arietis) থেকে আশ্বিন
কৃত্তিকা (Tauri) থেকে কার্তিক
পুস্যা (Aldebaran) থেকে পৌষ
আগ্রেহনী (Cancri) থেকে অগ্রহায়ণ
মাঘা (Regulus) থেকে মাঘ
ফাল্গুনী (Leonis) থেকে ফাল্গুন
চিত্রা (Virginis) থেকে চৈত্র।

(কোনো কোনো সূত্র অনুযায়ী আকবরের ক্যালেন্ডারের মাসের প্রতিটি দিনের আলাদা নাম ছিল, কিন্তু সেটা বিশাল ঝামেলা লাগাত। তাই সম্রাট শাহজাহানের সময় ইংরেজি ক্যালেন্ডারের মতো সপ্তাহের প্রচলন করা হয় এবং মানুষের মাত্র ৭টা দিনের নাম মুখস্ত করা লাগে)

তারপরেও একটা প্যাঁচ থেকেই গেল। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘুরে আসতে সময় আসলে লাগে ৩৬৫ দিনের একটু বেশি... ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড। সুতরাং ৩৬৫ দিনে বছর হিসেব করলে প্রতি চার বছরে ৪×(৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড)=২৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের মতো বাদ পড়ে যায়। প্রতি ১০০ বছরে তাহলে প্রায় ২৪ দিন হারিয়ে যাবে। এটাকে ঠিক রাখার জন্য তাই প্রতি চার বছরে এক দিন যোগ করা হয়, তাই আমরা ইংরেজি ক্যালেন্ডারে লিপ দিন পাই। (২৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের বদলে ২৪ ঘণ্টা যোগ করা হচ্ছে প্রতি চার বছরে, তার মানে আমরা ৪৫ মিনিটের হিসেবে গোঁজা-মিল দিয়ে দিচ্ছি প্রতি চার বছরে একবার। অর্থাৎ ৩২ লিপ দিন বা ১২৮ বছরে আবার এক দিন বাড়তি হয়ে যাবে। এখন পর্যন্ত এটা ইংরেজি ক্যালেন্ডারে কোনো ঝামেলা করে নি, আমরা শুধু হজম করে নিচ্ছি। কিন্তু ১২৮০ বছরে এটা ১০ দিনের ঝামেলা পাকাবে। সম্ভবত তার আগেই এটা ঠিক করার জন্য একটা বিশেষ দিন বিয়োগ করে নেয়া হবে)।

বাংলা বছরে লিপ দিনের কোনো হিসেব ছিল না, তাই আবার বাংলা তারিখ পিছিয়ে পড়ার একটা সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই বিচ্যুতি ঠিক করার জন্য বাংলা একাডেমি ১৯৬৬ সালে ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ'র নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে, যা বাংলা ক্যালেন্ডারের জন্য এই লিপ দিবসের বিচ্যুতি ঠিক করে। কমিটির প্রস্তাব ছিলঃ

- বছরের প্রথম পাঁচটি মাস, বৈশাখ থেকে ভাদ্র, হবে ৩১ দিনে (১৫৫ দিন)।
- বছরের বাকি সাতটি মাস, আশ্বিন থেকে চৈত্র, গঠিত হবে ৩০ দিনে (২১০ দিন)।
- মোট ৩৬৫ দিন।
- বছর শুরু হবে ইংরেজি (গ্রেগরিয়ান) ক্যালেন্ডারের ১৪ এপ্রিল, এবং ইংরেজি ক্যালেন্ডারের প্রতি লিপ দিন বছরের ফাল্গুন মাসে অতিরিক্ত একটি দিন যোগ হবে, ঠিক যেভাবে ফেব্রুয়ারিতে যোগ হয়।

বাংলাদেশে ১৯৮৭ সাল থেকে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, তাই আমাদের পহেলা বৈশাখ ১৯৮৭ সাল থেকে ১৪ এপ্রিলেই পড়ে। ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, ত্রিপুরা আর আসামে প্রচলিত বাংলা ক্যালেন্ডারে এখনো চাঁদ-সূর্যের অবস্থান দেখে বছরের শুরু নির্ধারণ করা হয়,

তাই ওদের পহেলা বৈশাখ মাঝে মাঝে ১৪ এপ্রিল, মাঝে মাঝে ১৫ এপ্রিলে পড়ে।
২০১৫ ইংরেজি সালে বাংলা একাডেমি এটার আরো পরিবর্তন করেছে।
বাংলাদেশে নতুন বর্ষপঞ্জিকা অনুযায়ী এখন থেকে বাংলা বছরের প্রথম ছয় মাস ৩১ দিনে হবে।
এর আগে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র-বছরের প্রথম এই পাঁচ মাস ৩১ দিন গণনা করা হতো।
এখন ফাল্গুন মাস ছাড়া অন্য পাঁচ মাস ৩০ দিনে পালন করা হবে।
ফাল্গুন মাস হবে ২৯ দিনের, কেবল লিপদিনের বছর ফাল্গুন ৩০ দিনের মাস হবে।

তাহলে এটা কত বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ? হিসেবটা মুখে মুখে না করতে পারলেও কাগজ কলমে করা কঠিন না। ১৫৫৬ ইংরেজি সন ছিল ৯৬৩ বঙ্গাব্দ। ২০২০ থেকে ১৫৫৬ বাদ দিলে হয় ৪৬৪। অর্থাৎ ৯৬৩ বঙ্গাব্দ থেকে আরো ৪৬৪ বছর পার হয়েছে, সুতরাং এটা ৯৬৩ + ৪৬৪ = ১৪২৭ বঙ্গাব্দ। যদি সহজ ফর্মুলা চান, তাহলে (বর্তমান ইংরেজি বছর – ১৫৫৬) + ৯৬৩ = বাংলা সন।
যদি আরো সহজে বের করতে চান, তাহলে, প্রথমে ইংরেজি বছর থেকে ৬০০ বিয়োগ করুন, তারপর সেই ফলাফলের সাথে ৭ যোগ করুন।

কিন্তু যদি ১ হিজরি = ১ তারিখ-এ-এলাহি বা বাংলা সন হয়ে থাকে, তাহলে এই বছর কেন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ কিন্তু ১৪৪১ হিজরি? উত্তরটা ওপরে বলা আছে... ৯৬৩ বঙ্গাব্দ-র পর থেকে হিজরি চন্দ্র মাসেই চলতে থাকল, কিন্তু বঙ্গাব্দ হয়ে গেল সৌর মাসে, অর্থাৎ প্রতি বছরে ইংরেজি ক্যালেন্ডারের মতোই বঙ্গাব্দ ১০.৬ দিন করে পিছিয়ে পড়তে থাকল হিজরি থেকে। ওপরে আমরা দেখলাম যে ৪৬৩ বছর পার হয়েছে। বছরে ১০.৬ দিন করে পেছালে ৪৬৩ বছরে ৪৯০৭.৮ দিন পিছিয়েছে বঙ্গাব্দ। তার সাথে যোগ হবে এই ৪৬৩ বছরের আরো ১১২ লিপ দিবস। এই মোট ৫০১৯ দিনের জন্যই প্রায় ১৪ বছরের তফাৎ হয়ে গিয়েছে হিজরি আর বঙ্গাব্দের।

তাই পহেলা বৈশাখে ইলিশ খেয়ে ইলিশের বংশ লোপ না করে বরং মোগলাই খাওয়া, যেমন কাবাব খেতে পারেন। ইচ্ছা হলে সেটা না হয় পান্তা দিয়েই খান। বেচারা ইলিশরাও বড়ো হতে পারবে, আপনিও প্রায় সাড়ে চারশো বছরের ঐতিহ্য বজায় রাখতে পারবেন।

তারিখ-এ-এলাহির আগে কি ভারতবর্ষে কোনো ক্যালেন্ডার ছিল না? অবশ্যই ছিল। ভারতবর্ষে গণিত আর জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাস হাজার হাজার বছরের পুরানো। এই লেখায় মোটেও বলা হচ্ছে না যে আকবরের ক্যালেন্ডারই প্রথম ভারতীয় বা বাংলা ক্যালেন্ডার। আকবরের অন্তত ৫০০ বছর আগে শকাব্দ নামে আরেকটা বর্ষ গণনার পদ্ধতি ছিল। সিরাজী সৌর সিদ্ধান্ত নামে যে বই ব্যবহার করেছেন, সেটা আরো পুরানো। এখানে শুধু আমরা বর্তমানে যে ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২০১৯ খৃষ্টাব্দে বাংলা ১৪২৬ সাল হয়, সেটার উৎপত্তি নিয়ে কথা বলেছি।
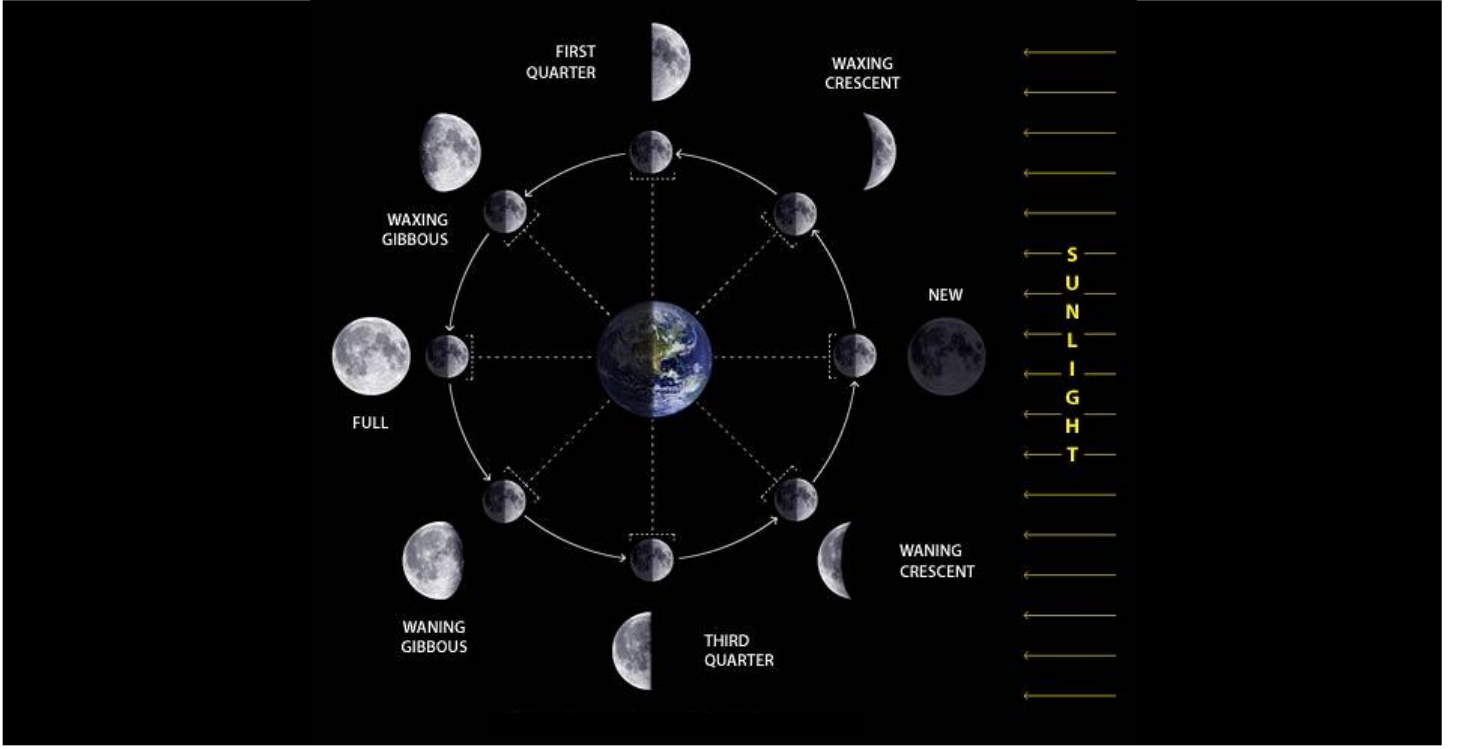
চন্দ্রকলা

ইফতেখার আহমেদ

অমাবস্যার (New Moon) পরের দিন চাঁদ সরু কাস্তের মতো পশ্চিম আকাশের নিচে দেখা দেয়। একে দ্বিতীয়ার চাঁদ বলে। তার পরে সে দিনে দিনে বড়ো হতে থাকে। এভাবে পূর্ণিমার (Full Moon) দিন ঠিক গোল হয়ে দাঁড়ায়। অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত এই সময়কালকে বলা হয় শুক্লপক্ষ (Waxing Phase)। এর পরেই কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হয়। কৃষ্ণপক্ষের আরম্ভ হতে চাঁদ একটু একটু করে প্রতিদিন ক্ষয় পেতে শুরু করে। প্রায় পনেরো দিন পরে অর্থাৎ অমাবস্যায় চাঁদকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। পূর্ণিমার পর থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত এই সময়কালকে বলে কৃষ্ণপক্ষ (Waning Phase).

এখন আমরা দেখে নিই, ঠিক কী কারণে চাঁদের এই ক্ষয়-বৃদ্ধি হয়। নিচের ছবিটা একটু খেয়াল করি:

চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে গোলাকার (প্রায়) পথে ঘুরে। তাই এক্ষেত্রে পৃথিবীকে ছবির মাঝখানে রাখা হয়েছে। পৃথিবীর চারিদিকে চাঁদের বিভিন্ন সময়ের ছবি দেওয়া হয়েছে। যেহেতু চাঁদের ভ্রমণ পথের ভিতরে সূর্য নেই, সেহেতু আলোর উৎস

হিসেবে সূর্য ছবির বাইরে আছে বলে ধরে নেয়া হয়েছে। সূর্যের আলো চাঁদের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে কীভাবে চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি করে, চিত্রের সাহায্যে আমরা তা বুঝতে পারব।
চাঁদ যখন ছবির এক নম্বর জায়গায় থাকে তখন চাঁদ প্রায় পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে অবস্থান করে। কাজেই চাঁদের যে পিঠে সূর্যের আলো পড়ে তাকে পৃথিবী থেকে দেখা যায় না। পৃথিবী থেকে চাঁদের অন্ধকার দিকটাই দেখা যায়। এ অবস্থায় আমরা চাঁদকে একেবারে দেখতে পাই না। এরই নাম অমাবস্যা।
তারপর চাঁদ যখন অগ্রসর হয়ে দুই নম্বর জায়গায় এসে দাঁড়ায় তখন তার যে অংশে সূর্যের আলো পড়ে, তার অতি সামান্য অংশ পৃথিবী হতে দেখা যায়। এটা হলো দ্বিতীয়া তৃতীয়ার চাঁদ (Waxing Crescent)। এর আকৃতি তখন সরু কাস্তের মতো।

এরপর চাঁদ যখন পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে ছবির তিন নম্বর জায়গায় (First Quarter) আসে, তখন চাঁদের আলোকিত অংশের অর্ধেক মাত্র আমরা পৃথিবী থেকে দেখতে পাই।মজার ব্যাপার হলো, চাঁদ গোলাকার হলেও অর্ধচন্দ্র কিন্তু কাস্তে সদৃশ নয়। বরং এটি ইংরেজি D বর্ণের মতো। ঠিক কীভাবে এটা হয়, তা বুঝার জন্য আমরা অন্ধকার ঘরে একটি টর্চলাইট ও একটি টেনিসবল দিয়ে পরীক্ষাটি করতে পারি। যখন আলোর উৎস, দর্শক ও টেনিস বলটির অবস্থান এমন হবে যে তা দর্শককে কেন্দ্র করে একটি সমকোণ তৈরি করে, তখন টেনিসবলের আলোকিত অংশটি দর্শক সাপেক্ষে D এর মতো দেখা যাবে।
তারপর চার নম্বর জায়গায় (Waxing Gibbous) আসলে চাঁদের আলোকিত অংশের প্রায় চার ভাগের তিন ভাগই আমাদের নজরে পড়ে এবং শেষে পাঁচ নম্বর জায়গায় চাঁদকে আমরা সম্পূর্ণ গোল দেখতে আরম্ভ করি। এই অবস্থায় পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্যের মাঝে থাকে। কাজেই চাঁদের যে অংশ সূর্যের আলো পায়, তার সবটাই আমরা দেখতে পাই। এটাই পূর্ণিমার চাঁদ।
পূর্ণিমার পরে চাঁদ যতই ছয় (Waning Gibbous) , সাত (Third Quarter) ও আট (Waning Crescent) নম্বর জায়গায় যেতে থাকে, তার আলোকিত অংশ ততই আমাদের আড়ালে চলে যায়। এই সময়টাতেই চাঁদের ক্ষয় হয়। তারপর আট নম্বর জায়গা ছেড়ে আবার এক নম্বর জায়গায় আসলে চাঁদ একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় অর্থাৎ আবার অমাবস্যা হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, চাঁদ যে সময়ে পৃথিবীকে একবার ঘুরে আসে সেই সময়ে অমাবস্যা হতে পূর্ণিমা এবং পূর্ণিমা হতে আবার অমাবস্যা হয়।
এখানে দুটি কথা না বললেই নয়। প্রথমত, চাঁদের ক্ষয়-বৃদ্ধির পেছনে পৃথিবীর ছায়ার কোনো ভূমিকাই নেই। কেবলমাত্র চন্দ্রগ্রহণ পৃথিবীর ছায়ার কারণে হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর যেমন অর্ধাংশ সবসময় সূর্যের দ্বারা আলোকিত হয়ে থাকে, চাঁদেরও তেমনি অর্ধাংশ সবসময়ই সূর্যের দ্বারা আলোকিত থাকে। নিচের চিত্রটি ব্যাপারটি বুঝতে সাহায্য করবেঃ

চাঁদ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টাইডাল লকিং দ্বারা আবদ্ধ হয়ে এর চারপাশে প্রদক্ষিণ করে, যার ফলে পৃথিবী থেকে সব সময় চাঁদের একটি পার্শ্বই দেখা যায়। চাঁদের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে এর দৃশ্যমান পাশ বিভিন্নভাবে সূর্য দ্বারা আলোকিত হয়। এই আলোকিত অংশের পরিমাণ ০% (অমাবস্যা) থেকে ১০০% (পূর্ণিমা) পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়। আমরা জানি, চাঁদের পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে সাতাশ দিন আট ঘণ্টা। আবার চাঁদ তার নিজ কক্ষে এক পাক খেতে সমান সময় নেয়। এরই নাম টাইডাল লকিং। এজন্যই চাঁদের একদিক সর্বদা পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকে। অন্য কথায়, চাঁদের সেই দিক যা পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকে সেখান থেকে দেখলে পৃথিবী সবসময় এক জায়গায় থাকবে, কিন্তু সূর্য ও অন্যান্য তারাসমূহকে আকাশের এক পাশ থেকে আরেক পাশে সরে যেতে দেখা যাবে।
অমাবস্যার দুই দিন পরে যখন কাস্তের মতো সরু চাঁদ পশ্চিম আকাশের গায়ে দেখা দেয়, তখন আমরা যদি ভালো করে চাঁদটিকে দেখি, তবে স্পষ্ট সমস্ত চাঁদকেই দেখতে পাব। সেই সময়ে কাস্তের মতো অংশটা খুব উজ্জ্বল থাকে, অবশিষ্ট অংশে আবছায়া রকমের এক রকম আলো দেখা যায়। ঐ আবছায়া আলো দ্বিতীয়া, তৃতীয়া এবং চতুর্থী পর্যন্ত সুস্পষ্ট

দেখা যায়। পঞ্চমী,ষষ্ঠী তিথিতে চাঁদ যখন বেশ বড়ো হয়ে যায়, তখন ঐ আব্‌ছায়া আলো দেখা যায় না।

কাস্তের মতো অংশটা কেন এত উজ্জ্বল তা আমরা জানি। কিন্তু বাকি অংশে এই আবছায়া আলো কোথা থেকে আসে?

চাঁদের নিজের আলো নেই। ধার করা আলোতেই সে আলোকিত, এ কথা আমরা জানি। কাজেই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, দ্বিতীয়া,তৃতীয়ার যে আবছায়া আলোতে চাঁদের অন্ধকার অংশের যে আবছায়া আলো নজরে পড়ে, তাও চাঁদের নিজের আলো নয়। তবে কার আলো? এ হলো চাঁদের ওপরকার জ্যোৎস্নার আলো। চাঁদ যেমন আমাদের পৃথিবীতে জ্যোৎস্না দেয়, পৃথিবী তেমনি চাঁদের ওপরে ঐরূপ জ্যোৎস্না দেয়।

চাঁদের ওপরে গিয়ে দাঁড়ালে এবং সেখান থেকে পৃথিবীকে দেখলে, পৃথিবীকে একটা খুব বড়ো চাঁদের মতোই দেখা যায়। অমাবস্যার দিন বা তার দু-তিন দিন পরে চাঁদের অন্ধকার দিকটায় থাকলে, পৃথিবীকে পূর্ণিমার চাঁদের মতো প্রায় সম্পূর্ণ গোলাকার দেখা যাবে। তথন পৃথিবীর আলো ঠিকরে গিয়ে চাঁদের অন্ধকার অংশে জ্যোৎস্নার মতো পড়বে। ষষ্ঠী,সপ্তমীর চাঁদের অন্ধকার অংশেও পৃথিবীর জ্যোৎস্না পড়ে, কিন্তু তখন চাঁদের উজ্জ্বল অংশের আলোটা এত বেশি হয় যে, তার অন্ধকার অংশে পৃথিবীর জ্যোৎস্না পড়লেও তা নজরে পড়ে না। অন্ধকার ঘরে একটা মাটির প্রদীপ জ্বালালেও তাকে খুব উজ্জ্বল দেখায়, কিন্তু যে ঘরে ইলেক্ট্রিক আলো জ্বলছে, সেখানে ঐ প্রদীপ জ্বালালে তার আলো চোখেই পড়ে না। এখানেও ব্যাপারটা ঠিক সেরকম। চাঁদে পৃথিবী যে জ্যোৎস্না দেয় তার আলো পৃথিবীর জ্যোৎস্নার প্রায় তেরো গুণ। সুতরাং, চাঁদে জ্যোৎস্না উঠলে বেশি অন্ধকার থাকে না।

এক অমাবস্যার পর আর এক অমাবস্যা হতে প্রায় সাড়ে ঊনত্রিশ দিন সময় লাগে। তাহলে আমরা বলতে পারি, পৃথিবীর সূর্যকে ঘুরে আসতে যেমন ৩৬৫ দিন সময় লাগে, চাঁদও সেই রকম পৃথিবীকে ঘুরতে সাড়ে ঊনত্রিশ দিন সময় নেয় (২৯.৫৩ দিন)। একে সিনোডিক (Synodic) মাস বলে। কিন্তু জ্যোতির্বিদেরা খুব ভালো হিসেব করে দেখেছেন, অমাবস্যা সাড়ে ঊনত্রিশ দিন পর হলেও, চাঁদ পৃথিবীকে ঘুরে আসে সাতাশ দিন আট ঘণ্টায়।

অবশ্যই প্রশ্ন আসে কেন এরকম হলো?, তার কারণ, যখন চাঁদ পৃথিবীকে ঘুরতে থাকে তখন পৃথিবী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার জন্য নির্দিষ্ট পথে চলতে থাকে। চাঁদের গতি এবং পৃথিবীর এই গতি মিলে পূর্ণিমা ও অমাবস্যার সময়গুলাকে একটু একটু লম্বা করে দেয়। আমরা যদি সৌরজগতের অন্য কোনো জায়গা থেকে সময় পরিমাপ করতাম, তবে আমরা দেখতে পেতাম, যে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে চাঁদের ঠিক সাতাশ দিন আট ঘণ্টাই লাগছে। একে Sidereal বা Orbital Period বলে।

এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে, চাঁদেও কি পৃথিবীর মতো সূর্যোদয় / সূর্যাস্ত হয়? যেহেতু, চাঁদ-পৃথিবীর সম্মিলিত এই প্রদক্ষিণ ব্যবস্থা সূর্যকে কেন্দ্র করে, সেহেতু, চাঁদের আকাশে সূর্যের একই জায়গায় ফিরে আসতে সময় লাগে সাড়ে ঊনত্রিশ দিন, যা কিনা একটা চন্দ্রমাসের সমান। সুতরাং, যাদের কোনো অংশে সূর্যালোক পাওয়া যায় সাড়ে ঊনত্রিশ দিনের প্রায় অর্ধেক সময়, যা পৃথিবীর হিসেবে প্রায় দুই সপ্তাহ।

বহুকাল আগে থেকে মানুষ সময় নিরূপণ করার ক্ষেত্রে, চাঁদের গতিপ্রকৃতি ভিত্তিক বর্ষ-গণন পদ্ধতি অনুসরণ করা শুরু করেছিল। চন্দ্র-কেন্দ্রীক এই বর্ষ-গণন পদ্ধতিই চান্দ্র-বছর নামে অভিহিত হয়ে থাকে। প্রকৃত চান্দ্র পঞ্জিকা ব্যাপকভাবে অনুসরণ করেন ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। ইসলামি এই পঞ্জিকার নাম হিজরি।

সৌর বছর সাধারণভাবে গণনা করা হয় ৩৬৫ দিনে। পক্ষান্তরে চান্দ্র বছর হয় ৩৫৫ দিনে। ফলে প্রতি চান্দ্র বছরের সাথে সৌরবছরের ১০ দিনের পার্থক্য হয়। তিন বছরে এই পার্থক্যের পরিমাণ হয় ৩০ দিন। এই কারণে ভারতের বৈদিকযুগে প্রতি তিন বছর অন্তর অতিরিক্ত একটি বাড়তি মাস যুক্ত করে চান্দ্র বছরের সাথে সৌর বছরের সমন্বয় করা হতো।
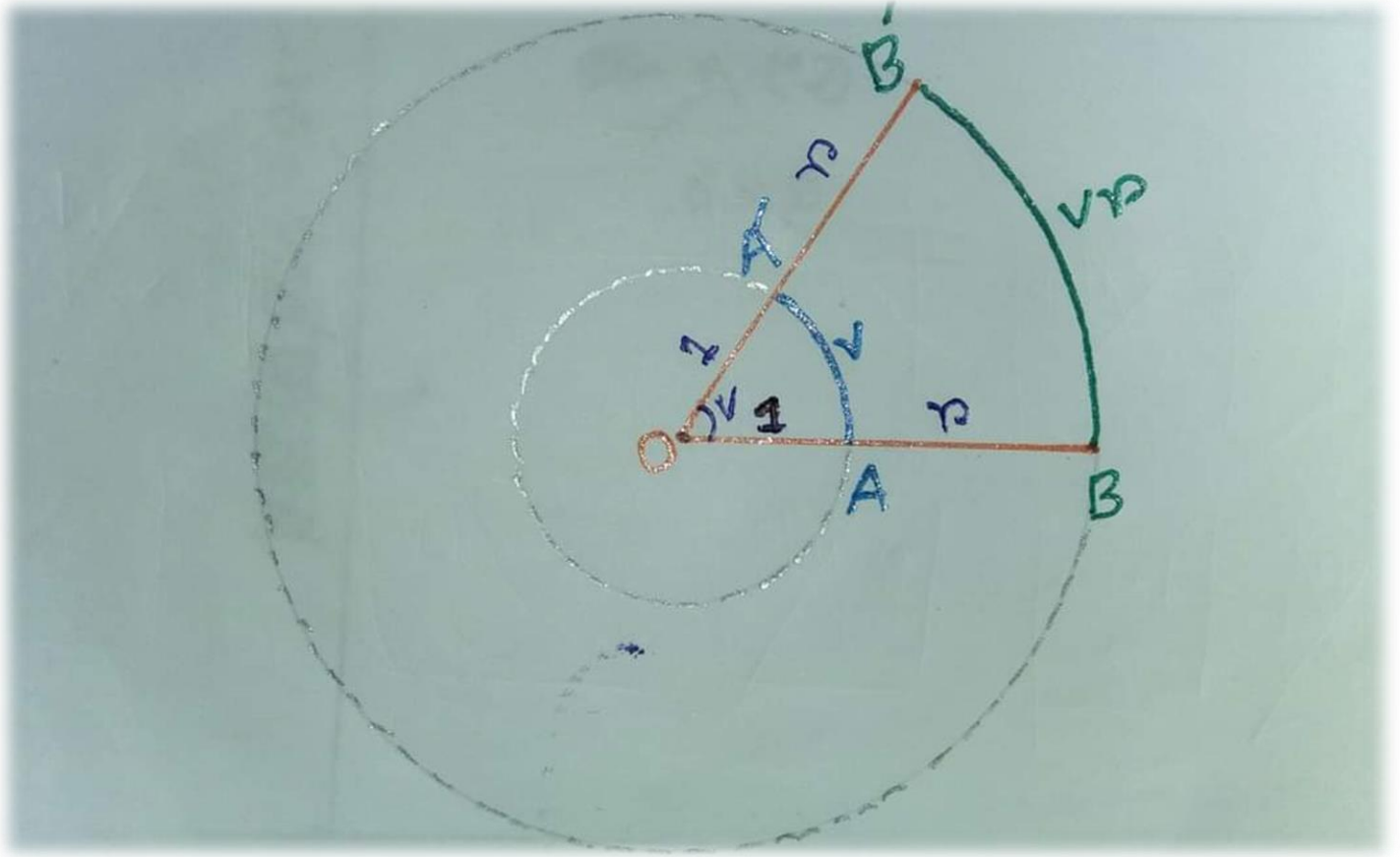
কৌণিক ভরবেগ

হাসিবুর রশিদ

কৌণিক ভরবেগ সম্পর্কে জানার আগে আমাদের বুঝে আসতে হবে যে ভরবেগ জিনিসটা কী, এই রাশি দিয়ে আমরা কী বুঝি, এই ভরবেগের সংজ্ঞা কী আর ভরবেগ জিনিসটা কীভাবে ফিল করি।

ভরবেগের সংজ্ঞার কথা যদি বলি তাহলে সেটা আসলে খুবই সাদামাটা।

ভর ও বেগের গুণফলকে ভরবেগ বলে।

তাহলে এখানে আসলে আমরা ভরবেগ দিয়ে কী বুঝি? ভরবেগ দিয়ে আসলে আমরা বুঝতে পারি কোনো বস্তু গতি থেকে বাধাপ্রাপ্ত হলে ঠিক কত জোরে আঘাত করবে। ভরবেগ সমান এমন সকল বস্তুই বাধাপ্রাপ্ত হলে একই এককে আঘাত করবে। একই পরিমাণ ড্যামেজ করবে।

কত জোরে আঘাত করে এটা বুঝার জন্য শুধু বেগ বললে হবে না। একই বেগের কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভরের বস্তু ভিন্ন ভিন্ন

এককে আঘাত করবে। একই বেগের বস্তুদের মধ্যে যার ভর বেশি সে অবশ্যই বেশি জোরে আঘাত করে। বাস্তবে আমরা সেটাই দেখতে পাই। আবার শুধু ভর বলে দিলেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না যে সেই বস্তু কত জোরে আঘাত করবে। দুটি একই ভরের বস্তু যদি কোনো দেওয়ালকে আঘাত করে তাহলে তারা কিন্তু একই এককে আঘাত করবে না যদি বেগ সমান না হয়। একই ভরের বস্তুদের মধ্যে যার বেগ বেশি সে অবশ্যই দেওয়ালকে বেশি জোরে আঘাত করবে। এ ঘটনাকে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি।

তাহলে শুধু বেগ বা ভর না, দুটোই একই সাথে জানা থাকলে আমরা বুঝতে পারব যে সেই বস্তু কত জোরে আঘাত করবে। তাই রৈখিক ভরবেগকে ভর আর বেগের গুণফল দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

এবার কৌণিক ভরবেগের কথায় আসি।

ঘূর্ণনরত কোনো বস্তুকণার ব্যাসার্ধ ভেক্টর ও রৈখিক ভরবেগের ভেক্টর ক্রস গুণফলকে কৌণিক ভরবেগ বলে।

আপাতত আমরা এই সংজ্ঞা ভুলে যাই। কারণ এই সংজ্ঞা দিয়ে আসলে কৌণিক ভরবেগ নির্ণয় করা যায় তবে ফিল করা যায় না। আগে কৌণিক ভরবেগ জিনিসটা ফিল করে নিই। তারপর এই সংজ্ঞায় আবার ফিরে আসব।

রৈখিক ভরবেগের ক্ষেত্রে যেহেতু রৈখিক বেগ আর ভরের গুণফল দ্বারা রৈখিক ভরবেগকে প্রকাশ করা হতো তাই কৌণিক ভরবেগের ক্ষেত্রে অনেকের মনে হতে পারে যে কৌণিক বেগ আর ভরের গুণফল দিয়ে হয়তো কৌণিক ভরবেগ প্রকাশ করা হয়। আসলে কিন্তু তা নয়। ভরবেগ বলতে আমরা বুঝতাম কোনো বস্তু কত জোরে আঘাত করবে। তাহলে কৌণিক ভরবেগ দ্বারাও অবশ্যই আমরা তা-ই বুঝব। তবে সেটা হবে কৌণিক বেগের জন্য অর্থাৎ কৌণিক বেগে গতিশীল কোনো বস্তু বাধাপ্রাপ্ত হলে ঠিক কত জোরে আঘাত করবে।

আচ্ছা, সেটা বুঝার জন্য একটু নিচের চিত্রটা দেখতে হবে।

চিত্রে দেখা যাচ্ছে O বিন্দু কে কেন্দ্র করে ঘূর্ণনরত দুইটি বস্তুকণা। একটা হলো A কেন্দ্র O থেকে যার দূরত্ব 1 অপর বস্তুকণাটি হল B কেন্দ্র O থেকে যার দূরত্ব r অর্থাৎ A যে বৃত্তের পরিধি বরাবর ঘুরছে তার ব্যাসার্ধ 1 আর B যে বৃত্তের পরিধি বরাবর ঘুরছে তার ব্যাসার্ধ r, উভয় বস্তুকণার ভর m

A' ও B' হলো A ও B এর 1 সেকেন্ড পরের অবস্থা। তাহলে A বস্তুর রৈখিক বেগ হলো AA' বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য। যেহেতু v=s/t=AA'/1=AA' তাহলে আমরা লিখতে পারি। AA'=v

তাহলে A বস্তুকণার ভরবেগ কত? অবশ্যই mv আবার A বস্তুকণা যেহেতু কৌণিক বেগে গতিশীল তাই এই কৌণিক ভরবেগও mv।

এবার v বৃত্তচাপের জন্য কেন্দ্রে উৎপন্ন হওয়া কোণটাও কষ্ট করে বের করি। পরে কাজে লাগবে।

theta=s/r=v/1=v ⇨theta=v অর্থাৎ A বস্তকণার কৌণিক বেগও v।

এবার B বস্তুকণার কাছে আসি। B' হলো B এর এক সেকেন্ড পরের অবস্থা তাহলে অনুরূপ ভাবে BB' বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্যই হলো B বস্তুকণার রৈখিক বেগ। তাহলে BB' বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য= r*theta =r*v

অর্থাৎ B বস্তুকণার রৈখিক বেগ দাঁড়াচ্ছে rmv।

যেহেতু B বস্তুকণা কৌণিক বেগে গতিশীল তাই এই ভরবেগই হচ্ছে B বস্তুকণার কৌণিক ভরবেগ L=rmv।

এবার কৌণিক ভরবেগের সংজ্ঞায় ফেরা যায়।

সেখানে বলা ছিল ঘূর্ণনরত কোনো বস্তুকণার ব্যাসার্ধ ভেক্টর(r ভেক্টর) ও তার রৈখিক ভরবেগের ভেক্টর (mv ভেক্টর) এর গুণফলকে কৌণিক ভরবেগ বলে। তাহলে মোটের ওপর দাঁড়ায় L=rmv (cross product)।

সংজ্ঞায় আমাদের মতো প্রত্যেক বিন্দুর জন্য আলাদা করে বেগ নির্ণয় করেনি। সব বিন্দুর বেগ v ধরেই করেছে। ফাইনালি r বা কেন্দ্র থেকে দূরত্ব দিয়ে গুণ দেওয়ায় যে-কোনো বিন্দুর বেগ নির্ণয় হয়ে যাচ্ছে।

আরেকটা কথা এখানে ভেক্টরের ক্রস গুণনের কথা বলা হয়েছে। ক্রস গুণন এসেছে কারণ বস্তুকণার গতি ব্যাসের সাথে সমকোণে থাকলে তবেই সেটা ধরা হবে। অন্যথায় সমকোণে উপাংশে নেওয়া হবে। ভেক্টর ক্লিয়ার থাকলে এটা খুব সহজেই বুঝে যাওয়া উচিত।

রৈখিক ভরবেগ দিয়ে আমরা যেমন বল বের করতে পারতাম, কৌণিক ভরবেগ দিয়ে তেমনি টর্ক নির্ণয় করতে পারি। এটা নিজেরা করে দেখা যায়।
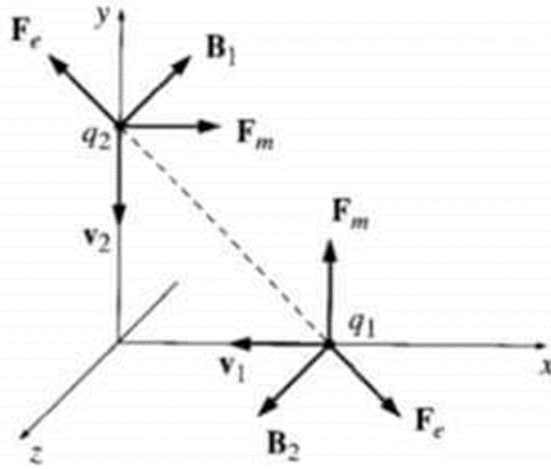
Violation of Newton's Third Law

স্বপ্নীল আচার্য্য

আমাদের নবন শ্রেণী থেকেই নিউটনের গতিসূত্রের সাথে পরিচয় হয়। নিউটনের সূত্রগুলোর মধ্যে তৃতীয় সূত্রটা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। সেটা মোটামুটি আমরা সবাই কমবেশি জানি। আচ্ছা এমন কি হতে পারে- নিউটনের এই থার্ড ল কাজ করছে না? একটা ক্রিয়ার বিপরীত দিকে তার প্রতিক্রিয়া নেই? নিউটনের সূত্র কি ভায়োলেট হতে পারে?

হ্যাঁ,পারে। সেটা নিয়েই আজকের আর্টিকেল। ইলেক্ট্রোডায়নামিক্সে নিউটনের থার্ড ল ভায়োলেট হতে পারে। এই আর্টিকেলটা একটু দুর্বোধ্য হতে পারে। তবে একটু চিন্তা করলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এটা পড়ার আগে দুটো জিনিস সম্পর্কে জানলে ভালো হয়। দুটো ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট আর বায়ো স্যাভার্ট ল। তবে, বায়ো স্যাভার্ট ম্যান্ডেটরি না। তবে, ক্রস প্রোডাক্ট বুঝতেই হবে। আরেকটা ইম্পোর্ট্যান্ট বিষয়, তল ব্যাপারটা বোঝা।

এখন দেখা যাক ব্যাপারটা। ধরি, xy তলে x অক্ষ বরাবর নেগেটিভ দিকে +q1 চার্জ v বেগে যাচ্ছে। আবার,আরেকটা +q2 চার্জ y অক্ষ বরাবর নেগেটিভ দিকে একই v বেগে যাচ্ছে।
এখন,

q1 থেকে q2 এর সরাসরি দূরত্ব ভেক্টর,r12 =-i+j
ভেক্টরের ত্রিভুজ সূত্র অ্যাপ্লাই করেছি। আর কিছু না। আর আমরা শুধু দিক নিয়ে কাজ করছি এখানে।

একইভাবে,
q2 থেকে q1 এর সরাসরি দূরত্ব ভেক্টর লিখতে পারি,r21=-j+i

এখন,
গতিশীল q1 চার্জের কারণে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড সৃষ্টি হবে। সেটার দিক হবে,বেগ এবং r12 এর ক্রস প্রোডাক্টের দিকের ওপর। কারণটা হলো-বায়ো স্যাভার্ট সূত্র থেকে জানা যায়,

q1 চার্জের দরুন সৃষ্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড,
B1 এর দিক=(-i)×r12 বেগের দিক × দূরত্ব ভেক্টর
=(-i)×(-i+j)
=(-i×-i)+(-i×j)
=o+j×i
=-k

তার মানে, q1 চার্জের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর দিক -k বরাবর। যাদের এই অন্ধ ম্যাথটা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে,তারা নবম-দশম শ্রেণির বইয়ের ডানহাতি নিয়ম ব্যবহার করতে পারবেন। দিকটা যদি আরও ক্লিয়ারলি বোঝাতে চাই তাহলে, যেহেতু ক্লকওয়াইজ ঘূর্ণন, তাই xy তলের নিচের দিকে।

তাহলে,
গতিশীল q2 চার্জের জন্য সৃষ্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড,
B2 এর দিক =(-j)×(-j+i)
=(-j×-j)+(-j×i)
=0+(i×j)
=k
আগেরটার ব্যাখ্যা বুঝে থাকলে এটারটাও বুঝবেন আশা করি। ডান হাতের, বাম হাতের নিয়ম দিয়েও বের করতে পারবেন। দিকটা xy তলের ওপরের দিকে।

এখন,ব্যাপারটা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ুন:
q1 এর জন্য সৃষ্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড B1 এর জন্য q2 চার্জ একটা ম্যাগনেটিক ফোর্স F21 অনুভব করবে। কেউ ব্যাপারটা না জানলে লরেন্টজ ফর্মুলা নিয়ে পড়তে পারেন। F = q(v×B) এই ফর্মুলা থেকে পাওয়া যায় সেটার দিক হবে বেগের দিক এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর দিকের ক্রস প্রোডাক্টের দিকের ওপর।

তাহলে,F21 এর দিক,
=(-j)×(-k)
=i
তারমানে, q1 চার্জের ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর জন্য q2 চার্জ বল অনুভব করবে i মানে x অক্ষ বরাবর। এটা না বুঝলেও স্ক্রু নিয়ম, ডানহাতি, বামহাতি তিন আঙুলের নিয়ম।
যেভাবে খুশি সেভাবে বের করতে পারবেন।

একইভাবে,
q2 চার্জের কারণে সৃষ্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর কারণে q1 চার্জ ম্যাগনেটিক ফোর্স F12 ফিল করবে।
F12 এর দিক,
=(-i)×(k)
=k×i
=j

এটাই হাজারটা নিয়মে বের করতে পারবেন। তার মানে, q2 চার্জের ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর জন্য q1 চার্জ বল অনুভব করবে j মানে y অক্ষ বরাবর।

এখন, ধরি,
দুটো চার্জের মান সমান। q1=q2
তাদের বেগের মানও সমান।
সেই অনুয়ায়ী B1 এবং B2 এর মানও সমান।
তাহলে,|F12|=|F21|
তার মানে, দুটো চার্জের একে অপরের ওপর প্রযুক্ত চৌম্বক বলের মান সমান। ক্লিয়ার এতটুকু?

এখন,আমরা সবাই জানি,নিউটনের থার্ড ল এর বিবৃতিটা এরকম-
"প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।"
মানে, A জিনিস যদি B জিনিসকে F বল দেয়। তাহলে, B জিনিসও A জিনিসকে F বল দেবে ।আর দুটো বলের দিক হবে সম্পূর্ণ বিপরীত।

এখন,ওপরের চার্জের কাহিনীতে কী দেখা যায়? দুটো চার্জ একে অপরকে ম্যাগনেটিক ফোর্স দিচ্ছে। দুটো ফোর্সেরই মান সমান হচ্ছে। কিন্তু দিক কি আসলে বিপরীত? q2 চার্জ q1 এর জন্য বল পাচ্ছে x অক্ষ বরাবর। আর q1 চার্জ q2 এর জন্য বল পাচ্ছে y অক্ষ বরাবর। তার মানে কী? এখানে দুটো বল মোটেও বিপরীত না। একটা আরেকটার ওপর লম্ব। এখানেই ঘটে গেল এক আধিভৌতিক কাহিনী; নিউটনের থার্ড ল এর ভায়োলেশন।

তার মানে কী? সমকোণে গতিশীল দুটো চার্জের পারস্পরিক চৌম্বক বল নিউটনের তৃতীয় সূত্রকে মানে না।

হিসাব মিললো কি?
আসলেই কি এই জায়গায় থার্ড ল খাটে না? আমি তো কোনো ভুল করিনি। কী হতো যদি q1 আর q2 সমান না হতো? থার্ড ল এর জেনারালাইজড রূপ কি কিছু নেই? সেটা কি এখানে খাটবে না? রকেটে যেমন খাটে।

Oh! Be A Fine Girl- Kiss Me

মাশরুর মুহিত

সিসিলিয়া পেইন। একজন নারী জ্যোতির্বিদ। 1925 সালে তিনি প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞানে পিএইচডি অর্জন করেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ডে গবেষণার জন্য আসেন। ফাউলার ও মিলনির পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি দেখলেন যে নক্ষত্ররাজির হার্ভার্ড ক্রম প্রকৃতপক্ষে তাপমাত্রার ক্রম। তাঁর থিসিস পেপারে তিনি এসব বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। তাঁর থিসিস পেপার-"Stellar Atmospheres; a Contribution to the Observational Study of High Temperature in the Reversing Layers of Stars." অনেকের মতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে এর চেয়ে ভালো থিসিস পেপার আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি।

হার্ভার্ড ক্রম হচ্ছে নক্ষত্রগুলোকে বিভিন্ন স্পেক্ট্রাল লাইনের (বর্ণালি) ভিত্তিতে ক্যাটাগোরাইজ্ড করা একটি ক্রম।

এটি প্রথম তৈরি করেন আরেক নারী জ্যোতির্বিজ্ঞানী এনি জাম্প ক্যানন ১৯২৪ সালে। এই ক্রম থেকে কোনো নক্ষত্রের অনেক বৈশিষ্ট্য
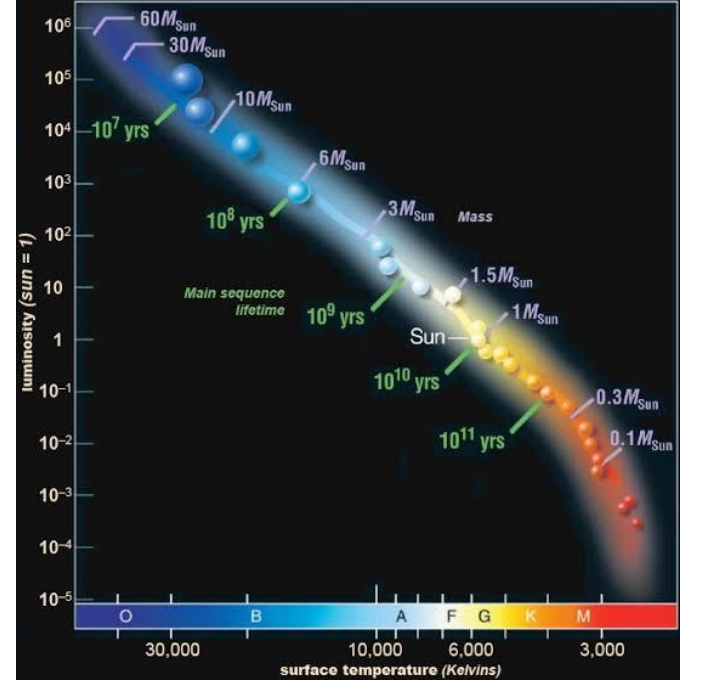
জানা যাবে। এই ক্রমে O B A F G K M - এই অক্ষরগুলো দিয়ে সমস্ত নক্ষত্রের শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। O,B,A,F,G,K,M প্রতিটি শ্রেণি আবার 0-9, এই দশটি উপশ্রেণিতে বিভক্ত। H-R ডায়াগ্রামের x-axis বরাবর তাকালেই তুমি এই অক্ষরগুলো লক্ষ করবে। H-R ডায়াগ্রাম এর পূর্ণরূপ হের্টস্স্প্রুং-রাসেল ডায়াগ্রাম। এর অপর নাম Colour-Magnitude diagram(CMD)। যদি বলতে হয় এটা দিয়ে কী হয়, তবে এক বাক্যে বললে বলতে হয়, এটা দিয়ে একটি তারার অনেক বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়, তারাটির অবস্থান ডায়াগ্রামের

কোথায় এটা দেখেই তাপমাত্রা, ঔজ্জ্বল্য, ভর; মোট কথায় এদের জীবনচক্র সম্বন্ধে জানা যায়।

হার্ভার্ড শ্রেণি ক্রম মনে রাখার অনেক টেকনিক আছে। যেমন-

Oh! Be A Fine Girl- Kiss Me.

/ / / / / / /

O B A F G K M

O সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রার তারা, এরকম করে B থেকে M এ তাপমাত্রা কমতে কমতে M শ্রেণির তারারা সবচেয়ে কম তাপমাত্রার হয়।

তাপমাত্রার সাথে আবার কালার পরিবর্তন হয়।

তাপমাত্রা যত বেশি রং তত নীলের দিকে যায় আর তাপমাত্রা কম হলে লালের দিকে। আমাদের সূর্য G শ্রেণির। অর্থাৎ সূর্য নীল আর লালের মধ্যে লালের কাছাকাছি, তাই এটি হলদেটে।

ভালোভাবে বলতে হলে,আমাদের সূর্য G2V। আসুন দেখি এটি কী বোঝাচ্ছে।

O-M এর পর 0-9 থাকবে। এরপর যেটা থাকবে সেটি বোঝায় তারাটির ঔজ্জ্বল্য কেমন, এটি দানব তারা নাকি বামন তারা, সেটি।

V দ্বারা বোঝায় এটি বামন তারা (Dwarf Star)।

সুতরাং G2V বোঝায় এই নক্ষত্র অর্থাৎ আমাদের সূর্য একটি Yellow Dwarf Star.

ক্যানন ছিলেন বধির। ১৯০১ সাল থেকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণাগারে (The Harvard Observatory) ৭ জন মহিলা বিজ্ঞানী তৎকালীন আরেকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড চার্লস পিকারিং এর অধীনে সূর্য – নক্ষত্রের গতিবিধি নিয়ে কাজ করছিলেন। এর মধ্যে প্রধান ছিলেন বিজ্ঞানী ক্যানন। পরে এই দলের সাথে যোগ দেন সিসিলিয়া পেইন। এনি ক্যানন ছিলেন সিসিলিয়ার গুরু। এই দলের কাজ ছিল পিকারিং এর কাজের হিসাব নিকাশ করা। এসব বিজ্ঞানী এতই ব্রিলিয়ান্ট ছিলেন যে এঁদের অনেকেই রিসার্চ পেপার পাবলিশ করেন। পরে ক্যালকুলেটর থেকে এঁরা হয়ে যান কম্পিউটার। এঁদেরকে সম্মানের সাথে বলা হয় হার্ভার্ড কম্পিউটারস। তখন এমন ধারণা ছিল যে, মেয়েরা বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করার যোগ্য নয়। এই নারী জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দলকে ব্যঙ্গার্থে কতিপয় পুরুষ বিজ্ঞানী বলত “পিকারিং’স হারেম”। কিন্তু বিজ্ঞানের সিসিলিয়া ও ক্যানন এর মতো অজানা তারাদের জ্ঞান মহিমায় আমরা আজকে দূরের তারাদের জানতে পারছি। প্রণাম তব চরণে।
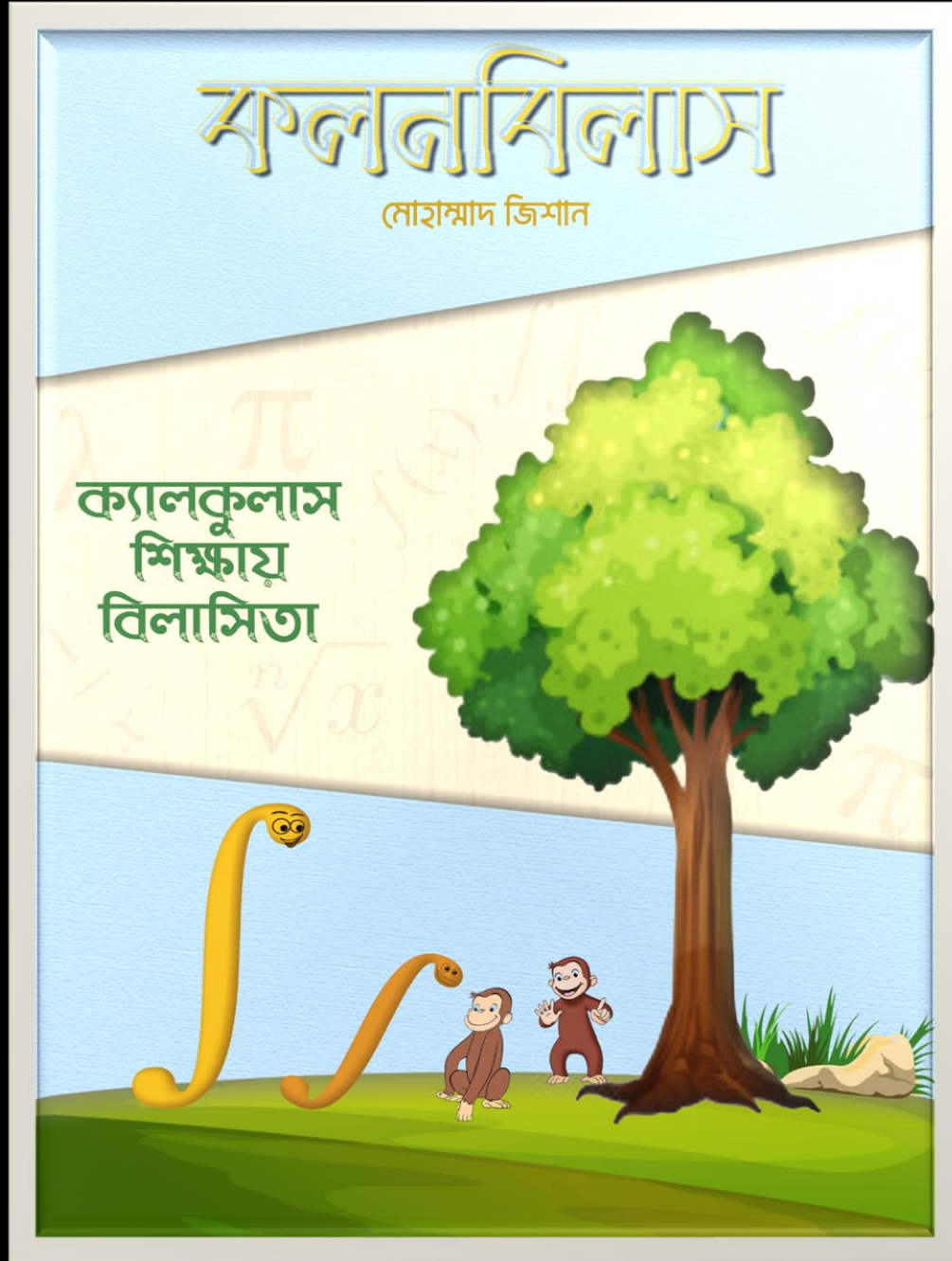
কলনবিলাস
মোহাম্মাদ জিশান
ক্যালকুলাস
শিক্ষায়
বিলাসিতা

ধূমকেতুতে অবতরণ

মাশরুর মুহিত

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!

-কাজী নজরুল ইসলাম ('ধূমকেতু',১৯২২)

ধূমকেতু পৃথিবীর আকাশে অতিথি। কালেভদ্রে দেখা যায় এদের আমাদের চৌকাঠে। এদের নিয়ে কতই না জল্পনা কল্পনা। এর যে বেয়াড়া ছেলের ঝাঁকড়া চুলের মতো লেজ সেটা নিয়ে মানুষের কী অসীম কৌতুহলই না ছিল। শেষমেশ কিনা এই মহাজাগতিক অতিথির নামই দিয়ে দিল 'ঝাঁকড়া-চুলো'। ধূমকেতুর ইংরেজি comet যা কিনা গ্রিক শব্দ kometes থেকে উদ্ভুত । আর গ্রিক kometes অর্থ ঝাঁকড়া-চুলো । ধূমকেতু নিয়ে কৌতুহল বিজ্ঞানীদের বরাবরই। এমনকি পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তির অনেকগুলো মডেলের মধ্যেও আছে 'ধূমকেতু দিয়ে বয়ে আনা বহির্জাগতিক কোনো অ্যামিনো এসিড(প্রোটিনের মূল উপাদান)-ই হয়তো প্রাণ সূচনা করে এই আমাদের গ্রহে আবার ধারণা করা হয় পৃথিবীর এতো পানিও হয়তো ধূমকেতুদেরই অবদান'। তাই ধূমকেতুকে জানা প্রয়োজন। ধূমকেতুর রাসায়নিক গঠন, তার পানির গঠন ইত্যাদি।

এর জন্যই প্রয়োজন 'ধূমকেতু'তে নেমে পর্যবেক্ষণ করা।

সাল ২০০৪।

এর আগে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে পিছিয়ে গেছে রকেট নিক্ষেপণ। অবশেষে মার্চের ২ তারিখে ইউরোপিয়ান স্পেইস এজেন্সি(ESA) এর ফ্রান্সের গুয়েনা স্পেইস সেন্টার থেকে

সফল ভাবে নিক্ষেপ করা হয় Ariane 5 রকেট। রকেটে পাঠানো হয় রোজেটা নামক স্পেইসপ্রোব। লক্ষ্য একটি ধূমকেতু।

Rosetta নিক্ষেপণ করা হয় যে ধূমকেতুটিকে পর্যবেক্ষণের জন্য তার নাম চুরিউমভা-গেরাসিমেঙ্কো (Churyumov-Gerasimenko)। ধূমকেতুটির এরকম নামকরণ করা হয় ১৯৬৯ সালে এই ধূমকেতুটির আবিষ্কর্তাগণ দুই রুশ জ্যোতির্বিদের নামে। এই ধূমকেতুটিকে ছোটো করে ডাকতে চাইলে বলতে পারেন 67P.

এটি একটি স্বল্পমেয়াদি ধূমকেতু। যেসকল ধূমকেতু সূর্যকে একটি ফোকাসে রেখে স্বল্প পর্যায়কালে প্রদক্ষিণ করে তাদেরকে স্বল্পমেয়াদি ধূমকেতু বলে। সাধারণত এদের পর্যায়কাল ২০ বছরের কম। ধূমকেতু 67P একটি স্বল্পমেয়াদি ধূমকেতু, এর পর্যায়কাল ৬.৫৯ বছর।

রোজেটা(Rosetta) শুধু একা যায়নি, সাথে করে নিয়ে গিয়েছে ল্যান্ডার 'ফাইলি' (Philae). ফাইলির মাতৃযান রোজেটা এটিকে ১০ বছর বহন করেছিল নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত। এদের নামের দিকে তাকান। এদের নামকরণটা বেশ ইন্টারেস্টিং। ESA এই মিশনের প্রায় প্রতিটা নাম নিয়েছে প্রাচীন মিশর থেকে। Rosetta মিশরের একটা শহরের নাম(বর্তমানে রশিদ) যেখান থেকেই প্রথম প্রাচীন মিশরের হায়ারোগ্লিফিক লিখন, গ্রিক ভাষায় লিখিত পাথর ও ডেমোটিক নামে আরেকটি লেখা পাওয়া যায়। আর এসব লেখাগুলোর তুলনা করেই হায়ারোগ্লিফিকের অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ঠিক তেমনিভাবে এই মিশনের উদ্দেশ্যও ধূমকেতুর অর্থ উদ্ধার। তাই এহেন নামকরণ।

আর ধূমকেতুর পৃষ্ঠে অবতরণকারী ফাইলির নামকরনেও জড়িয়ে আছে মিশরের ইতিহাস। ফাইলি(Philae) শব্দটি বহুবচন। ফাইলি হলো মিশরের নীল নদের একটি বা দুটি ছোটো দ্বীপ যেখানে কি না প্রাচীন মিশরের বেশ কিছু মন্দির ছিল।

'ফাইলি' কমেট 67P এর যে স্থানে নামবে বলে প্ল্যান করা হয়েছিল সেটির নাম 'আগিলিকি'। আগিলিকি মিশরের আরেকটি দ্বীপ যেখানে ফাইলি দ্বীপের স্থাপনাগুলোকে নীল নদের ওপর বাঁধ দেওয়ার কারণে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে স্থানান্তরিত করা হয়।

এসব নামকরণ করার উদ্দেশ্য একটাই- তা হলো ধূমকেতুর ভেতর সেই সৌরজগৎ সৃষ্টিরও আগের উপাদান সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের দ্বার উম্মোচন। বিজ্ঞানীদের ধারণ ধূমকেতু গঠনকারী পদার্থ সৌরজগতের সবচেয়ে আদিম পদার্থ(primordial material) যা কিনা দূরের ঐ ধূমকেতুর মাঝে এখনো সংরক্ষিত আছে।

পরবর্তীতে আমরা দেখব কতটুকু সফল হয়েছিল এই মিশন।

নভেম্বর ১২ , ২০১৪ । সকাল ৮টা ৩৫ মিনিট GMT(Greenwich Mean Time)। বাংলাদেশের ঘড়িতে দুপুর ২টা ৩৫ মিনিট। ল্যান্ডার ফাইলিকে মাতৃযান রোজেটা থেকে মুক্ত করা হয় ল্যান্ডিং এর জন্য। রোজেটা বহনকারী রকেট নিক্ষেপ করা হয় ২০০৪ সালে। আর ফাইলিকে রোজেটা থেকে প্রায় ১০ বছর পর মুক্ত করা হয় ধূমকেতুতে অবতরণের জন্য। এই ১০ বছর সময়ে রোজেটা বেশ কয়েকবার ফ্লাইবাই করে ধূমকেতুর কাছাকাছি পৌঁছে।

ধূমকেতু 67P এর অবস্থান পৃথিবী থেকে মঙ্গলের কক্ষপথ ছাড়িয়ে প্রায় 500 মিলিয়ন কিলোমিটার। ২০০৪ এর ২ মার্চ নিক্ষেপণের পর প্রথম ফ্লাইবাই করে পৃথিবীর গ্র্যাভিটির অ্যাসিস্টে ২০০৫ সালের ৪ মার্চ। এরপর ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারিতে মঙ্গলকে এবং নভেম্বরে আবার পৃথিবীকে ফ্লাইবাই করে। এর ৫ বছর পর রোজেটা এস্টরয়েড বেল্ট অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজনীয় স্পিড অর্জন করে এবং ২০১২ সালে এটি হাইবারনেশনে চলে যায়। এটি পাওয়ার ডাউন করে দেয় এনার্জি বাঁচানোর জন্য। প্রসঙ্গত রোজেটার পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছে এর ফোল্ডেড সোলার প্যানেল যেটা প্রায় ৬৯০ স্কয়ার ফিট। দুইবছর হাইবারনেশনে থেকে অবশেষে প্রি-প্রোগ্রামড অ্যালার্ম ক্লক জাগিয়ে তোলে রোজেটাকে। ২০১৪ সালে রোজেটা জার্মানির ডার্মাস্টাডে সিগন্যাল পাঠায়। এই স্মরণীয় ঘটনা @ESA_Rosetta এই টুইটার অ্যাকাউন্টে টুইট করে জানিয়ে দেয় বিশ্ববাসীকে।: "Hello, World!" অবশেষে সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখে রোজেটা ধূমকেতুর চারপাশের নির্দিষ্ট কক্ষপথে যায়। নভেম্বরের ১২ তারিখে নিক্ষেপ করা হয়।

ধূমকেতুতে ফাইলির অবতরণ:

আগিলিকি। এখানেই নামবে ফাইলি। সেই উদ্দেশ্যে মুক্ত করে দেওয়া হয় ফাইলি কে রোজেটা থেকে। ফাইলিকে প্রায় ২২ কিলোমিটার ওপর থেকে ছাড়া হয়। আর ফাইলি 67P ধূমকেতুতে অবতরণ করেছে তা জানতে সময় লাগে ৭ ঘণ্টারও বেশি। যা কিনা প্রয়োজনীয় সময়ের থেকে অনেক বেশি।

ফাইলি ধূমকেতুতে যখন অবতরণ করে একদম যখন ধূমকেতুর বুকে অবতরণের মুহূর্তে তখন ফাইলির বেগ কমিয়ে ৩.৬ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় আনা হয়েছিল। অর্থাৎ ফাইলি সেকেন্ডে মাত্র ১ মিটার বেগে ধূমকেতুর বুকে আছড়ে পরে। এরকম বেগ কমানোর কারণ আছে। 67P ধূমকেতুটি দেখতে অনিয়তাকার, অনেকটা রাবারের খেলনা হাসগুলোর মতো। আকারে আগা-মাথা মিলিয়ে প্রায় ৬ কিলোমিটার। যার কারণে এর পৃষ্ঠের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অনেক অনেক কম। পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ১০,০০০ গুণ কম। তাই যত বেশি বেগে কোনো বস্তু আঘাত করবে সেটার ঐ ধূমকেতুর মাধ্যাকর্ষণ কে কলা দেখিয়ে আবার মহাকাশে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যেই কথা সেই কাজ। সেকেন্ডে মাত্র ১ মিটার বেগে ল্যান্ডিং করেও সফল হলো না ফাইলি। যদিও ফাইলির সাথে হারপুন ছিল যেটা দিয়ে কিনা ফাইলিকে বেঁধে রাখা যাবে 67P ধূমকেতুতে। কিন্তু হারপুন কাজ করল না। ফলে ফাইলি আবার মহাকাশে যেতে লাগল।কিন্তু ধূমকেতুর অল্প হলেও যে আকর্ষণ, সেটার টানেই আবার ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে আসে ফাইলি ধূমকেতুর ওপর। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম কোনো বস্তু অবতরণ করল ধূমকেতুর ওপর।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। ফাইলি ল্যান্ডিং করল এমন এক জায়গায় যেখানে কিনা সূর্যের আলো খুব অল্প সময়ের জন্য পড়ে।ফলে ফাইলি নীরব হয়ে যায়।সোলার প্যানেলগুলো আলো না পেয়ে ফাইলির ব্যাটারীগুলো রিচার্জ হচ্ছিলো না। যে পরিমান চার্জ ছিল তা দিয়ে বড়জোড় 48 ঘণ্টা সচল থাকতে পারে ফাইলি।

ফাইলির কাজ ছিল ধূমকেতুটির ধূলা, পানি ইত্যাদির রাসায়নিক গঠন বের করা এবং 'CONSERT'(Comet Nucleus Sounding Experiment by Radioactive Transmission) দিয়ে স্ক্যান করা।

তবে কি মিশন আনসাকসেসফুল? - না।

এর মধ্যে ধূমকেতু এর পেরিহেলিওন(perihelion) এ পৌঁছায় ।ধূমকেতু যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে তখনকার অবস্থানকে পেরিহেলিওন বা অনুসূর বলে। ২০১৫ সালের আগস্টে পেরিহেলিওনে পৌছানোর আগেই জুনের মাঝামাঝিতে ফাইলি কিছুটা সূর্যের আলো পায় এবং জেগে উঠে। এটি তখন স্ক্যান করে তথ্য রোজেটাকে পাঠানো শুরু করে। জুলাইয়ের প্রথম দিকে এটি আবার নীরব হয়ে পড়ে।

আগস্টে পেরিহেলিওনে পৌছানোর পর থেকে রোজেটার সোলার প্যানেল ক্রমশ কম আলো পেতে থাকে। অবশেষে রোজেটাকে নির্দেশ দেওয়া হয় তার অন্তিম পরিণতির। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখে নিয়ন্ত্রিত ক্র্যাশ-ল্যান্ডিং করতে বলা হয় রোজেটাকে। রোজেটা মারা যাওয়ার আগমুহূর্ত অবধি তথ্য প্রেরণ করে গেছে এমনকি সংঘর্ষের সময়কার তথ্যও প্রেরণ করেছে।

এরই মধ্যে ভাগ্যক্রমে ২০১৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর OSIRIS ক্যামেরাতে ধরা পরে ফাইলি।এর ফলে বিজ্ঞানীরা একদম নিশ্চিতভাবে জানতে পারল কোথা থেকে ফাইলি তাদের তথ্যগুলো প্রেরণ করেছে।

মিশনের ফলাফল:

ফাইলির পাঠানে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে জানা গেছে ধূমকেতুর পৃথিবীতে জীবন বয়ে আনার সম্ভাবনা খুবই কম। যদিও অনেক কার্বন সমৃদ্ধ যৌগ পাওয়া গেছে কিন্তু প্রাণের প্রাণভোমরা যে অ্যামিনো এসিড সেটি মাত্র একটি পাওয়া গেছে, কোনো প্রকার নিউক্লিক এসিড(DNA/RNA) পাওয়া যায়নি।

আর পৃথিবীর এতো পানির কথা যদি বলতে হয় তাহলে ধূমকেতুকে দায়ি করে লাভ হবে না। কেননা ধূমকেতুর পানি বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেছে ধূমকেতুর পানিতে ভারী হাইড্রোজেনের পরিমাণ বেশি। পানিতে ডিউটেরিয়ামের উপস্থিতি প্রমাণ করে পৃথিবীর পানি ঐসব ধূমকেতু থেকে

আসেনি । এই প্রথম বিজ্ঞানীরা একদম নিশ্চিতভাবে বলতে পারলেন এসব।

ফিরে দেখা ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ:

* 1978 সালে এক্সপ্লোরার-3 (ISEE-3) নামক প্রথম একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো হয় সূর্যকে মহাকাশ থেকে পর্যবেক্ষণের জন্য। কিন্তু 1980 সালে আন্তর্জাতিক এক্সপ্লোরার মিশন পাল্টে সেপ্টেম্বর 1985 সালে এই উপগ্রহকে ধূমকেতু গিয়াকোবিনি-জিনিয়ারকে পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠানো হয়।

*1986 সালে ইউরোপীয় স্পেইস এজেন্সি গিয়েত্তো(Giotto) মিশন পরিচালনা করেছিলো একটা নির্দিষ্ট দূর থেকে হ্যালির ধূমকেতু পর্যবেক্ষণের জন্য।

*1999 সালে স্টার ডাস্ট মিশন। শুরুতে এ নাম না থাকলেও 2001 সালে এই স্টার ডাস্ট নাম দেওয়া হয়।

*2004 এ পর্যবেক্ষণ করা হয় ধূমকেতু ওয়াইল্ড-2 কে এবং দুই বছর পরে এই ধূমকেতু থেকে প্রাপ্ত নমুনা নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে।

*2005 এর মধ্যভাগে মহাকাশযান ডিপ ইম্পপ্যাক্ট থেকে একটি গোলাকার ধাতব বস্তু প্রচণ্ড জোরে ছুড়ে মারা হয় ধূমকেতু টেম্পল-1 এর কোমায় (ধূমকেতু যখন সূর্যের খুব কাছে চলে আসে তখন এর নিউক্লিয়াসের পানি ও উদ্বায়ী পদার্থগুলো বাস্পীভূত হয়ে যায়। এর ফলে একটা গ্যাসীয় আবরণের সৃষ্টি হয়। এটিকে কোমা বলে।)

এইভাবে ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ মিশনের শুরু এবং এগিয়ে চলা। অবশেষে রোজেটা মিশনের মাধ্যমে আমরা ধূমকেতুর ওপর নামতে সক্ষম হয়েছি।

ফাইলির ল্যান্ডিং ম্যানেজারের ভাষ্যে-

"We didn't land once—may be we landed twice!"

মানুষ যদি স্বপ্ন না দেখতো মহাকাশ জয় করার, ধূমকেতুর ওপর অবতরণ করার তাহলে এসব কিছুই সম্ভব হতো না। অনেক অজানা রয়ে যেত অজানাই। তাই জীবনানন্দের ভাষায় বলি-

"“পৃথিবীর সব গল্প একদিন ফুরাবে যখন,
মানুষ রবে না আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন।”"

হার্ডি রামানুজান সমীকরণ

মাহির তানজিম

রামানুজন যখন যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে তখন তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন আরেকজন বিখ্যাত গণিতবিদ ডি.এইচ. হার্ডি। কথাপ্রসঙ্গে হার্ডি বলেন, আমি যে টেক্সিতে করে এসেছি তার নাম্বার 1729, কী সাধারণ একটি সংখ্যা!

রামানুজন সাথে সাথেই প্রতিবাদ করে বললেন, এটা মোটেও কোনো সাধারণ সংখ্যা নয়। বরং এটি হচ্ছে সেই ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যাকে দুইভাবে দুটি ভিন্ন সংখ্যার কিউবের(ঘনের) সমষ্টি হিসেবে লেখা যায়। যেমনঃ

12^3 + 1^3 = 1729

এবং

10^3 + 9^3 = 1729

এজন্যই এই সংখ্যাটির নাম "Hardy-Ramanujan Number."

শুধু এটুকুই না এই সংখ্যার সম্পর্কে আরেকটা ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে, 13 এর সাথে এর কিছু আধ্যাত্মিক সম্পর্ক আছে। যেমনঃ

i) 12^3 + 1^3 = 1729 এর ক্ষেত্রে বামপক্ষের দুটি সংখ্যার ভিত্তি 12 ও 1 এর যোগফল 13।

ii)1729 কে তিনটি মৌলিক সংখ্যা 7, 13 ও 19 এর গুণফল হিসেবে দেখানো যায় (7x13x19 = 1729)।

যাদের মধ্যে একটি সংখ্যা 13। আবার 7, 13 ও 19 এর গড়ও 13। অর্থাৎ (7+13+19)÷3 = 13.

iii) আবার সংখ্যাটির অঙ্কগুলো যদি একটু ওলট-পালট করে 2197 লিখি তাহলে সংখ্যাটি হলো 13 এর ঘন বা 2197 এর ঘনমূল 13।

Hardy-Ramanujan Number + Devil's Number:

666 কে বলা হয় Devils' Number বা Number of The Beast. (নামকরণের পেছনে অন্য কাহিনী আছে)।

Hardy-Ramanujan Number ও Devils' Number যোগে যে সংখ্যা পাওয়া যায় সেটিও খুব অদ্ভুত কারণ একে প্রথম মৌলিক সংখ্যা (২) ও পরবর্তী ৯ টি মৌলিক সংখ্যার বর্গের যোগফল হিসেবে প্রকাশ করা যায়।

অর্থাৎ, 1729 + 666 = 2395 = 2 + 3^2 + 5^2 + 7^2 + 11^2 + 13^2 + 17^2 + 19^2 + 23^2 + 29^2।

1729 একটি Harshad Number! অর্থাৎ, এর সবকটি অঙ্কের যোগফল 1+7+2+9=19 দিয়ে সংখ্যাটিকে ভাগ করা যায় এবং ভাগফল হবে 1729÷19 = 91.

এই 91 ও একটি বিশেষ সংখ্যা। রামানুজন বলেছিলেন 1729 হলো সেই ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যাকে দুইভাবে দুটি সংখ্যার কিউবের সমষ্টি হিসেবে দেখানো যায়। এটি তিনি কেবল ধনাত্মক সংখ্যা বিবেচনা করে বলেছেন। কিন্তু ঋণাত্মক সংখ্যা সহ যদি বিবেচনা করি তাহলে 91 হলো ক্ষুদ্রতম ধনাত্মক সংখ্যা যাকে দুইভাবে দুটি সংখ্যার কিউব আকারে দেখানো যায়। যেমন,

6^3 + (-5)^3 = 91

এবং 4^3 + 3^3 = 91

সাব্বির রহমান

নেপচুন (Neptune)

"প্রেমের মরা জলে ডুবে না, ও মন আমার, প্রেমের মরা জলে ডুবে না।"

টেপ রেকর্ডারে এই গান শুনে বেশ ভয়ে আছেন প্রফেসর টিপু সরকার। ভয়ার্ত মন নিয়ে ভেবেই চলেছেন- সাগর দেবতার আধিপত্য এই গ্রহে। আর এখানে থেকে প্রেমের লাশ জলে ডুবাতে না পারলে রক্ষে নেই তাঁর। তাই সিদ্ধান্ত নিলেন এই গ্রহে প্রেমই করবেন না। কই প্রেম করবেন খুঁজতে খুঁজতে রূপের দেবী ভিনাসের কাছে গেলে ভিনাস বুদ্ধি দিল, "সূর্যে গিয়ে প্রেম কর। সূর্যে প্রেম করলে পৃথিবীবাসী তোমার প্রেমিকাকে দেখবে লাল সুন্দর, আর সবাই হিংসায় জ্বলবে। বুদ্ধিটা বেশ পছন্দ হলো তাঁর, চলে গেলেন সূর্যে। ভয়াবহ গরম আর মহাকর্ষও তীব্র, তবুও সুখে আছেন পাশে প্রেমিকা আছে বলে। সংসার তাঁর ভালোই যাচ্ছে, দেখতে দেখতে বছর ঘুরে কুরবানির ঈদ এসে গেছে।

কুরবানি দিতে হবে, তাই কুরবানির গোরু কিনতে গেলেন তুলনামূলক কম গরমের অঞ্চল "সৌর কলঙ্ক" নামের হাটে।

এইবার হাটের সবচেয়ে বড়ো গোরু হচ্ছে মেসি আর রোলানদো।
টিপু সরকার কেনার আগেই মেসিকে কিনে নিল একজন, তাই বাধ্য হয়ে তার কিনতে হলো রোলানদোকে।
গোরু কুরবানি দিয়ে এইবার বিপদে পড়লেন টিপু সরকার, মাংস রাখার জায়গা নাই এই সূর্যের গরমে মাংস বেশি দিন রাখা যাবে না এখানে।
তাঁর আবার অভ্যাস হচ্ছে, কুরবানির মাংস উনি কাউকে দিবেন না, নিজেই সারা বছর রেখে রেখে খাবেন।
সূর্যে আসার সময় ফ্রিজ আনতে ভুলে গেছেন টিপু সরকার। এখানে ফ্রিজ কিনতেও পাওয়া যায় না।
তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন সূর্য থেকে দূরে কোথাও মাংস রেখে আসবেন।
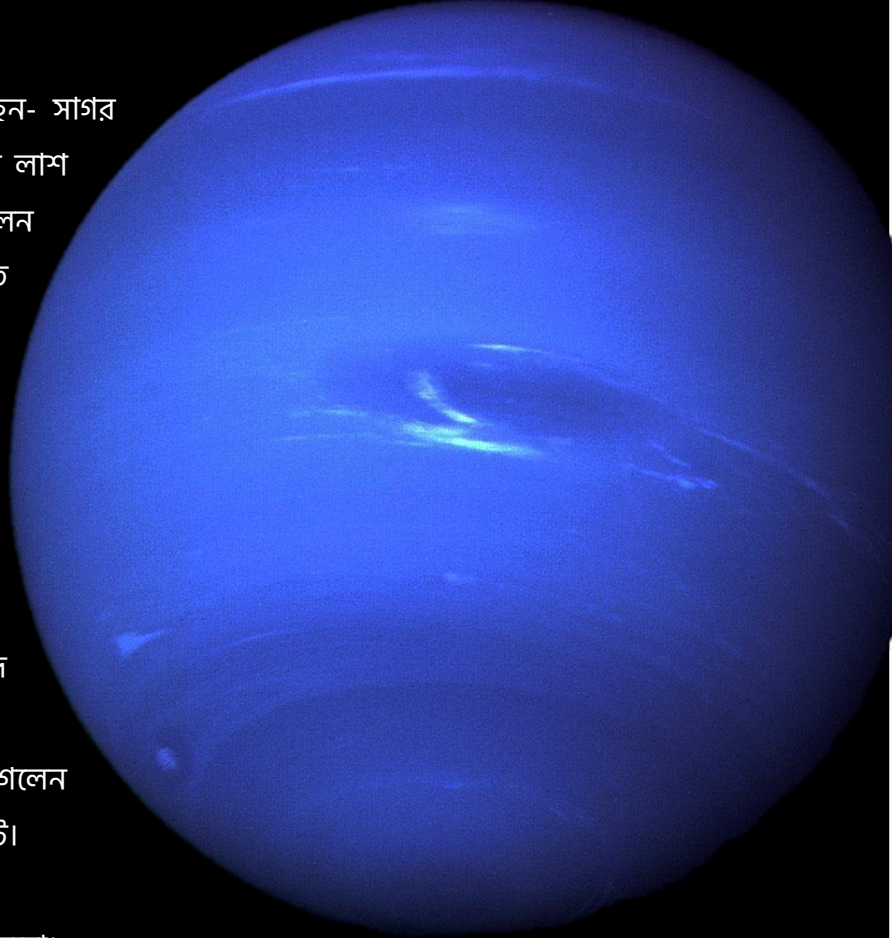
কত দূরে রাখবেন এই ভাবতে গিয়ে বললেন পৃথিবীর বদগুলো যে চোর! পৃথিবীর ত্রিসীমানা তো দূরের কথা এর থেকে ত্রিশ গুণ বেশি দূরে মাংস রেখে আসব।

যা ভাবা তাই কাজ, খাতা কলম নিয়ে বসে পড়লেন, অংক করে দেখলেন, আরে পৃথিবীর ত্রিশ গুণ দূরে তো একটা গ্রহ থাকার কথা, আকাশে বেশ খোঁজাখুঁজির পরও সেই গ্রহের দেখা পেলেন না টিপু সরকার, এই দিকে তাঁর মাংসের বারোটা বেজে যাচ্ছে। তাঁর আবার গণিতের ওপর বেশ শক্ত বিশ্বাস আছে, তাই ভরসা করলেন যে, না, গণিত যেহেতু বলছে গ্রহ আছে, তাহলে গ্রহ আছেই। প্রেমিকার থেকে বিদায় নিয়ে, তাঁর শখের মহাকাশযান লেগুনা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সেই গ্রহের সন্ধানে, আর লেগুনার পেছনে আছে হাটের বড়ো গোরু রোলানদোর মাংস।

সূর্য থেকে গুণে গুণে ৩০.০৬ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট দূরে পেয়ে গেলেন কাঙ্ক্ষিত গ্রহটাকে। গ্রহটাকে দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে গেলেন টিপু সরকার। দেখতে নীল রং এর এই গ্রহটা অনেকটা পৃথিবীর মতো কিন্তু আয়তনে পৃথিবীর থেকে প্রায় ৫৮ গুণ বড়ো। গ্রহের নীল রং দেখে, সমুদ্রের দেবতার কথা মনে হয়ে গেলে, এই গ্রহকে নেপচুন নাম দিয়ে দেন টিপু সরকার। গ্রহের কাছে যেতেই চোখে পড়ল, পুরো সৌরজগৎটা একটা বলয় এর মাঝে রয়েছে। কীসের এই বলয়, কাছে যেয়ে দেখলেন লক্ষ কোটি স্বাধীন বরফ খণ্ডেরা মিলে বানিয়েছে বলয় (বলয়টার নাম The Kuiper Belt. এই বেল্টের পরেই রয়েছে রঙিন এক স্তর যা আমাদের সৌরজগৎ এর শেষ সীমানা, যেই অঞ্চলে থাকে ধূমকেতু গঠনের সব বস্তু, এই স্তরের নাম OORT CLOUD)। কিছু কিছু বরফ খণ্ডের আকার দেখলেন প্রায় ছোটোখাটো একটা গ্রহের সমান।

সৌরজগতের শেষ সীমানা ঘুরে এসে নেপচুনের কাছে গিয়ে বুঝতে পারলেন, এই নেপচুন একেবারে নিষ্ঠুর না, তার মহাকর্ষ অনেকটা পৃথিবীর মতোই, পৃথিবীর থেকে সামান্য বেশি। (মজার ব্যাপার হলো এই নেপচুনের আছে শনির মতো রিং। নেপচুনের রিংগুলোর বয়স নেপচুনের তুলনায় বেশ অল্প, ধারণা করা হয় নেপচুনের ইনার মুনগুলো ধ্বংস হয়ে এই রিংগুলোর জন্ম হয়েছে। এই রিংগুলোও ধুলাবালি আর পাথর খণ্ডের তৈরি। এই সব দেখে টিপু সরকার বেশ আনন্দচিত্তে নেপচুনে যাবেন তখন হঠাৎ খেয়াল হলো এর রং এর কথা। মনে হলো এত নীল কেন? নীল হওয়ার কারণ খুঁজে বের করলেন, যে নিশ্চয় এতে মিথেনের পরিমাণ আছে বেশ ভালোই যেই কারণে নেপচুন সাহেবকে নীল দেখাচ্ছে।

যাইহোক, মিথেনের চিন্তা মাথার কোনায় রেখে রেখে নেপচুনের বায়ু মণ্ডলে মাথা ঠুকতেই বেচারা বুঝে গেছে কোন জাহান্নামে গিয়ে পড়ল। বাতাস বইছে ঘণ্টায় ২১৬০ কি.মি. বেগে, ভয়াবহ ঝড় তার থেকে বড়ো ব্যাপার এইখানে হাইড্রোজেনের পরিমাণ ৭৯% আর হিলিয়াম এর পরিমাণ ১৮%। মনে মনে ভাবলেন বাবারে তুই আরেকটু বড়ো হয়ে একটা তারাই হয়ে যেতি তাহলে আর আমি তো কাছে আসার নাম নিতাম না।
টিপু সরকার না চাইতেও চলে গেলেন নীল গ্রহের মাঝে অন্ধকার গুহার মতো একটা জায়গায় (একে বলে The Great Dark Spot. এখন অবধি এমন ৬ টা স্পটের সন্ধান পাওয়া গেছে এর বায়ুমণ্ডলে,তবে নেপচুনের স্পটের জীবন কাল জুপিটার এর রেড স্পটের মতো এত দীর্ঘ না। এর জীবনকাল অল্প, কয়েক বছরের হয়)। এ গুহার আকার পৃথিবীর আকারের সমান। এইখানের ঝড়ের প্রকোপ অন্য জায়গার চেয়ে প্রচুর বেশি, আর বেশি বলেই জায়গাটা অন্ধকার। টিপু সরকার ভাবতেছে- কী এক আজব জায়গায় পড়লাম রে বাপ! ঝড় হয় নিম্ন চাপের কারণে, এইখানে দেখি উচ্চ চাপের কারণে মারাত্মক কেয়ামত মার্কা ঝড় বেঁধে গেছে। সে যাইহোক, এখন এইখান থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি। না হয় যে ঠান্ডা, জমে যেতে বেশি সময় লাগবে না। তাপমাত্রা মাপার যন্ত্র বের করে দেখলেন তাপমাত্রা -218 ডিগ্রি সেলসিয়াস। কী সাংঘাতিক ব্যাপার!

ঝড় পার করে, পরের স্তরে যেয়ে দেখেন আরে, এ তো পানি, মিথেন আর অ্যামোনিয়ার বরফে ভর্তি, তাপমাত্রাও সামান্য বেশি। ঝড়ের তাণ্ডব কিছু কম, তাই টিপু সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন কিছু সময় থাকবেন এইখানে, জায়গাটা পছন্দ হয়েছে।

তার ওপর আবার এখন নেপচুনে বসন্ত কাল চলতেছে। এইখানে দিন রাত খুব তারাতাড়ি আসে যায়, মাত্র ১৬.১১ ঘণ্টায় এক দিন হয়ে যায়। কিন্তু বছর পার হতে খবর খারাপ হয়ে যায়, এইখানে এক বছর হতে সময় লাগে পৃথিবীর ১৬৪.৮ বছর। ঋতু পরিবর্তন বেশ আস্তে ধীরে হয়। টিপু সরকার হিসেব-টিসেব কষে বের করলেন এই বসন্ত কাল থাকবে ৪০ বছর। তাই কয়েক বছর এইখানে কিছু দিন কাটাবেন ভাবলেন, কিন্তু পেছনে তাকিয়ে দেখেন মাংসের অবস্থা খারাপ, তাই মাংস রাখার উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে খুঁজতে চলে গেলেন নেপচুনের একেবারে ভেতরের স্তরে, যে স্তর পাথর আর বরফে গঠিত। জায়গাটা শক্তপোক্ত দেখে জায়গাটাকে উপযুক্ত ভেবে মাংসগুলো যত্ন সহকারে রেখে বিদায় নিলেন নেপচুন থেকে।

বিদায় বেলা চোখে পড়ল নেপচুনের ১৪ টা চাঁদ, যার মাঝে "ট্রাইটন" হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো চাঁদ। আর এইটাকেই নেপচুনের আসল চাঁদ বলে (রোমান সাগর দেবতা নেপচুনের ছেলের নামে এই চাঁদের নাম রাখা হয় ট্রাইটন)। ট্রাইটনে দক্ষিণ মেরু থেকে বিষুব অঞ্চল পর্যন্ত নাইট্রোজেনের তুষার জমে আছে দেখা যাচ্ছে। এটা মূলত মেরুর কাছেই ছিল, বাতাস এই বিষুব অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছে এদের।

এবার ট্রাইটন থেকে নেপচুনের দিকে তাকালে টিপু সরকার দেখে ভাবতেছে, আরে এ তো বড্ড বজ্জাত চাঁদ, এই বদমাইশ তো নেপচুনের ঘূর্ণনের উলটো দিকে ঘুরছে।
(হ্যাঁ, ট্রাইটনই সৌরজগতের একমাত্র বড়ো চাঁদ যে তার গ্রহের ঘূর্ণনের উলটো দিকে ঘুরে, আর তাই একে বলে Retrograde Orbit.বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন ট্রাইটন ছিল Kuiper Belt এর একটা বস্তু, যা বহু বছর আগে নেপচুনের গ্র্যাভিটির মাঝে আটকা পড়ে গেছে)

নেপচুনের আকাশে সূর্যকে প্রায় ৯০০ গুণ ছোটো লাগে। সে হিসেবে বরফ আর পাথর দিয়ে তৈরি ট্রাইটনকে বেশ ভালোই লাগে নেপচুনের আকাশে। বাকি চাঁদগুলোর আকারের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই তার মাঝে আকারেও ছোটো, এই সব দেখে বেশ বিরক্ত হয়ে লেগুনা স্টার্ট করেন টিপু সরকার। রাগের মাথায় চালাতে চালাতে শনির বলয়ে যেয়ে ধাক্কা খায় লেগুনা, আর ছিটকে বলয়ের একটা পাথরে ধরে ঝুলতে থাকেন টিপু সরকার। বহু বছর ঝোলার পর, হঠাৎ দেখে একটা মহাকাশযান আসছে এই দিকে। যানের গায়ে লিখা 'সমুদ্র পরিবহন'। বাল্যকালের বন্ধু সমুদ্রের মহাকাশযান দেখে সব ছেড়ে আবার পৃথিবীতে যাবার স্বপ্ন দেখে টিপু সরকার। সমুদ্র পরিবহনে সিট পাবে কি টিপু সরকার?
আর সমুদ্র পরিবহন এই বলয়ে কী করছে সে গল্প তো তার থেকেই শুনেছেন।

এক নজরে নেপচুন

ব্যাস: 49,500 কি.মি

সূর্যের থেকে আনুমানিক দূরত্ব: 449 কোটি 67 লক্ষ কি.মি

সূর্য-পরিক্রমার সময়: 165 বছর

নিজ অক্ষে ঘোরার সময়: 18 ঘণ্টা

উপগ্রহ: 14 টি

গড় তাপমাত্রা: মাইনাস 216 ডিগ্রি সেলসিয়াস

ঘনত্ব: 1.638 গ্রাম/সে.মি

গ্র্যাভিটেশনাল ত্বরণ: 11.15 মি/সে

ভর: 1.0243×10^{26} কেজি

সৌরজগৎ

ব্যাঙাচি
ব্যাঙাচি
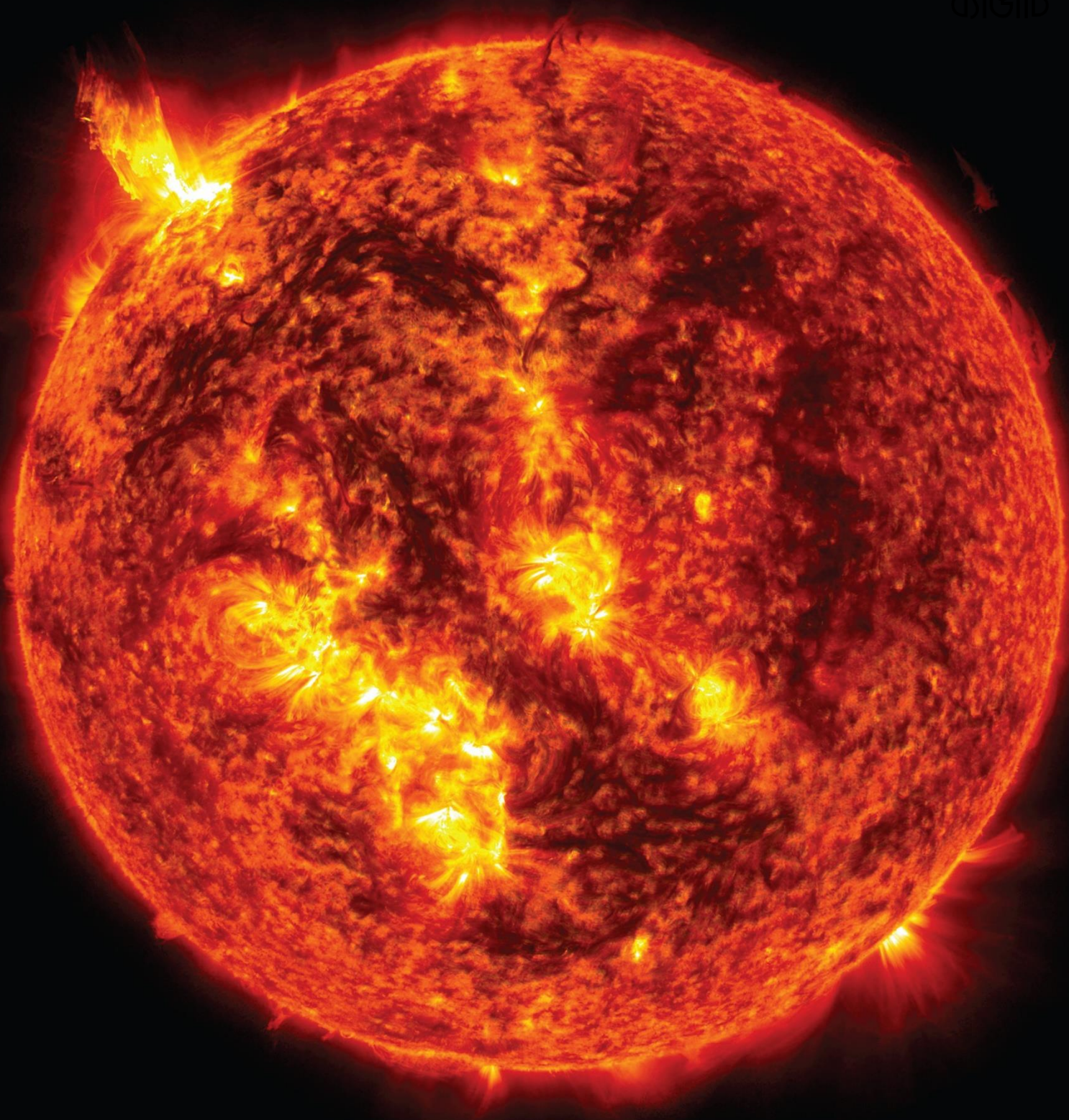
সুয্যি মামা

প্রজেশ দত্ত

সবার সামনে এসে দাঁড়ালেন আগন্তুক। উনার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ফ্রে, ভাসির, ওডিন, লোকি সহ সকল দেবতারা।

- আমি আপনাদের জন্য প্রাচীর গড়ে দিতে
রাজি , মহামান্য ওডিন। আকাশসম উঁচু, দুর্ভেদ্য, দৈত্য হোক বা দানব, হোক পিঁপড়া বা ছোট্ট মশা, কিংবা হাজার হাতির শক্তি রাখা কোনো দেবতা- কেউই এই প্রাচীর ভেদ করে আপনাদের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

- হ্যাঁ, আমাদেরও কারিগর আছেন। বামুনেরা এই নয় জগতের সেরা কারিগর। তাদের বদলে কেন তোমাকে আমরা বিশ্বাস করব?

- তাদের এরূপ প্রাচীর গড়ে তুলতে কয়েক বছর লেগে যাবে। ততদিনে হয়তো সর্বপিতা বুড়ো-ই হয়ে যাবেন আপনি। আমি মাত্র তিন ঋতুতে এই প্রাচীর আপনাদের উপহার দিতে পারি।

আগন্তুকের এই প্রস্তাব মন্দ লাগল না কোনো দেবতার। কিন্তু আগন্তুকের পারিশ্রমিক? এত বড়ো কার্যের জন্য নিশ্চয়ই কম কিছু দাবি করবে না সে। ওডিন অবশেষে আগন্তুকের দিকে চাইলেন।

- কী চাই তোমার?
-সূর্য
-কিহ!
-জি মহামান্য ওডিন। সাথে চাই চাঁদ এবং সুন্দরী ফ্রেয়া কে।

লোকির উস্কানিতে সূর্যকে বাজি রেখে আগন্তুকের সাথে এই চুক্তিতে রাজি হন দেবতারা। কিন্তু হারাতে হয়নি সূর্যকে। লোকির অসাধারণ চাতুর্যে সে যাত্রায় রক্ষা পেয়েছিল আমাদের সূর্য, নয়তো সৌরজগতই হয়তো অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ত অনন্তকালের জন্য।

শৈশবকাল থেকেই আমরা অন্তত একটা নক্ষত্রকে ভালো মতো চিনতে শিখি। রোজ সকালে পূর্বে উঠে পশ্চিমে অস্ত যাওয়া আমাদের সূর্যকে, সৌরজগতের প্রাণকেন্দ্রকে। থালার মতো গোল হয়ে আকাশে ঝুলে থাকলেও সূর্য মোটেও এত পিচ্চি না। প্রায় ৬৯৬,৩৪০ কিমি ব্যাসার্ধের এক মহাউত্তপ্ত গ্যাসপিণ্ড সে। এই উত্তপ্ত পিণ্ড থেকে প্রতি মুহূর্তে আলো-তাপ আসছে পৃথিবীতে, জোগান দিচ্ছে পৃথিবীর সব জীবের প্রাণ-রাসায়নিক শক্তি।

সূর্যের জন্ম হয়েছে প্রায় ৪.৬ বিলিয়ন বছর আগে, আর কয়েকটা নক্ষত্রের মতোই বিশাল বড়ো গ্যাসীয় মেঘ থেকে। মহাকর্ষের অন্তর্মুখী টানে সংকুচিত থেকে সূর্য সৃষ্টির পর বাকি গ্যাসীয় উপাদান, মেঘ ডিস্কের মতো সূর্যকে ঘিরে ছিল বহুবছর। মহাজাগতিক মেঘের এই অবশিষ্ট অংশ থেকেই পরবর্তীতে জন্ম নিয়েছে পুরো সৌরজগৎ। আমাদের থেকে প্রায় পনেরো কোটি কিলোমিটার দূরে সূর্য, আলো আসতে সময় লাগে আট মিনিট বিশ সেকেন্ড। অন্তত আমরা সেখানে পৌঁছনোর চিন্তা করি না সহজে, কিন্তু অনেকেই করেন।

এইতো সেদিন মফিজ আসলো আমার কাছে। ছেলেটার আগ্রহ বড্ড বেশি সবকিছুতে। এসেই যা বলল তাতে আমি থ হয়ে গেলাম। মুখটা হা হয়ে রইল বেশ কিছু সময়।

-ভাই, আমি সূর্যে যাব। এটা আমার জীবনের শেষ সিদ্ধান্ত ভাই। মানুষ চাঁদ, মঙ্গল সব জয় করেছে। আমি আমার দেশের নাম উজ্জ্বল করতে চাই। আমি সরাসরি সূর্যেই যাব।
-তা হঠাৎ মফিজের মনে এত সুখ, সে সূর্যে যেতে চাচ্ছে। ভাবি কি ধোঁকা দিলো নাকি, সূর্যে ঝাঁপ দিয়ে মরার শখ কেন উঠল?

-মরার কথা কে বলছে ভাই, আমি তো সূর্যে যেতে চাচ্ছি।
-সেটা তো মৃত্যুর সমানই। এই দেখ ভর দুপুরে রোদের তাপে শরীর ঘেমে একাকার। মানুষজন পাখা চালিয়েও স্বস্তি পাচ্ছে না। আর তুমি যাবে সেখানে যেখান থেকে এই তাপের সৃষ্টি?

- আমার কাছে একটা বুদ্ধি আছে ভাই। আমি বরফের স্যুট পরব ভাই। আইসস্যুট পরে সূর্যে গেলে আমার আর গরম লাগবে না।

-আজকের তাপমাত্রা কত জানো? খুব বেশি হলে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপেই তোমার ঐ আইসস্যুট গলে পানি হয়ে ঝরে যাবে। আর সূর্যের পৃষ্টের তাপমাত্রা তো ৫৫০৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস!! কত গুণ তা নিশ্চয়ই বুঝছ?

-এত তাপ! এত তাপ তো আমাদের উনুনেও হয়না কখনো।

- হা হা হা। আমাদের চুলায় জ্বলা আগুন আর সূর্যের আগুন এক না। আমাদের চুলায় যে আগুন জ্বলে তা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে কিছু জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার ফল। আর সূর্যে ঘটে ফিউশন বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ায় এতটুকু তাপ তৈরি হওয়া সাধারণ ব্যাপার।

- ওহ, কেউ যদি সূর্যে পানি ঢেলে দিত তাহলে বড্ড সহজে আমি সূর্যে পাড়ি জমাতে পারতাম।

-এক কাজ কর, তুমি বরং রাতের বেলা চলে যাও সূর্যে, তখন সূর্যে আলো থাকে না।

-ঠিক বলেছেন ভাই, ভাই আপনি সেরা ভাই।

সৌরজগতের মোট ভরের প্রায় ৯৯.৪৬% ভর ধারণ করে বসে আছে সুয্যি মামা। এই দানবের মোট উপাদানের ৭৩.৪৬ শতাংশ হলো হাইড্রোজেন। পর্যায় সারণিতে যত মৌল রয়েছে তাদের মধ্যে সবথেকে হালকা মৌল। কে জানে, হয়তো কবি সেদিন আকাশে এই সূর্যের দিকে তাকিয়েই বলে গেছেন,

"ছোট ছোট বালুকণা, বিন্দু বিন্দু জল,
গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।"

সূর্যের বাকি উপাদানের মধ্যে ২৪.৮৫ শতাংশ হিলিয়াম। আর সামান্য পরিমাণে কার্বন, আয়রন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার প্রভৃতিও উপস্থিত। সূর্যের গহীনে যেখানে প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলেছে ফিউশন বিক্রিয়া সেটি খুবই উত্তপ্ত, প্রতি সেকেন্ডে সেখানে ৬০০ মিলিয়ন টন হাইড্রোজেন ফিউজ হয়ে উৎপন্ন হচ্ছে হিলিয়াম। যার মধ্যে মাত্র চার মিলিয়ন টন ভর আইনস্টাইনের ভরশক্তি সমীকরণ মেনে শক্তিতে পরিণত হয়। বিক্রিয়াস্থল তথা সূর্যের কোর এর কেন্দ্রের চারপাশের ২০-২৫% এলাকা নিয়ে গঠিত। সূর্যে উৎপন্ন এই শক্তি কোর থেকে পৃষ্ঠতল এবং পৃষ্ঠতল থেকে বাইরে উন্মুক্ত হতে সময় নেয় প্রায় দশ থেকে একশত সত্তর হাজার বছর। আপনি যখন শীতের দুপুরে বসে রোদ পোহাতে পোহাতে সুয্যি মামাকে ধন্যবাদ দেন আপনাকে উত্তপ্ত রাখার জন্য, তখন আপনি কমপক্ষে দশ হাজার বছর অতীতের তাপ অনুভব করেন, আলো দেখেন। সূর্যের কোরের তাপমাত্রা প্রায় ১৫.৭ মিলিয়ন কেলভিন।

তাপ তিন ভাবে এক স্থান থেকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। পরিবহন, পরিচলন এবং বিকিরণ। সূর্যের কোরের বাইরে রেডিয়াটিভ অঞ্চলের অবস্থান। কোরের সীমানা থেকে সূর্যের প্রায় ৭০% অঞ্চল অবধি এর বিস্তৃতি। কোর থেকে যত দূরের অঞ্চলে আমরা যাই তত তাপমাত্রা কমতে থাকে। রেডিয়াটিভ অঞ্চলের প্লাজমা অনেক বেশি উত্তপ্ত এবং ঘন হওয়ায় তাপ সেখানে বিকিরণের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। কোরের ১৫.৭ মিলিয়ন কেলভিন তাপমাত্রা রেডিয়াটিভ অঞ্চলের শুরুতে নেমে যায় ৭ মিলিয়ন কেলভিনে। সেখানে ফিউশনের মতো কোনো বিক্রিয়া ঘটে না বলেই এই পার্থক্য, আরও দূরে গেলে তাপমাত্রা আস্তে আস্তে কমে রেডিয়াটিভ অঞ্চলের সীমানায় প্রায় ২ মিলিয়ন কেলভিনে নেমে আসে।

রেডিয়াটিভ অঞ্চলের পর কনভেকটিভ অঞ্চল। কনভেকশন হলো তাপের পরিচলন। এর পিছনে দায়ী ঐ লেয়ারের প্লাজমা অপেক্ষাকৃত কম উত্তপ্ত ও ঘন হওয়া। এই অঞ্চল রেডিয়াটিভ অঞ্চলের শেষ সীমা থেকে শুরু হয়ে প্রায় পৃষ্ঠতল অবধি বিস্তৃত। রেডিয়াটিভ আর কনভেকটিভ অঞ্চলের মাঝে ট্যাকোলিন আস্তরণের অবস্থান। কনভেকটিভ অঞ্চলে এসে তাপমাত্রা আরও নিচে নেমে যায়। ২ মিলিয়ন কেলভিন থেকে নেমে আসে মাত্র ৫,৭০০ কেলভিনে।

এরপর ফটোস্ফিয়ার অঞ্চলের অবস্থান। আমাদের চোখে সূর্যের যে অংশ ধরা দেয়। আলো ঠিকরে বেরিয়ে আসে সূর্য

থেকো। এই আলোর বিকিরণই পাড়ি জমায় দূর-দূরান্তে নিজের প্রিয়তমাদের কাছে।

"অঙ্গে তোমার রূপের খনি, বিভৎসতার আড়ি
যতই হও রূপের রাজা, কলঙ্ক না ছাড়ি।"

নক্ষত্র হও বা মানুষ, তোমার যদি কলঙ্ক না থাকে তবে তুমি যেন পরিপূর্ণ নও। এমন কিছু আমাদের সূর্যের জন্যও সত্য। সূর্যের গাত্রেও রয়েছে কলঙ্ক। সূর্যের ইনটেন্স ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য সূর্যের পৃষ্ঠ তথা ফটোস্ফিয়ারের কোথাও কোথাও স্পট সৃষ্টি হয় যার তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম হয়ে থাকে। কিন্তু এতটাও কম না যা যে মফিজ ভাইয়ের মতো আপনিও সেখানে ঝাঁপ দেওয়ার পরিকল্পনা করবেন। সানস্পটের তাপমাত্রা প্রায় ৩৮০০ কেলভিন। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বোঝা গেছে সূর্য নিজের অক্ষেও ঘূর্ণনশীল। যেহেতু সূর্য কোনো সলিড বস্তু না সেহেতু এর বিভিন্ন লেয়ারের ঘূর্ণনকালে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। সাময়িকভাবে এই স্পট সূর্য পৃষ্ঠে সৃষ্ট হয়, প্রায় ৫০,০০০ কি.মি. পর্যন্ত হতে পারে এর ব্যাসার্ধ।

সূর্যের ফটোস্ফিয়ার অঞ্চলের শেষে সূর্যকে ঘিরে আছে ক্রোমোস্ফিয়ার। এই অঞ্চল থেকে লালচে আভা ছড়ায়। সূর্যের প্রচণ্ড তাপে হাইড্রোজেনের দহন ঘটে এই অঞ্চলে। এই লালচে আভা আমরা চাইলেও দেখতে পাই না কারণ এর পেছনেই আছে উজ্জ্বল ফটোস্ফিয়ার। এর আলোয় ঢাকা পড়ে যায় লাজুক মুখের লালচে আভা। সূর্যগ্রহণের সময় প্রকাশ পায় সে। ঠিকরে বেরিয়ে এসে নিজের অস্তিত্বের জানান দেয়।

এবার সূর্যের সবচেয়ে বাইরের স্তর নিয়ে জানব। নামটা শুনে একটু চমকই জাগবে মনে। সবচেয়ে বাইরের লেয়ারটার নাম "করোনা।" জি, সঠিক শুনেছেন। করোনা তার নাম, এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময়। এসময় সাদা আলোকরশ্মি বা শিখারূপে নিজেকে প্রকাশ করে সে। উত্তপ্ত আয়নিত গ্যাসরূপে ছুটে চলে সূর্য থেকে বাইরের দিকে, মহাকাশে। এর তাপমাত্রা প্রায় ২ মিলিয়ন ডিগ্রি কেলভিন হতে পারে। এবার যে রহস্য সামনে আসে তা হলো সূর্যের কোর থেকে যত বাইরের দিকে আসি আমরা তত তাপমাত্রা কমতে থাকে। তাহলে হঠাৎ করে সবচেয়ে বাইরের এই লেয়ারের তাপমাত্রা এত বেশি কীভাবে হয়ে গেল?

এই প্রশ্ন অনেক ভাবিয়েছে বিজ্ঞানীদের। অবশেষে তাঁরা একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন। সূর্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছোটো ছোটো বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিস্ফোরণ থেকে সৃষ্টি হয় এসব উত্তপ্ত আয়নিত গ্যাসকণা। এই বিষ্ফোরণ গ্যাসকণাগুলির তাপমাত্রাকে পৌঁছে দেয় অনেক উঁচুতে। তাঁদের হিসেবে এমন বিষ্ফোরণে সৃষ্ট গ্যাসকণার তাপমাত্রা দশ মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াসও হতে পারে। এই ধরনের বিস্ফোরণ ন্যানোফ্লার নামে পরিচিত। আরও কিছু সম্ভাব্য কারণ যেমন জায়ান্ট সুপার টর্নেডোকেও তাপমাত্রার এমন বৃদ্ধির পিছনে দায়ী করা হলেও ন্যানোফ্লারই মূল ভূমিকা রাখে বলে বিবেচনা করা হয়। এই যে করোনা, উত্তপ্ত গ্যাসকণা, এগুলো ছুটতে ছুটতে একসময় তাপ হারিয়ে ঠান্ডা হয়ে যায়, সৃষ্টি করে সৌরঝড়ের।

আমাদের এই সূর্যেরও একসময় মৃত্যু ঘটবে। তবে সেটা অনেক ধাপের পর। প্রায় ৫ বিলিয়ন বছর পরে সূর্যের হাইড্রোজেন জ্বালানি শেষ হবে, শুরু হবে হিলিয়ামের ফিউশন। সূর্যের আকার বেড়ে যাবে অনেকখানি, নয়তো দৈত্য হিসেবে প্রকাশ করবে কী করে নিজেকে? এসব গল্প আজ থাক। সূর্যের মতো নক্ষত্রদের জন্ম ও মৃত্যু না হয় অন্য কোনোদিন জানব আমরা।

ফিরে যান
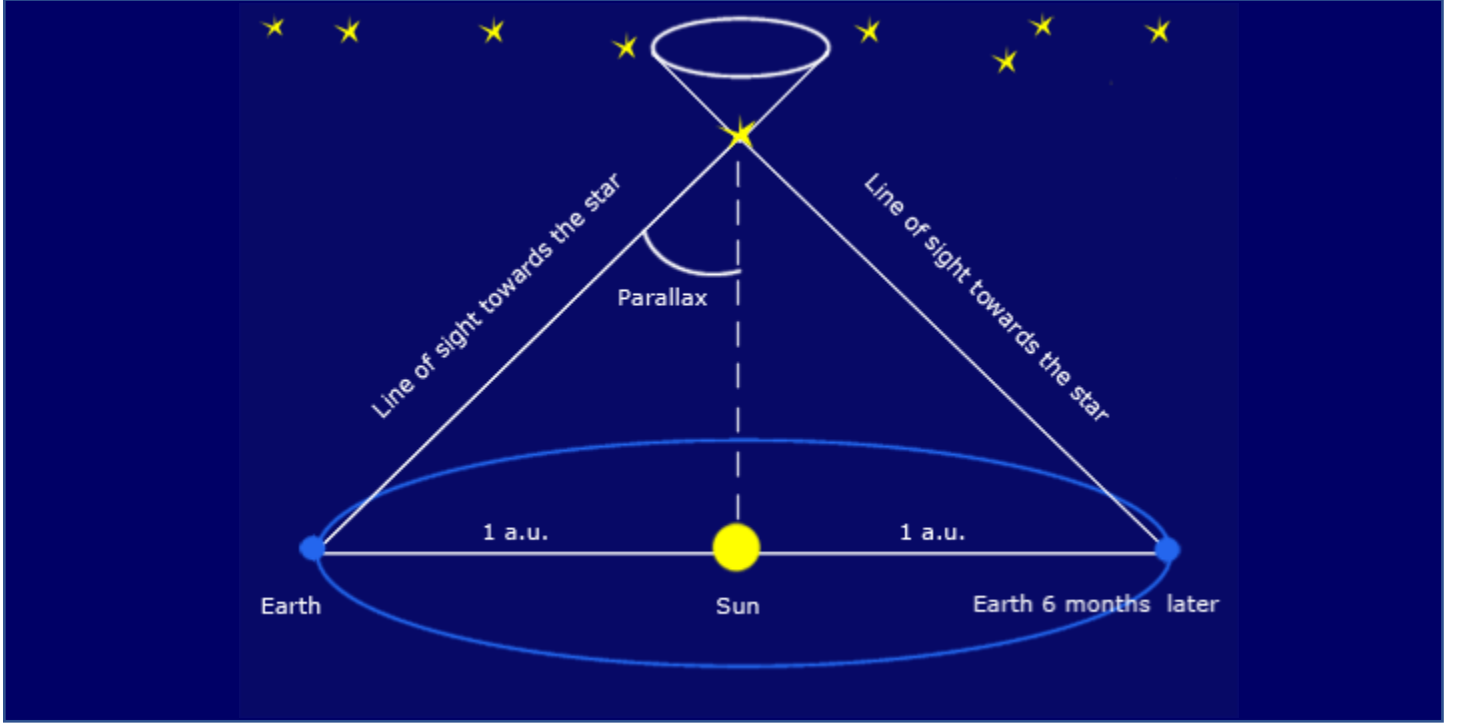
নিকটবর্তী ও দূরবর্তী নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয়

সাদুল্লাহ খাঁন রিজভী

রাতের আকাশে তাকালে যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে তবে এক নৈসর্গিক দৃশ্য দেখা যায়; তারায় ভরা আকাশ। যদিও ঢাকায় অত বেশি দেখা যায় না, তবে ঢাকার বাইরে বায়ুদূষণমুক্ত এলাকায় বিশেষ করে উচ্চতা বেশি এমন এলাকা হতে পরিষ্কার আকাশে অজস্র তারা পরিলক্ষিত হয়।

খালি চোখে দেখে মনে হয় যেন কালো সমতলের ওপর কতগুলো উজ্জ্বল বিন্দু। এই উজ্জ্বল বিন্দুগুলো যে আসলে আমাদের সূর্যের মতোই কতগুলো বিশাল বিশাল নক্ষত্র, তা জানতে মানুষের বহু বছর লেগে গেছে। আরও বহু বছর লেগেছে এটা বুঝতে যে, কতগুলো তারা আসলে অগণিত নক্ষত্রের তৈরি এক একটা বিশাল গ্যালাক্সি।

নক্ষত্রদের দূরত্ব নির্ণয় করা নিঃসন্দেহে অ্যাস্ট্রোনমির জন্য এক বিশাল অগ্রগতির কারণ।

এই লেখাটি নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয় সম্পর্কে।

নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয়ের জন্য বহু পদ্ধতি রয়েছে। আমি এই লেখায় দুটি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমটি হলো ত্রিকোণমিতিক পদ্ধতি। এর মাধ্যমে শুধু নিকটবর্তী নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। অন্যটি হলো ঔজ্জ্বল্যভিত্তিক। এর মাধ্যমে মূলত দূরবর্তী নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয় করা হয়।

স্টেলার প্যারালাক্স পদ্ধতি হলো নিকটবর্তী তারাদের দূরত্ব নির্ণয়ের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে খুবই সাধারণ ত্রিকোণমিতি ব্যবহার করে নিকটবর্তী তারাদের দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে নক্ষত্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, তারাগুলো একে অপরের সাপেক্ষে স্থির এবং নক্ষত্রগুলো বছরের সাথে সাথে আকাশের একপাশ থেকে অন্যপাশে ঘুরে। এ জিনিসটা হয় আসলে পৃথিবীর সূর্যের চারপাশে আবর্তনের কারণে। এভাবে যেকোনো একটা তারাকে ছয় মাস সময়ের মধ্যে লক্ষ করলে দেখা যাবে, সময়ের অন্তরে নক্ষত্রটির দুটি অবস্থানের জন্য পর্যবেক্ষণ স্থানে রেখা অঙ্কন করলে দুই রেখার মধ্যবর্তী একটি কোণ পাওয়া যায়। এই কোণটি হলো আসলে সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর ভিন্ন অবস্থানের জন্য ওই নক্ষত্রের সাথে তৈরি হওয়া কোণ। এই কোণটিকে খুবই সূক্ষ্মভাবে একটি বিশেষ যন্ত্র দ্বারা পরিমাপ করা হয়। নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয়ের জন্য এই কোণটিকে সূর্যের চারদিকে এমন সময়ে এবং এমন সময়ের ব্যবধানে নির্ণয় করা হয়, যে সময়ের জন্য পৃথিবীর দুই অবস্থানের দূরত্ব আমাদের ঠিকভাবে জানা আছে। সাধারণভাবে ছয়মাসের ব্যবধানে পৃথিবীর দুই অবস্থানের দূরত্ব হবে পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসের সমান অর্থাৎ ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ। এই মুহূর্তে সূর্য থেকে নক্ষত্রটির ওপর একটি রেখা অঙ্কন করলে রেখাটিকে ভূমি, পৃথিবী থেকে নক্ষত্রের দূরত্বকে অতিভুজ এবং পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বকে লম্ব ধরে একটি ত্রিভুজ কল্পনা করা যায়। পূর্বে নির্ণীত কোণটিকে 2থিটা ধরে নিলে ত্রিভুজটির ভূমি এবং অতিভুজটির মধ্যবর্তী কোণ হবে থিটা=নির্ণীত কোণ÷2। এখন ত্রিকোণমিতির সূত্র sin(থিটা)=লম্ব÷অতিভুজ ব্যবহার করে অতিভুজ তথা পৃথিবী হতে নক্ষত্রটির দূরত্ব নির্ণয় করা যায়।

সমস্যা হলো, এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ৪০০ আলোকবর্ষের (আলো এক বছরে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে এক আলোকবর্ষ বলে) বেশি দূরত্বের তারাদের দূরত্ব নির্ণয় করা যায় না। কেননা সেক্ষেত্রে নির্ণেয় কোণটির মান খুব ছোটো হয়ে যায়। এসব নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি হলো ঔজ্জ্বল্য। এ পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষিত ঔজ্জ্বল্য এবং বর্ণালি হতে প্রাপ্ত সম্ভাব্য ঔজ্জ্বল্যের তুলনা করে দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। এই পদ্ধতিটি বুঝার আগে অন্য একটি ব্যাপার বুঝতে হবে।

আকাশে দৃশ্যমান প্রতিটি তারার ঔজ্জ্বল্য ভিন্ন ভিন্ন। শুধু ঔজ্জ্বল্য দেখে দূরত্ব পরিমাপ করা অসম্ভব। কেননা দূরত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে আলোর ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পায়। অনেক দূর থেকে বৃহৎ আলোর উৎসের থেকে আসা আলোর চেয়ে কাছের ছোটো উৎসের থেকে আসা আলোর ঔজ্জ্বল্য বেশি মনে হয়। তাই ঔজ্জ্বল্য দেখে অনুমান সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন নক্ষত্রটির আসল ঔজ্জ্বল্য জানা। আসল ঔজ্জ্বল্য থেকে ঔজ্জ্বল্যের বিচ্যুতি তুলনা করে নক্ষত্রটির দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আসল ঔজ্জ্বল্য কীভাবে জানা যাবে?
ঔজ্জ্বল্য জানার জন্য প্রয়োজন নক্ষত্রটিতে কী কী পদার্থ আছে তা জানা। একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, আমরা যখন কোনো ধাতুতে তাপ দেই তখন উত্তপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তার থেকে নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের আলো নির্গত হওয়া শুরু করে। ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ হতে নির্গত আলোর কম্পাঙ্ক সবসময় ভিন্ন হয়। এখন কোনো নক্ষত্র থেকে আসা আলোকে প্রিজমের মধ্যে ফেললে যে বর্ণালি সৃষ্টি হয় তা থেকে নক্ষত্রে অবস্থিত পদার্থ এবং তাদের তাপমাত্রা নির্ণয় করা যায়। এই তথ্য থেকে নক্ষত্রের ভর, নক্ষত্রের আসল ঔজ্জ্বল্য এমন আরও অনেক তথ্য নির্ণয় করা যায় এবং প্রাপ্ত ঔজ্জ্বল্যের সাথে পর্যবেক্ষিত ঔজ্জ্বল্য তুলনা করে নক্ষত্রটির দূরত্ব নির্ণয় করা যায়।

বামন গ্রহ

মাহতাব মাহদী

সাল ২০০৬, ২৪ আগস্ট।
চেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী প্রাগ – এ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন (IAU) – এর অধিবেশন বসেছে। সাংবাদিকরা অপেক্ষা করছেন। অধিবেশনে বোমা ফাটাল IAU! সৌরজতের ৯ম গ্রহ প্লুটোকে আর গ্রহ না বলে বামন গ্রহ বলা হলো! সাথে তারা আরো দুটো বামন গ্রহের কথা জানাল। জেনা (এখন এরিস) আর সেরেস!
ক্লাইড টমবাউ বেঁচে থাকলে খুব কষ্ট পেতেন। কারণ ১৯৩০ সালে তাঁর আবিষ্কার করা প্লুটোকে গ্রহের তালিকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো ২০০৬ সালে!

বিজ্ঞান মহলে একটা উত্তেজনা দেখা গেল। কারণ এর আগে কখনোই গ্রহের সাথে বামন টার্মটা ব্যবহার করা হয়নি। শুধুমাত্র বামন নক্ষত্র ছিল। ফলে এটা একটা নতুন আবিষ্কার। তো বিজ্ঞানীদের অনেক প্রশ্ন ছিল। সবার প্রথমে যে প্রশ্নটা ওঠে সেটা হচ্ছে-

বামন গ্রহটা কী আসলে?

"বামন" (dwarf) কথাটির আভিধানিক অর্থ ছোটো আকার বা খর্বাকৃতি। সুতরাং, বামন গ্রহ বলতে বোঝায় ছোটো আকারের বা খর্বাকৃতির গ্রহ। এই সংজ্ঞাটি বর্তমানে কেবল সৌরজগতের জন্যই প্রযোজ্য। প্লুটো গ্রহটিকে নিয়ে বিতর্ক ওঠার পর উক্ত প্রতিষ্ঠানটি বামন গ্রহের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করে প্লুটোকেও বামন গ্রহের তালিকায় স্থান দেয়। এতে করে এখন পর্যন্ত বামন গ্রহের সংখ্যা হলো পাঁচটা। এরা হলো সেরেস, এরিস, হাউমেয়া,মেকমেক ও প্লুটো।

আচ্ছা, বুঝলাম। তো পার্থক্য কী গ্রহের সাথে?
একটি বামন গ্রহকে তার নিকটতম প্রতিবেশে অবস্থিত অন্য কোনো জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক বস্তুকে অপসারণ করতে হয় না। গ্রহের সাথে এটিই কেবল তার পার্থক্য। বর্তমানে পাঁচটি বামন গ্রহ পাওয়া গেছে যাদের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আরও যে বস্তুগুলো বামন গ্রহের মর্যাদা পেতে পারে তারা হলো: ৯০৩৭৭ সেডনা, ৯০৪৮২ অরকাস এবং ৫০০০০ কুয়াওয়ার। ১৯৩০ সালে আবিষ্কারের পর থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত প্লুটো সৌরজগতের নবম গ্রহ হিসেবে চিহ্নিত হতো। কিন্তু

অধুনা সৌরজগতে প্লুটোর মতো অনেক বস্তু আবিষ্কৃত হচ্ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এরিস যা প্লুটোর চেয়ে আকারে সামান্য বড়ো।

আচ্ছা, তো আকাশে এই বামন গ্রহকে কীভাবে চিনব? এর বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

IAU – এর সভায় বামন গ্রহের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, সেই মহাজাগতিক বস্তুকে বামন গ্রহ বলা হবে —

১. যার যথেষ্ট পরিমাণে ভর থাকবে, যাতে বস্তুটির মহাকর্ষ বল সেটিকে একটি গোলকের আকৃতি দেবে, অর্থাৎ বস্তুটিকে গোলাকার হতে হবে।
২. যেটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবে।
৩. যেটি নিজের কক্ষপথের আশেপাশের বস্তুকে সরিয়ে দিতে পারবে না।
৪. এবং যেটি উপগ্রহও নয়।

তার মানে আকাশে যদি এমন কোনো জ্যোতিষ্ক দেখা যায় যার মাঝে এই ৪টা গুণ আছে, তবে তাদেরকে বামন গ্রহ বলা যেতে পারে।

<u>তো এখন আসা যাক বামন গ্রহগুলোর পরিচয়েঃ</u>
<u>সবার প্রথমে স্টেজে আসছেন মিস্টার অভাগা</u>

দ্য প্লুটো :

বামন গ্রহ সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যের ৩ নং সূত্রটিই আমাদের এতদিনের চেনাজানা সৌরজগতের নবম গ্রহ প্লুটোকে গ্রহের মর্যাদা থেকে নামিয়ে বামন গ্রহে পরিণত করেছে। বাকি ৮টি গ্রহের মতো প্রায় সব বৈশিষ্ট্য থাকলেও প্লুটো তার কক্ষপথের আশেপাশের বস্তুসমূহকে সরিয়ে দিতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে নেপচুনের পর সৌরজগতের প্রায় শেষ প্রান্তে যে কুইপার বেল্ট অংশ আছে, সেখানে ভেসে থাকা কোটি কোটি মহাজাগতিক বস্তুর মধ্যে প্লুটো অন্যতম। তাই প্লুটোর কক্ষপথ এবং কক্ষতলও অন্যান্য গ্রহের থেকে আলাদা। প্লুটোকে সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম বামন গ্রহের আখ্যা দেওয়া হয়েছে ২০০৬ সালে। মিথেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইডসমৃদ্ধ প্লুটো মাত্র ৬০০০ কি.মি. ব্যাসবিশিষ্ট এবং প্লুটো থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় ৫৯২.৪১ কোটি কি.মি.। একবার পূর্ণ আবর্তনে প্লুটো সময় নেয় ৬ দিন ৯২ ঘণ্টা এবং সূর্যের চারদিকে একবার পূর্ণ পরিক্রমণে সময় লাগে ২৪৮ বছর। প্লুটোর পৃষ্ঠদেশের
গড় তাপমাত্রা – ২৩০° সেন্টিগ্রেড।

এরপর আসছেন বড়ো ভাই এরিস :

এটা সবচেয়ে বড়ো ডোয়ার্ফ প্ল্যানেট। সালাম দেন। এরিস হলো নেপচুনের পর কুইপার বেল্ট অংশে ভেসে থাকা একটি গোলাকার মহাজাগতিক বস্তু।
সূর্য থেকে প্রায় ৬৮ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থানকারী এরিস হলো বৃহত্তম বামন গ্রহ। বহিঃস্থ বামন গ্রহের অন্তর্গত এরিস ২০০৫ সালে আবিষ্কৃত হয়।

ছোটো ভাই খ্যাত সেরেস :

মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে অবস্থিত সেরেস বামন গ্রহটি হলো সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহাণু। ইতালির জ্যোতির্বিদ জুসেপ্পি পিয়াজ্জি ১৮০১ সালের ১ জানুয়ারি এটি আবিষ্কার করেন। গ্রহাণুটি প্রায় ৯০০

কি.মি. নিরক্ষীয় ব্যাস বিশিষ্ট এবং সূর্য থেকে এর দূরত্ব মাত্র ৪৬.৩৯ কোটি কি.মি.। সেরেস একবার পূর্ণ আবর্তনে ৯ ঘণ্টা ৪ মিনিট এবং সূর্য পরিক্রমণে ৪ বছর ২২৬ দিন সময় নেয়।
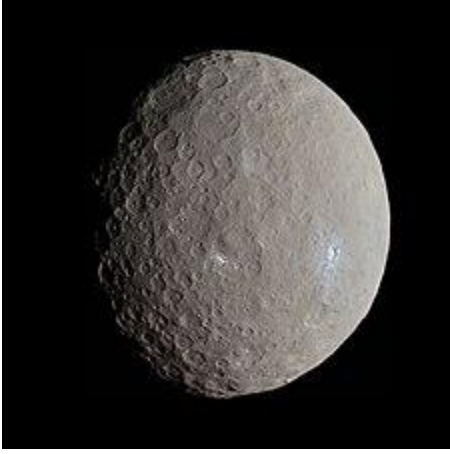
স্পিড বস হাউমেয়াঃ

স্পিড এর মূল কথা! যত দূরেই হোক, আগে দৌড়ায়! হাউমেয়া সবচেয়ে দূরের গ্রহ, নেপচুনেরও বাইরে। ২০০৪ সালে জ্যোতির্বিদ মাইক ব্রাউনের নেতৃত্বে একটি অনুসন্ধানী দল হাউমেয়াকে খুঁজে বের করে। তবে এটি বামন গ্রহ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এর ভর প্লুটোর তিন ভাগের এক ভাগ ও পৃথিবীর ৬৪০০ ভাগের এক ভাগ। সূর্যকে ঘুরে আসতে সময় লাগে প্রায় ২৮৪ বছর। এখন পর্যন্ত এর দুটো উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। এ বামন গ্রহটিতে এক দিন হয় মাত্র চার ঘণ্টায় । কারণ হলো দ্রুত আবর্তন। ৬০০ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি চওড়া সৌরজগতের অন্য যে কোনো বস্তুর চেয়ে এটি দ্রুত ঘোরে।

বোন মেকমেক:

এই বামন গ্রহটার সৌরজগতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। গ্রহটার অবস্থান এরিসের সাথেই। ২০০৫ সালে আবিষ্কৃত হয়েছে এই গ্রহ। এরিস ও মেকমেক এই দুইটা গ্রহকে দেখেই ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন গ্রহের সংজ্ঞা পরিবর্তন করতে ও বামন গ্রহের থিওরি আনতে সক্ষম হয়। এই গ্রহটা হাউমেয়ার মতো ফাস্ট না, তবুও এখানে দিন হয় সাড়ে ২২ ঘণ্টায়। ধারণা করা হয়, এর পৃষ্ঠ বরফ আর পাথরের তৈরি।
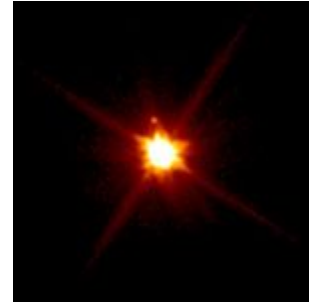
তো, মোটামুটি এই পাঁচটাই বামন গ্রহ। আরো বেশ কিছু গ্রহ বামন গ্রহের মতো হলেও সব বৈশিষ্ট্য না থাকার জন্য তাদের আর বামন গ্রহের অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে প্লুটোও তার গ্রহের মর্যাদা ফিরে পেতেও পারে।

গোল্ডিলক জোনের বাইরে প্রাণ

সমুদ্র জিত সাহা

মহাবিশ্বের অন্যসব জায়গায় প্রাণ খোঁজার আগে আমাদের আগে বুঝতে হবে প্রাণ কত প্রকার ও কী কী। প্রাণের বৈশিষ্ট্য কী, প্রাণ তার গ্রহ বা উপগ্রহে কেমন প্রভাব ফেলে হ্যান ত্যান... কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত শুধু এক প্রকার প্রাণের ব্যাপারে জানি, DNA based life. আমাদের দেখা সকল জীব DNA/RNA ভিত্তিক। সবাই কোষ দ্বারা তৈরি। আমাদের এই এক প্রকার প্রাণ সৃষ্টি ও বিকাশের জন্য জৈব যৌগ আর শক্তির উৎসের আগে প্রথম শর্ত হলো তরল পানি, Liquid water. যার ফলেই আমাদের কোষের আকৃতি বজায় থাকে, কোষ ঝিল্লির অনুগুলোর হাইড্রোফিলিক ও হাইড্রোফোবিক প্রান্তগুলো মিলে একটা বদ্ধ কাঠামো গঠন করে। ঠিক এজন্যই, পৃথিবীর বাইরে প্রাণের অস্তিত্ব খোঁজার জন্য আগে আমরা তরল পানি খুঁজি। এখান থেকেই আসে কোনো প্ল্যানেটারি সিস্টেমের হ্যাবিটেবল জোন বা গোল্ডিলক জোনের ধারণা। হোস্ট স্টারের থেকে যে দূরত্বে থাকলে গ্রহের তাপমাত্রা পানি বাষ্পীভূত হওয়ার মতো বেশি হবে না আবার পানি বরফে পরিণত হওয়ার মতো কমও হবে না। অর্থাৎ, কোনো সোলার সিস্টেমের যে রেঞ্জে তরল পানি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি তাকে বলা হয় গোল্ডিলক জোন। এক্সোপ্লানেট খোঁজার ক্ষেত্রে আমরা শুরুতেই গোল্ডিলক জোনের দিকে তাকাই। কিন্তু আসলেই এর দরকার আছে কি? গোল্ডিলক জোনের বাইরে প্রাণ থাকার সম্ভাবনা নেই?

এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই আমরা দশকের পর দশক ধরে মহাকাশে পাঠানো স্পেইস প্রোবগুলোর কল্যাণে। এখন আলোচনা করব, আমাদের সোলার সিস্টেমে গোল্ডিলক জোনের বাইরে প্রাণের সম্ভাবনা ও লিকুইড ওয়াটার নিয়ে।
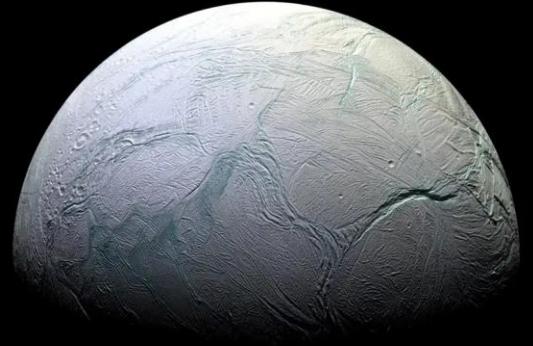
Enceladus:

শনির সামান্য এক ছোটোখাটো উপগ্রহ, বিজ্ঞানীদের আগ্রহের কোনো কারণই ছিল না এর প্রতি। ইন্টারেস্টিং কিছু পাওয়ার কোনো আশাই ছিল না। বরফাবৃত উপগ্রহ, সূর্যের থেকে এত দূরে থাকায় আলো, উষ্ণতার অভাবে তরল পানি থাকার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না আপাতদৃষ্টিতে। কিন্তু শনিকে প্রদক্ষিণ করে ঘোরা ক্যাসিনি স্যাটেলাইটের তোলা এক ছবি বিশ্লেষণ করে বিস্ময়কর জিনিস দেখা গেল। ঝর্ণার মতো পানি

ছিটকে বের হচ্ছে ক্যাসিনি থেকে! বরফের ফুটো থেকে পানি ছিটে বের হচ্ছে! কাছ থেকে দেখার জন্য ক্যাসিনিকে চালানো হলো এর দিকে, Enceladus এর সার্ফেস হতে বিপজ্জনক পরিমাণ উঁচুতে ক্যাসিনিকে চালানো হলো। কারণ একটাই, ক্যাসিনিতে ছিল যৌগ ডিটেকশন করার যন্ত্র, মূল উদ্দেশ্য ছিল শনির বলয়ের বস্তুগুলো কী দিয়ে তৈরি সেটা দেখা।
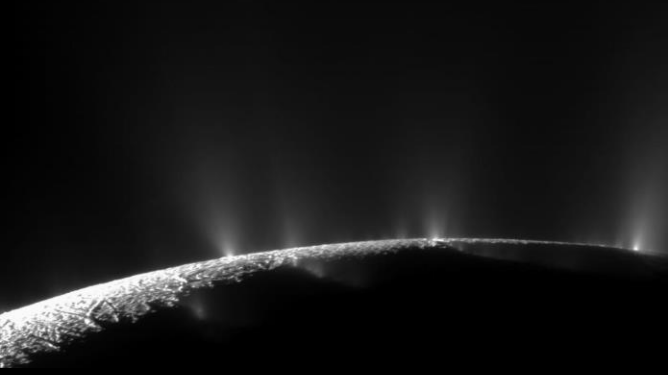
যাই হোক, ইউসেলেডাসের সেই পানি বিশ্লেষণ করে দেখা গেল এতে আছে লবণ ও কিছু জৈব যৌগ! বিচার বিবেচনা করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে ইউসেলেডাসে তরল পানির সাগর আছে বরফস্তরের নিচে। এই সাগর এতই গভীর যে নিচের খনিজপূর্ণ তলে গিয়ে ঠেকেছে, যা কিনা এই লবণের উৎস। আর জৈব যৌগগুলোর উৎস সাগরের তলের থার্মাল ভেন্টগুলো। কিন্তু কীভাবে সম্ভব সূর্য থেকে এত দূরে এত কম তাপমাত্রায় তরল পানি। ইউসেলেডাস তো সেরকম জিওলজিক্যাল এক্টিভিটির জন্য যথেষ্ট ভারীও না, উত্তপ্ত কোর এর তো প্রশ্নই আসে না।

সমাধান টা হলো টাইডাল হিটিং।
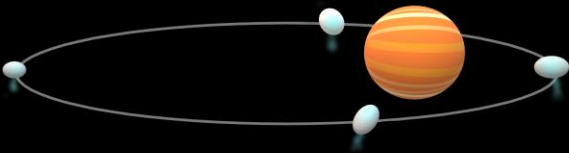
এনসেলেডাসের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার, অর্থাৎ শনিকে প্রদক্ষিণের কোনো পর্যায়ে এটি গ্রহের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে, আবার কোনো সময়ে অনেক দূরে। যখন শনির খুব কাছাকাছি অবস্থান করে তখন বিশাল ভরযুক্ত শনির তীব্র মহাকর্ষ বল আর গ্রাভিটির ইনভার্স স্কয়্যার সূত্র অনুসারে এনেসেলেডাসের শনির কাছের অংশ আর বিপরীত অংশের প্রতি শনির টানের পার্থক্য বিশাল হয়। ফলস্বরূপ, এনসেলেডাসের ক্রাস্ট ভেঙে উঠে আসার চেষ্টা করে, এনসেলেডাসের আকৃতি পরিবর্তন হয়। ক্রাস্টের এই উঠে আসার চেষ্টায় ঘর্ষণে প্রচুর পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়, আর এটাই যথেষ্ট তরল পানির জন্য।

এখন আসি এনসেলেডাসে প্রাণের সম্ভাবনা নিয়ে। এরকম গভীর তলদেশে উত্তপ্ত পরিবেশে জৈব যৌগ আর খনিজ পদার্থের সমারোহে প্রাণের বিকাশ সম্ভব কি? পৃথিবীতেই তো এরকম পরিবেশ আছে সমুদ্র তলদেশে, আর সেখানে প্রাণ শুধু কোনোমতেই বাঁচে না বরং প্রচুর ভ্যারাইটি নিয়ে বিশাল পরিমাণে প্রাণী বাস করে। They just don't survive, they trive!! আর পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে সবচেয়ে লজিক্যাল ও বিখ্যাত ধারণাগুলোর একটাই হলো এই উপায়ে প্রাণের বিকাশ। এনসেলেডাসে প্রাণের সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি! এজন্যই শনিকে প্রদক্ষিণ করা ক্যাসিনির জ্বালানী শেষ হয়ে গেলে একে এনসেলেডাসের আশেপাশে না রেখে শনির আবহাওয়ায় প্রবেশ করিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, এনসেলেডাসের বিকাশমান প্রাণের জন্য ক্ষতিকর হতে পারত ওখানে ক্র্যাশ করলে! ভবিষ্যতে এনসেলেডাসে ক্যামেরা, ড্রিলসহ রোভার(!) পাঠানোর চিন্তাভাবনা চলছে।
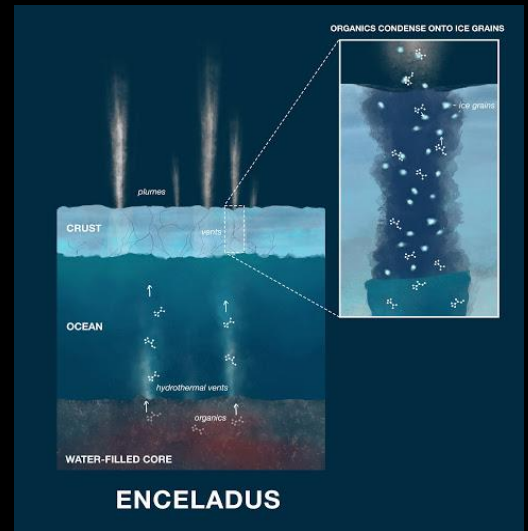
Europa:

গ্রহরাজ বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপার গল্পটাও অনেকটা একই। এর গায়ের বরফের প্যাটার্ন দেখে বোঝা যায় এর নিচেও বিশাল সাগর থাকতে পারে। ইউরোপার ভর যথেষ্ট সমুদ্র তলদেশের জিওলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ও থার্মাল ভেন্টের জন্য। এখানেও তরল পানিতে প্রাণের সম্ভাবনা রয়েছে, হয়তো কিছু মাইক্রোবস এখনই বাস করে সেখানে।
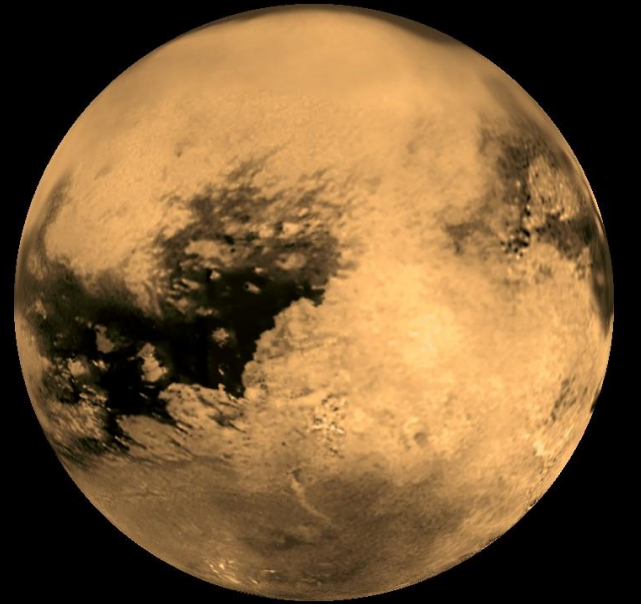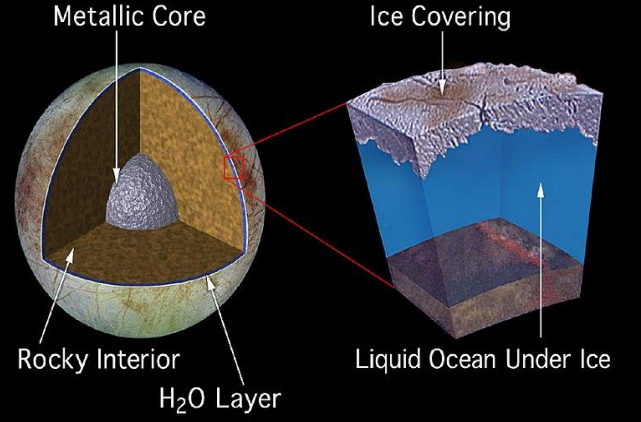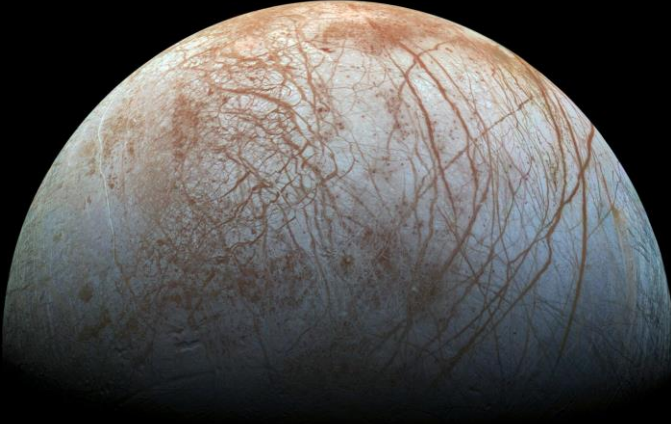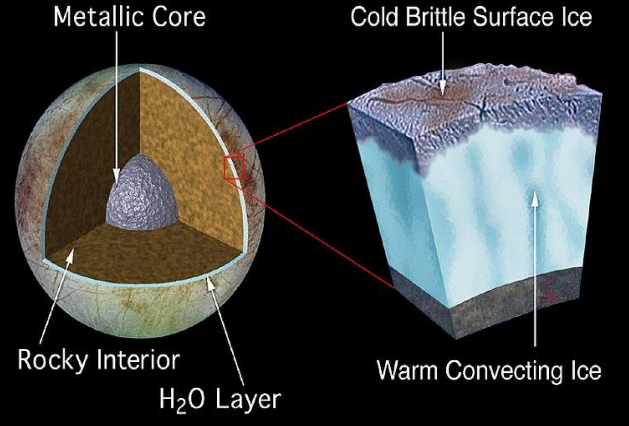
Titan

Titan:

সৌরজগতের সব উপগ্রহের মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হলো শনির উপগ্রহ টাইটান। ঘন মেঘে আবৃত বায়ুমণ্ডলের জন্য এর সার্ফেসের প্রায় কিছুই দেখা যায়না পৃথিবী থেকে। সেই মেঘের ওপর সূর্যের আলোর রিফ্লেকশনের বর্ণালী পরীক্ষা করে বোঝা যায় এর অধিকাংশই মিথেন, CH4; জি হ্যাঁ, আপনার বাড়ির গ্যাসের সিলিন্ডারে অবস্থিত গ্যাস, তাও আবার বিপুল পরিমাণে। চাঁদের পর টাইটানই একমাত্র উপগ্রহ যার সারফেসে ল্যান্ডার ফেলা হয়েছে। সেই ল্যান্ডারের ছবিতে দেখা গেছে লেক, নদী, পাহাড়, প্রবাহির ঘর্ষণের ফলে গোলাকৃতির পাথর! কিন্তু সূর্য থেকে এত দূরে -১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এত কিছু! আসলে পানি ০ ডিগ্রিতেই বরফ হলেও, ০ ডিগ্রিতে গ্যাস মিথেন -১৮০ ডিগ্রিতে তরল মিথেন। হ্যাঁ, টাইটানে মিথেনের নদী বইছে। আর ওই পাহাড়গুলো সব বরফের পাহাড়। চিন্তা করুন টাইটানের লেকে নৌকা বেয়ে চলা! পাহাড়-নদীর সুন্দর (হলদে!) ভিউ এঞ্জয় করা! টাইটানে জৈব যৌগের অভাব নেই। এত কম তাপমাত্রায় টাইটানে প্রাণ আছে কি না বলা মুশকিল, সম্ভাবনা কম। তবে ধারণা করা হয় সূর্যের শেষ বয়সে যখন এটি রেড জায়ান্টে পরিণত হবে তখন পৃথিবীকে খেয়ে ফেলার মতো বড়ো হবে, আর টাইটান থাকবে পার্ফেক্ট তাপমাত্রায়। হয়তো তখন টাইটানে খেলে বেড়াবে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের প্রাণীরা!
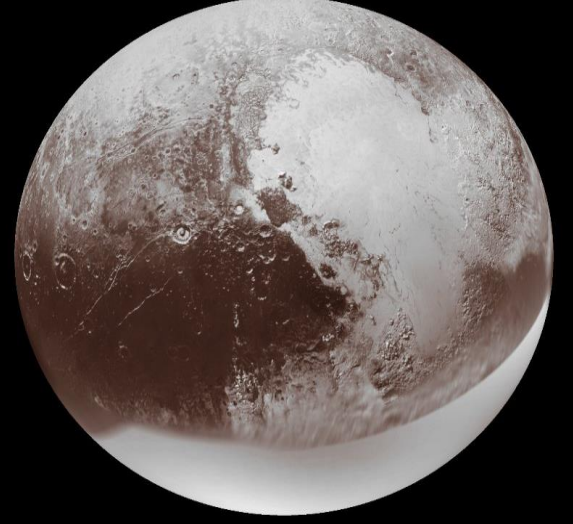
Pluto:

দশকের পড় দশক ধরে আমরা প্লুটোকে ধূসর কোনো ছোটো পাথর খণ্ড বলেই জেনেছি, এতই ছোটো যে জিওলজিকাল অ্যাক্টিভিটি তো দূরের কথা, নিজের কক্ষপথেরই শাসক নয় প্লুটো। যে কারণে একে গ্রহের মর্যাদা থেকেও বাতিল করা হয়েছে। এমনিতেই সাইজে ছোটো, তার ওপর সূর্য থেকে এত্ত দূরে, প্রাণের সম্ভাবনা শূন্যেরও কম ধরে নেওয়ার মতো ছিল! কিন্তু আমাদের অবাক করে দিল New Horizon স্যাটেলাইটের পাঠানো ছবি, প্লুটো যে এত সুন্দর সেটা ধারণার অতীত ছিল, সে কথা নাহয় বাদই দিলাম। প্লুটোর গায়ের বরফের একদিকে পাওয়া গেল এক ধরনের প্যাটার্ন, যা শুধু তরল ও কঠিন হওয়ার চক্রে দেখতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ, ওই অংশের নিচে তরল পানি আছে! কিন্তু কীভাবে সম্ভব? এর উত্তর আজও নিশ্চিতভাবে জানা নেই, তবে ধারণা করা হয় ওখানে কোনো বড়োসড়ো উল্কা পড়ে ভেতরে ঢুকে গেছে, যা ওই তাপের উৎস। প্লুটোর কক্ষপথে তো এসবের অভাব নেই! তবে দুঃখজনকভাবে আমরা প্লুটোর শুধু একদিক পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছি, এখানে প্রাণের আশা করাটা অতিরিক্ত মনে হলেও
অসম্ভব কিছু না।
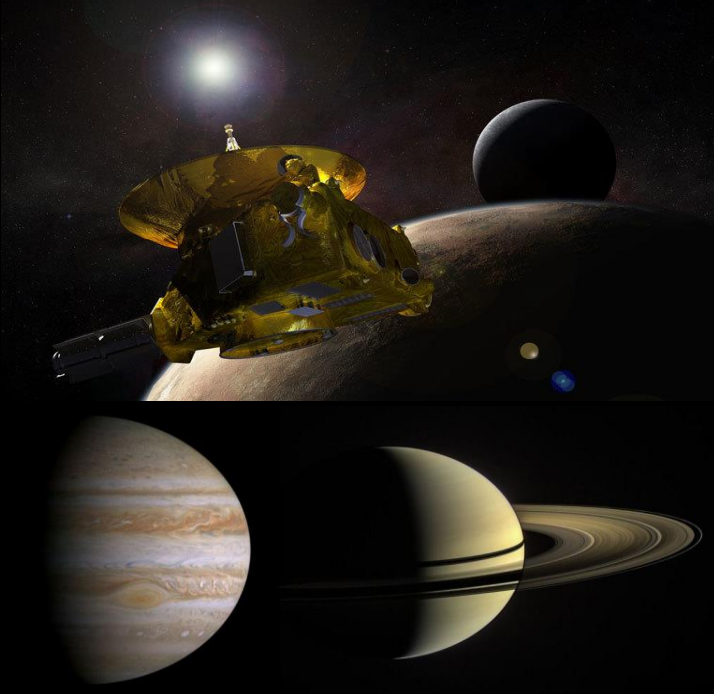
Jupiter and Saturn:

দুই গ্যাস-জায়ান্ট বৃহস্পতি আর শনি, বিশাল সাইজের এই গ্রহদুটোর প্রায় পুরোটাই গ্যাস, একদম ভেতরে হয়তো কঠিন সার্ফেস আছে, হয়তো নেই। থাকলেও অত গভীরে ভয়াবহ চাপে প্রাণের সম্ভাবনা একেবারেই নেই। তারপরও কেন ঢুকালাম এদের এই তালিকায়? কারণ শনি বা বৃহস্পতির ওপর থেকে যতই গভীরে যাওয়া যায় ততই চাপ বাড়তে থাকে, চাপ বাড়তে বাড়তে নিঃসন্দেহে এমন বিশাল এক লেয়ার আছে যেখানে তরল পানি পাওয়া যাবে, জিওলজিকাল এক্টিভিটির জন্যও গ্রহদুটো যথেষ্ট(!) বড়ো। আর প্রাণ সৃষ্টিও এত কঠিন বা অস্বাভাবিক বিষয় না। সুতরাং, আশা রাখা যেতেও পারে।

পরিশেষঃ

আজকের আলোচনা শেষ করব আমার খুব প্রিয় একটা ছবি দিয়ে। New Horizon যখন প্লুটোকে পার করে সৌরজগতের বাইরের দিকে যেতে থাকে তখন শেষবারের মতো তার ক্যামেরা ঘুরিয়ে একটা ছবি নেয় প্লুটোর, যেখানে সূর্য ঠিক বিপরীতে, আর সূর্যের আলো পড়ছে প্লুটোর বায়ুমণ্ডলে, সুন্দর নীলচে পাতলা মনোমুগ্ধকর বায়ুমণ্ডল। ছবিটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি অনেকসময়। এই ছবিটা অনেক কিছু তুলে ধরে, স্পেইস এক্সপ্লোরেশন শুরু করেছি আমরা মাত্র কয়েক দশক ধরে। অনেক দূর পৌঁছেছি আমরা, অনেক দূর। কিন্তু এটাই শুরু, এই অনেক দূর মহাজাগতিক ক্ষেত্রে সামান্য দূর, কেবল সৌরজগতের বাইরে যাচ্ছে আমাদের যন্ত্রগুলো। আমাদের আরো আগাতে হবে, যতদূর এসেছি তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আরো দূর যেতে হবে।

চলুন প্লুটো-র উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করা যাক

Cassini

IO
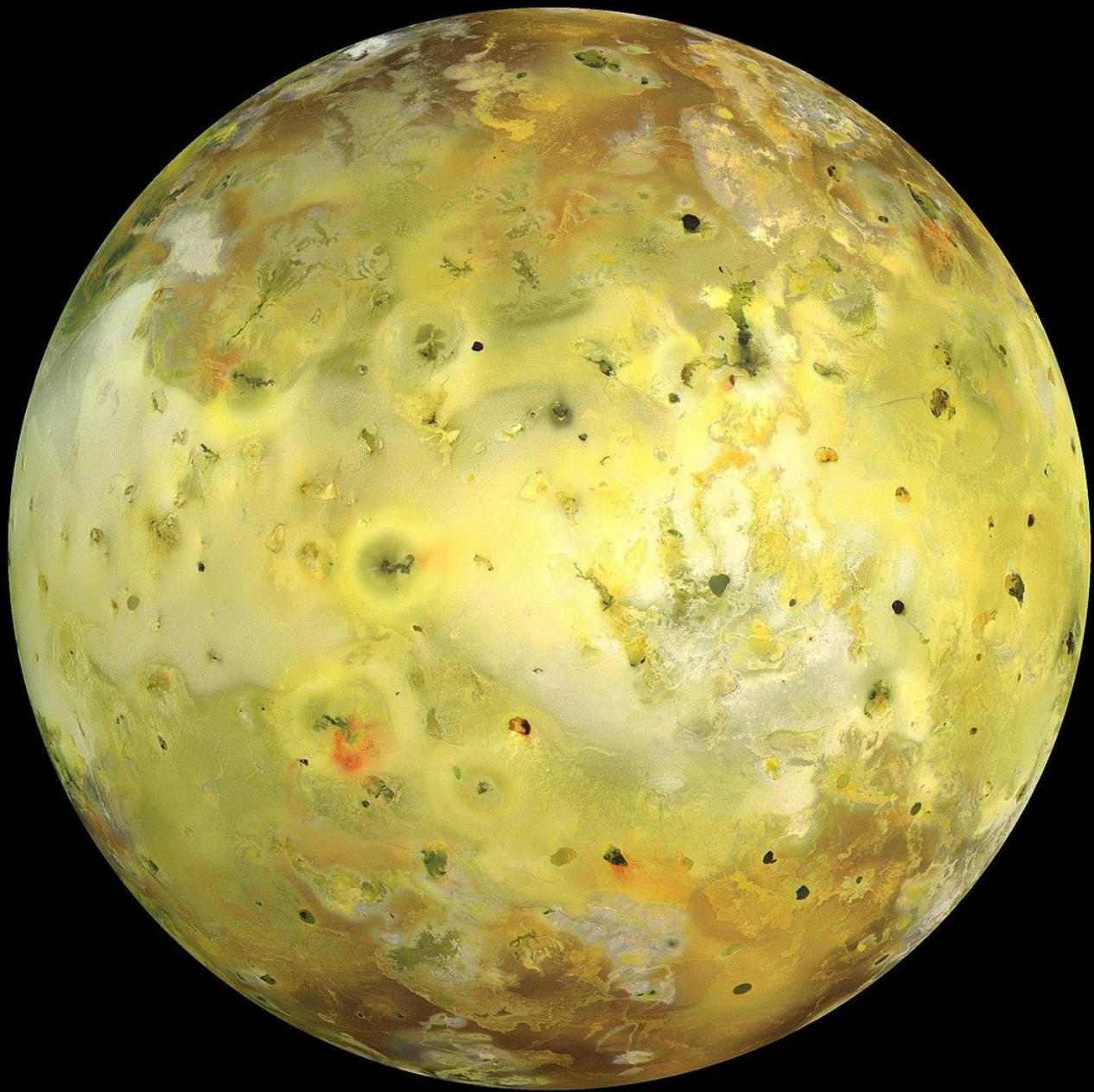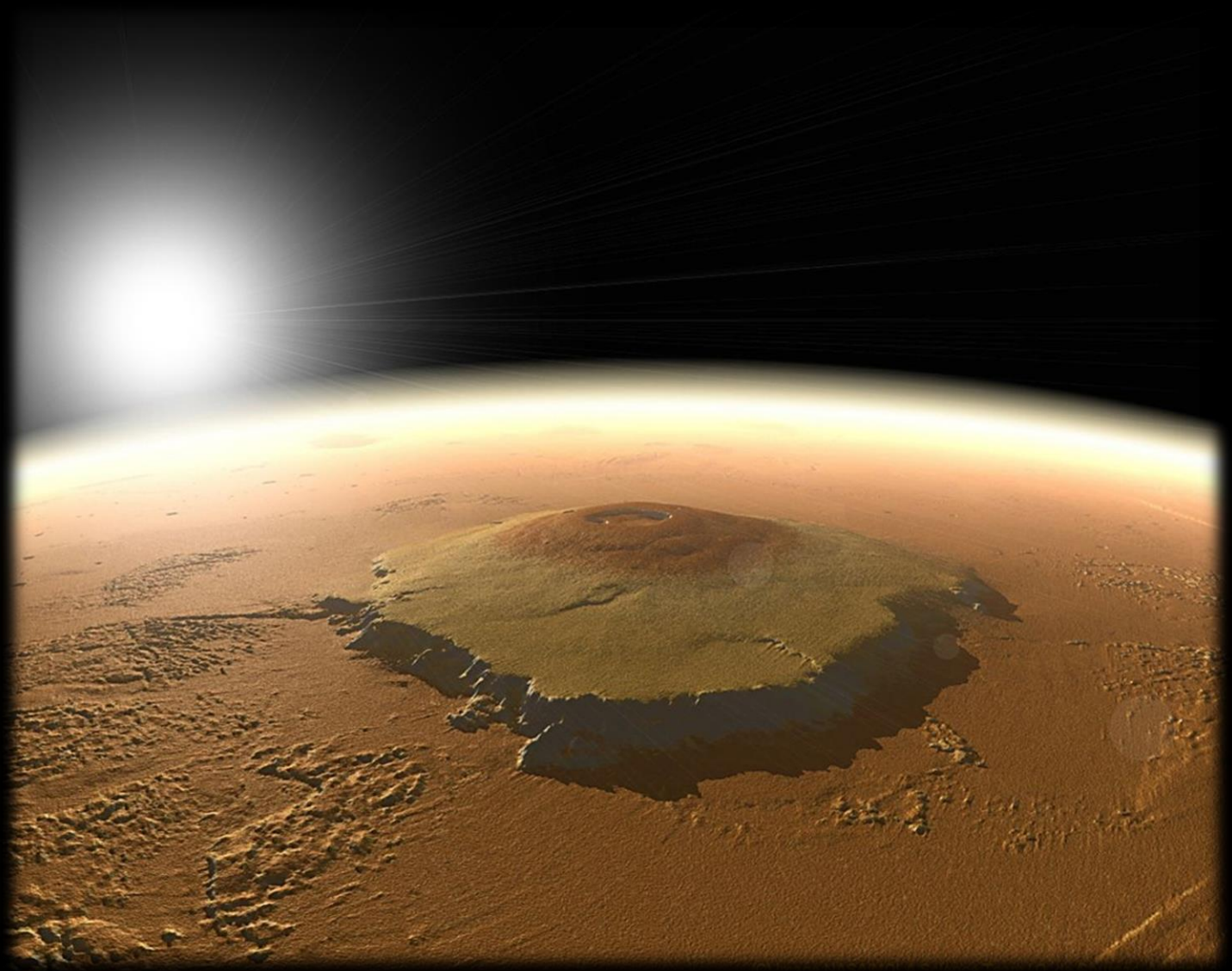
Mars volcano

Venus surface
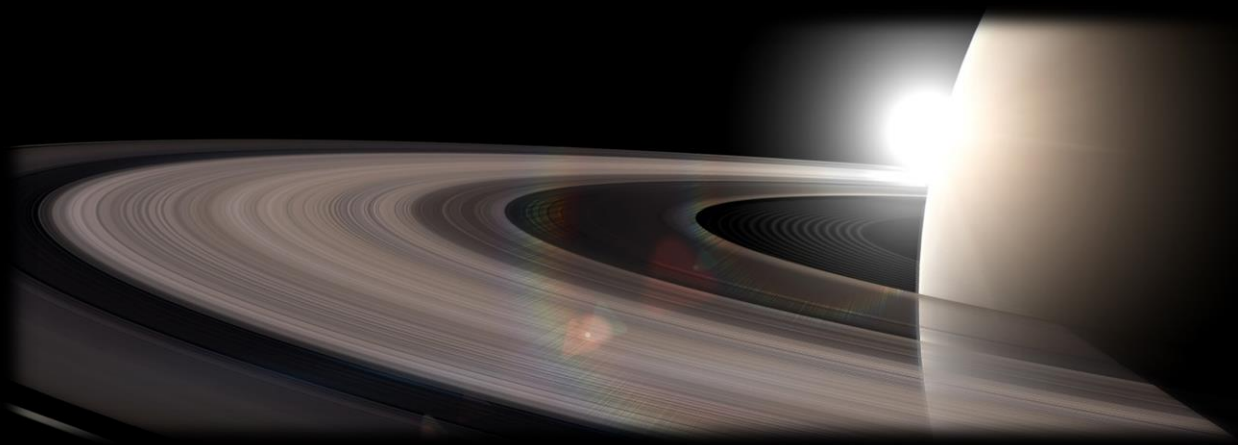
Saturn Ring

Solar flare

Preserverance

অবশেষে প্লুট-র উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু

চলতে থাকুন...

চলতে থাকুন...

চলতে থাকুন...

চলতে থাকুন...

চলতে থাকুন...

দূরে

আরও দূরে

এইতো একটু দূরে

চলতে থাকুন...

প্রায় কাছাকাছি

আর একটু

এইযে চলে এসেছি

চলে এসেছি...

Thank You

প্লুটো (Pluto)

মুস্তফা কামাল জাবেদ

নীল গ্রহ নেপচুন থেকে অনেক আগেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে ফেলতে হয়েছে। 'নীল নীল নীলাঞ্জনা' গানটা গেয়েও তেমন ফল মেলেনি। বুকে ভোলাগঞ্জের বিশাল পাথর বেঁধে এবার রওনা দিলে বামন গ্রহ প্লুটোর দিকে। শুভ যাত্রা!

কুইপার বেল্টের হাজারটা জঞ্জাল পাড়ি দিয়ে যখন তুমি প্লুটোর কাছে পৌঁছলে তখন মনের মধ্যে কীরকম জানি কু ডাক শুরু হলো। পাতালপুরীর এ দেবতার ওপর আরোহণের আগেই যেন কেউ ঘণ্টা বাজিয়ে তোমায় সতর্ক করে দিচ্ছে। মিরাকেলের মতো আসা সতর্কবাণীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নামতে শুরু করতেই তোমার কাছে সবকিছুই অদ্ভুতভাবে ৬৫ গুণ স্লো মোশনে চলতে শুরু করল। স্লো মোশন ড্রামা অনেকক্ষণ চলার পর অবশেষে তুমি আস্তে করে সারফেসে ল্যান্ড করলে। ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া গ্লাস পরিস্কার করতেই রক্ত, মস্তিষ্ক, হাত-পা, শরীরের প্রতিটি অর্গানই হিম করে দেওয়ার মতো যথেষ্ট ভয়ংকর দৃশ্য নজরে আসলো। অন্ধকার এ পাতালপুরীর রাজ্যে আর কেউ নেই!

শুধু তুমি আর বরফ, বরফ আর তুমি!
আর বোনাস হিসেবে চারপাশে হাজারটা গ্রহাণু আর তারা। প্লুটো আঙ্কেলের ভেতরে শক্তপোক্ত পাথর থাকলেও বাইরে শুধুই বরফের কারখানা! গলন্ত অবস্থায় এগুলো দেখতে চাইলে আরো ২৪৮ বছর অপেক্ষা করতে পারো যাতে সুয্যিমামা ওগুলো গলিয়ে দেন।

তখন হয়তো ঝামেলা আরো বাড়বে! নাইট্রোজেন, মিথেন হ্যারি পটারের ডিমেন্টরদের মতো বাতাসে ভেসে বেড়াবে যা তোমার ফুসফুসের জন্য খুব একটা উপকারী না। লাভের মাঝে লাভ কয়েকটা চুপসানো পটেটো চিপস ফুলিয়ে নিতে পারো।

সারফেসের -২২৩° সেলসিয়াস তাপমাত্রাটাও আরামদায়ক না, তোমার মতো হোমো স্যাপিয়েন্সকে জমিয়ে ফেলার জন্য যথেষ্ট। স্পেইস স্যুটটার ওপরও ভরসা রাখা যায় না, হাজার হলেও গুলিস্তানের জিনিস।
এখন সুয্যিমামাকে ডাকা ছাড়া উপায় নেই।
কেন যে ছোটোবেলায় শুধু চাঁদ মামাকে ডাকা শিখলে এটা ভেবে এখন হেলমেটের ওপর দিয়ে চুল ছেঁড়ার চেষ্টা করছ। চুল ছিঁড়েও লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না। পৃথিবীতে বসে আগে শুক্রের আলো নিয়ে যে টিটকারি মারতে সেই একই টিটকারি এখন তোমার ওপর রিভার্স হয়ে এসে পড়েছে। ৬০০০ গুণ মলিনতায় জীবন টেকানোর ফন্দি আঁটা উচিত হবে না।
অর্ধেক আমেরিকার সাইজের এ বামন গ্রহে হাঁটতে বের হয়ে বারবার পা পিছলে যাচ্ছে। স্পেইস স্যুটের বারোটা বাজার ভয়ে কয়েকটা হার্ট বিটও মিস হচ্ছে। ১৫৩ ঘণ্টার দিনটা যেন কাটছেই না। হঠাৎ নজরে আসল মৃত্যুপুরীর আত্মাকে বয়ে নিয়ে চলা মাঝি শেরনকে। মিথ যাই বলুক, দুজনের মাঝে টাইডাল লকের মতো অদ্ভুত, তোমার মুখ না দেখলে দিন কাটে না টাইপ ব্যবস্থা দেখে তোমার মনে হতেই পারে যে ওরা ৪ সন্তান কনসিস্ট করা হ্যাপি ফ্যামিলির জনক জননী।
হ্যাপি ফ্যামিলি দেখে তোমারও ফ্যামিলির কথা মনে পড়ে গেল।যাদের কাছে এখন আলোর বেগে মেসেজ পাঠালেও প্রায় ৪.৫ ঘণ্টা লাগবে পৌঁছতে।

একটু পরেই ৩৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বইতে শুরু করল। টেনজিং মন্টে নামক ৬ কি:মি: উঁচু পর্বতের নিচে আশ্রয় নিয়েও ঝড় থেকে বাঁচার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হচ্ছে না। ঝড়ের সাথে সাথে হালকা নীল আকাশে লাল রঙের তুষার বইতে শুরু করল। নস্টালজিয়া ফিল না করে এখনই পালাতে হবে।
বেঁচে থাকলে ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে পৃথিবীর শ্বেত শুভ্র তুষারই না হয় দেখা যাবে।
তুমি প্লুটোর মায়া কাটিয়ে অনেক দূর চলে এসেছ। দূর থেকে টমবাউ রেজিও নামক হার্ট শেপড ভালোবাসা নজরে পড়ল। যে ভালোবাসা শুধুই শেরনের জন্য!

এক নজরে প্লুটো

ব্যাস: 2376.6 কি.মি

সূর্যের থেকে আনুমানিক দূরত্ব: 590 কোটি 91 লক্ষ কি.মি

সূর্য-পরিক্রমার সময়: 248 বছর

নিজ অক্ষে ঘোরার সময়: 6.387 দিন

উপগ্রহ: 5 টি

গড় তাপমাত্রা: মাইনাস 229 ডিগ্রি সেলসিয়াস

ঘনত্ব: 1.854 গ্রাম/সে.মি

গ্র্যাভিটেশনাল ত্বরণ: 0.620 মি/সে

ভর: 1.303×10^{22} কেজি

উওর্ট ক্লাউড

মুস্তফা কামাল জাবেদ

অনেক অনেক দিন আগের কথা। কত আগের? বেশি না, মাত্র ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগের। তখন মোটাসোটা, কিউট একটা নেবুলা থেকে আমাদের সুয্যি মামা তৈরি হচ্ছিল। মামাটা ছিল বেজায় রাক্ষুসে! নেবুলার প্রায় ৯৯% নিজেই খেয়ে ভাগ্নে ভাগ্নিদের জন্য শুধু ১% রেখেছিল। দুষ্টু মিষ্টি ফুল ফ্যামিলি ফর্ম করার পরে ধ্বংসাবশেষ যা ছিল ওগুলোতে যেন সবার অ্যালার্জি তৈরি হয়েছিল। তাই গা রি রি করা এই সিচুয়েশন থেকে বাঁচতে সবাই ওগুলোকে তাড়িয়ে দিতে শুরু করে। আর বৃহস্পতিটা ছিল মহা পাজি, বেচারা এই কাজে যেন কোমর বেঁধে নেমে পড়ে।

(কেউ কেউ অবশ্য ঘুষ খাইয়ে ছাড়ও পেয়েছিল!)

এই যে জিনিসগুলোকেই আজ তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সেগুলো আর সুয্যি মামার চুরি করা জিনিসপত্র থেকে ফর্ম করে দ্য গ্রেট উওর্ট ক্লাউড!

সৌরজগতের বাউন্ডারি কী?

নেপচুন?

প্লুটো?

কুইপার বেল্ট?

নাহ, সৌরজগৎ আরো বিশাল। এই বিশালতার কাছে নেপচুন, কুইপার বেল্ট খুব বড়ো ইস্যু না।

অনেক দূরের এই ক্লাউডের জগৎ কুইপার বেল্ট কিংবা মানুষের পরার বেল্টের মতো ডিস্ক টাইপ না, এটা সেই

চিরাচরিত গোলাকার আকৃতির। ঠিক যেন কেউ চুইংগাম দিয়ে বাবল ফুলিয়ে মাঝখানে কয়েকটা প্ল্যানেট আর সাথে নানান টাইপের জিনিসপত্র ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়েছে। যেখানে ঘুরে বেড়ায় হাজারটা ধূমকেতু,ওহ শিট!

হাজারটা হবে কেন? হাজার না, মিলিয়ন-বিলিয়নও না, ট্রিলিয়নের মতো জিনিসপত্র ওখানে হা-ডু-ডু খেলছে। কেউ সত্যিকারের পাহাড়ের মতো বড়ো, কেউ আবার প্লাস্টিকের খেলনা পাহাড়ের মতো। আজব ব্যাপার হলো ওখানেই ঘুরে বেড়ায় পাশের বাসার আন্টির ছোট্ট মেয়ে সেডনা।

আচ্ছা, গোলাকার এই মেঘের রাজ্যে বাচ্চাকাচ্চারা কীভাবে ঘোরাঘুরি করে?

উত্তর: যেমন খুশি তেমনভাবে! কেউ ঘুরছে x অক্ষে, কেউ বা আবার z অক্ষে। অন্য কারও যদি শখ হয় তাহলে সে সেটার সাথে কিছু ডিগ্রিও জুড়ে দেয়। ট্রান্স নেপচুনিয়ান অবজেক্টের দুনিয়া থেকে প্রায়ই লং পিরিয়ডের গ্রহাণু আমাদের এদিকে বেড়াতে আসে। এইতো সেদিনই ২০১৩ সালে C/2013 A1 Siding Spring নামক বুড়ো গ্রহাণু সূর্যের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে গেল, তার দেখা আবার পেতে চাইলে অপেক্ষা করতে হবে মাত্র ৭৪০,০০০ বছর!

জেন উওর্ট নামক ডাচ জ্যোতির্বিদের আদরের এই ক্লাউড মেলায় যেতে কী পরিমাণ সময় লাগবে?

কী মনে হয়?

রেডি টু বি এমেইজড!

এটার দূরত্ব হিসেব করতে হলে তথাকথিত মিটার, মাইল, কিলোমিটার ছেড়ে ছুটতে হবে AU (Astronomical Unit) এর পানে।

(পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব যতটুক ততটুকুই হলো ১ AU। সেই হিসেবে সেটা প্রায় ১৫০ মিলিয়ন কিলোমিটার।)

ছোটো ছোটো দূরত্ব থেকে দেখা যাক।

সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ১ AU

প্লুটোর দূরত্ব ৩০ AU থেকে ৫০ AU

আর সেখানে উওর্ট ক্লাউডের ইনার এজের শুরুই হয়েছে ২,০০০ থেকে ৫,০০০ AU থেকে!

আর শেষ হয়েছে ১০,০০০ থেকে ১০০,০০০ AU এ গিয়ে!

ভিজুয়ালাইজ করতে কষ্ট হচ্ছে?

চলুন সময় দিয়ে মাপি।

নাসার ভয়েজার ১ এর স্পিড হলো ১৭ কি.মি. পার সেকেন্ড। সেই ভয়েজার ১ দিয়ে ওইখানে পৌঁছতে সময় লাগবে ৩০০ বছর আর পুরোটা ভ্রমণ শেষ করে বেরিয়ে যেতে লাগবে ৩০,০০০ বছর!

আর সে জায়গায় যদি আলো থাকত তাহলে?

৫/৬ দিনে পৌঁছে যেত?

নাহ,এত্ত সোজা না!

৪.৫ ঘণ্টায় বেচারা নেপচুন পেরিয়ে যায় কিন্তু ক্লাউডে পৌঁছতেই লাগবে ১০-২৮ দিন আর পুরো সফর শেষ করতে লাগবে পুরো ১-১.৫ বছর!

কোয়াইট ওয়ান্ডারিং! ইজন্ট ইট?

বাঁচতে হলে, ভাবতে হবে

ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করতে লগইন করুন:

https://bit.ly/bcb_science

তথ্যসূত্র

গ্রহদের নামকরণ

1. https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/questions/question48.html

2. http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/ask/196-How-did-the-planets-get-their-names-

3. https://10minuteschool.com/blog/reasons-behind-planet-names/

4. Wikipedia

5. DK Planets

চাঁদ নিয়ে কত্ত কথা

1) One Giant Leap- Charles Fishman

2) Shoot For the Moon- James Donovan

3) Mahakashe Manush- Pradip Chandra Basu

4) Sky and telescope magazine

5) https://www.pressreader.com/australia/readers-digest-asia-pacific/20190701/281509342680119

6) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0032063312002085

7) https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2005/08sep_radioactivemoon

8) https://www.google.com/amp/s/www.space.com/amp/18175-moon-temperature.html

9) https://www.nasa.gov/mission_pages/LADEE/news/lunar-atmosphere.html

স্পেইসে ফার্মিং

1. স্পেইসে ফার্মিং এর যত সমস্যা- https://www.scientificamerican.com/article/space-farming-presents-ch/

2. আরেকটা- https://science.howstuffworks.com/space-farming1.htm

3. নাসার ফার্মিং নিয়ে কথা-

https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/spinoff/feature/NASA_is_Everywhere

4. আরেকটা লিঙ্কঃ https://magazine.scienceconnected.org/2018/12/space-farming-more-than-plants/

5. জার্নাল- https://www.degruyter.com/view/journals/opag/2/1/article-p14.xml

6. স্পেইস ফার্মিং এ পৃথিবীর লাভ কী- https://www.nasa.gov/feature/space-farming-yields-a-crop-of-benefits-for-earth

7. স্পেইস ফার্মিংকে পৃথিবীতে কাজে লাগানো যাবে? https://psmag.com/social-justice/the-farms-of-the-future-were-built-for-outer-space-will-they-work-on-earth

৪. ISS এ কীভাবে ময়লা পানি রিসাইকেল করে দেখুন– https://www.nasa.gov/content/water-recycling/

Flat Earth

1. https://www.livescience.com/24310-flat-earth-belief.html

2. https://wiki.tfes.org/Flat_Earth_-_Frequently_Asked_Questions

3. https://www.scienceabc.com/nature/universe/what-is-a-flat-earth-eclipse.html

4. https://bigganbortika.org/if-earth-was-flat-ep1/

5. https://bigganbortika.org/if-earth-was-flat-ep1/

6. https://wiki.tfes.org/Distance_to_the_Sun

7. http://www.popsci.com/10-ways-you-can-prove-earth-is-round

8. http://epod.usra.edu/blog/2013/05/earths-rotation-and-polaris.html

9. https://www.google.com/amp/s/geographytarget.wordpress.com/2018/06/22/37/amp/

10. https://www.huffpost.com/entry/earth-flat-video-simulation_n_6275336

11. https://www.businessinsider.co.za/heres-what-would-happen-if-the-earth-was-actually-flat-2019-12

12. https://curiosityunlocked.in/science-and-technology/what-would-happen-to-life-if-the-earth-was-flat/

13. https://gizmodo.com/what-if-the-earth-suddenly-turned-flat-1795819464

14. https://www.huffpost.com/entry/earth-flat-video-simulation_n_6275336

15. https://roar.media/bangla/main/science/what-if-the-earth-was-flat

16. https://www.theguardian.com/technology/shortcuts/2018/apr/15/australia-doesnt-exist-and-other-bizarre-geographic-conspiracies-that-wont-go-away